সন্ধানী

শ্রীপ্রভাতসমীর রায় বি, এস্‌সি

এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ
৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

Lahiris General Knowledge Series :—Book II.

প্রকাশক :—
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
গৌরাঙ্গচক, হাওড়া

সন্ধানী

অর্থাৎ

"—জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা—"

চৌদ্দ আনা

ছবি :—
পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

এনগ্রেভিং :—
পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস ; ২৯, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন

ছাপা :—
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীগৌর চন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সেনেট হাউস,
কলিকাতা

আমি শ্রীপ্রভাতসমীর রায়ের "সন্ধানী" নামে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহা ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান, সর্ব্বজনপ্রিয় বিজ্ঞান, ইত্যাদি বহু মনোজ্ঞ অধ্যায় সম্বলিত সাধারণ জ্ঞানের বই। এই ধরণের বইএর উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কিছু বলাই অত্যুক্তি নয়। গ্রন্থকার বইখানিকে মনোরম করিয়া তুলিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই এবং আমি এক প্রকার নিশ্চিত যে ইহা জ্ঞানান্বেষী ছাত্রদের কাছে সমাদর লাভ করিবে।

৪ঠা ডিসেম্বর,
১৯৩৮

(স্বাঃ) এম আজিজুল হক
ভাইস-চ্যান্সেলর,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(বঙ্গানুবাদ)

SENATE HOUSE.
CALCUTTA.

I have had occasion to go through Mr. Provat Samir Ray's book entitled—"Sandhani". It is a book on General Knowledge containing several interesting chapters on History, Physics and Popular Science. The importance of a book like this can hardly be over-emphasised. The author has made every attempt to make the book lucid in style and I am sure it would make in an appeal to the students of General Knowledge.

Sd/- *M. Azizul Hoque*

4th December. 1938.

Vice-Chanceller of the University of Calcutta.

* * * * *

সাধারণ জ্ঞানের কত দরকার, বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় কত কম এই সমস্ত মামুলী কথা ব'লে অযথা জায়গা ও সময়ের অপব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত কথা সকলেই সব সময়েই ব'লে থাকেন এবং এই জন্য দুঃখ ও আতঙ্ক প্রকাশ করারও কাপর্ণ্য হয় না কখন। কিন্তু সত্যিকারের কার্য্যক্ষেত্রে এই সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর ক'রবার জন্য চেষ্টা খুবই কম দেখা যায়। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই প্রায় সব সময়েই ভুলে যান যে পাঠ্যপুস্তকেরও বাইরে একটা বিশাল জগৎ প'ড়ে আছে যেখানকার সঙ্গে তাদের পরিচয় অত্যন্তই কম।

আজকাল অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষনীয় বিষয় গুলি বহুধা ক'রে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দিতে যথেষ্ঠ চেষ্টা ক'রছেন; এ যে জাতীয় জীবনের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। কোন একটা বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের আগে অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা খুবই দরকার, নইলে শিক্ষা হ'য়ে পড়ে কৃত্রিম।

প্রত্যেকেরই সাধারণ জগৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সহজ জ্ঞান থাকা দরকার; তবে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করার আশা করা অন্যায় কারণ এর পরিসর অত্যন্ত স্বল্প।

"সন্ধানী" বইখানা ছেলেমেয়েদের বাইরের বিস্তৃত জগতের একটা আভাষ দেবার জন্য লেখা। এতে কোন বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ তত্ত্বের খোঁজ পাওয়া যাবে না সত্যি, তবে ছেলেমেয়েদের যা

দরকার তারা যা জানতে চায় তার প্রায় সব কিছুই এতে ছেলেমেয়েদেরই উপযোগী ক'রে বলা হ'য়েছে। এর ভাষা খুবই সহজ ও সরল এবং সমস্ত বিষয়ে অজস্র উদাহরণ দিয়ে গল্প ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এই বইএর সমস্তটা পড়ার পরে কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে মন আকৃষ্ট হ'লে তখনই সেই বিষয়ের অন্যান্য বিস্তৃত ও বড় বই পড়ার সময় আসবে। এই বইয়ের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের সৌধ গ'ড়ে উঠবে আশা করি,—

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার
প্রেসিডেন্সী কলেজ
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
কলিকাতা।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিষয় সূচী

(বিস্তৃত সূচী বইএর শেষে দেওয়া আছে)

*   *   *   *   *

—উৎসর্গ—

বাবা ও মা'কে

*   *   *   *   *

*   *   *   *

অনেকদিন ধ'রে বহু বিভিন্নবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদেরই মত ক'রে মিশবার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত অতর্কিতে তাদের ছোট্ট মনের প্রকাণ্ড রাজপুরীর আঙিনায় উঁকি দেবার সৌভাগ্যলাভ হ'য়েছে। অসীম ঐশ্বর্য্যশালী সেই সোণার রাজপুরী, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, আকাশ ছোঁয়া মণিমাণিক্য খচিত প্রাসাদ, ফটিক জলের পুকুরে সেখানে সোণার পদ্মফুল ফোটে থরে থরে ; সবই আছে নেই কেবল যথেষ্ঠ আলো, সমস্ত রাজপুরী আলো আঁধারের বিভীষিকায় আত্মগোপন ক'রে আছে ; আলো চাই আরও আলো ; মণিকোঠার হাজারো সিঁড়ি, কিন্তু অনুসন্ধিৎসুক মন মণি আহরণের জন্য উঠতে গিয়ে কেবলই বাধা পেয়ে থেমে পড়ে। সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালী কিন্তু মৃতপ্রায় রাজপুরীতে আলোক সম্পাতের চেষ্টা করা হ'য়েছে এই সন্ধানী আলো দিয়ে। সফলকাম কতদূর হওয়া গেছে তা যাদের জন্য এই বই লেখা তারাই ভাল বুঝতে পারবে।

সন্ধানী বইখানা "বহুদিনের অনুভূত অভাব দুর কবিতে বাহির করা হইল" গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নয়। বাজারে সাধারণ জ্ঞানের বইএর প্রাচুর্য্য যথেষ্ঠ ; কিন্তু তবুও এই পুস্তক-বন্যার দিনে একখানা নতুন বই প্রকাশ ক'রবার জন্য কৈফিয়ৎও অনেক আছে। বহু বিভিন্ন মনবৃত্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে আসাতে তারা কি চায়, তাদের ঠিক কি দরকার, তারা কি বুঝতে পারে না তার কতকটা খোঁজ পেয়েছি। বাজারে সাধারণ জ্ঞানের অনেক সুন্দর সুন্দর বই আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ব'লতে বাধ্য হ'চ্ছি যে তাদের মধ্যে প্রায় কোনটিতেই ছেলেমেয়েদের যা দরকার তা ঠিক তাদেরই ভাষায় বলা নেই, ফলে যাদের জন্য বই লেখা তারাই বইখানাকে খুব আপনার ক'রে নিতে পারে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের দাম কত তা বিশেষজ্ঞদেরই বিবেচ্য। সন্ধানীতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে বহু বিভিন্নধী ছেলেমেয়েদের যা জানার দরকার তাই তাদেরই রুচিসম্মত ভাবে ব'লে যাবার চেষ্টা করা

হ'য়েছে। সন্ধানীর আলো একাভিমুখী প্রচণ্ড আলো নয়, উষার শান্ত স্নিগ্ধ দিগন্ত বিস্তৃত আলো। এই বইখানা বারো থেকে আঠারো বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। সন্ধানীর সমস্ত খবরই আধুনিকতম ও অভ্রান্ত ক'রে দেবার চেষ্টা যতদূর সাধ্য করা হ'য়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানা লেখা তাকে সম্পূর্ণাঙ্গ ক'রতে অনেক কিছুই লেখার ছিল কিন্তু সময় আর স্থানের অসঙ্কুলান হওয়ায় সব কিছু লেখা হয়ে উঠল না; ভবিষ্যতে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর মাননীয় খান বাহাদুর আজিজুল হক মহাশয় সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উৎসবে দুঃখ ক'রে ব'লেছিলেন যে বাঙালী ছেলেমেয়েরা বাইরের কিছুই শিখলো না, শিখতে চেষ্টাও করে না, সকলের উচিৎ বাঙালী ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। তাঁরই উপদেশে উৎসাহিত হ'য়ে এই বই লেখা।

শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্ত রায়, শ্রীসন্তোষকুমার রায় প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বইএর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন ও অন্যান্য সাহায্য অজস্র ক'রেছেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্তের মোহন তুলির ছোঁয়ায় মণিকোঠার হাজারো সিঁড়ি প্রচ্ছদপটে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। এঁদের কাছে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এত তাড়াতাড়ি হিসাব নিকাশ শেষ ক'রতে চাইনে।

কর্ম্ম মাত্রেই ফলপ্রসূ, এই ক্ষুদ্র কর্ম্মের যদি কোন ফল থাকে তাহ'লে সেই ফল বাঙ্‌লার কিশোর কিশোরীদের উদ্দেশ্যই উৎসর্গ ক'রছি। ইতি,—

৭ই অগ্রহায়ণ
রায় পাড়া
কৃষ্ণনগর
১৩৪৫

প্রভাতসমীর রায়

সম্বালনী :—

ভারতবর্ষ
স্কেল ইংরাজী মাইল
পাটনা
এলাহাবাদ
নাগপুর
হায়দ্রাবাদ
উড়িষ্যা
পুরী
বোম্বাই
মহীশূর
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
Drawn by G.D.Pal.

সন্ধানী :—

পদার্থ বিজ্ঞান

—* শক্তি *—

এক দুষ্ট ছেলে দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরছিল; রাস্তায় দেখে একটা পাখী ব'সে আছে এক বাড়ির ছাতে। অমনি সে পাখীটার দিকে ঢিল ছুড়তে লাগলো। কতকগুলো ঢিল ছাদের কার্ণিশের ওপর গিয়ে প'ড়লো আর একটা ঢিল এক জানলার কাঁচের সার্শীতে গিয়ে লাগলো, ফলে ঝন্ ঝন্ ক'রে কাঁচখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে প'ড়লো। এখন দেখা যাচ্ছে ঢিলটা গিয়ে কাঁচটা ভাঙ্‌লো; কিন্তু ঢিলটা কি নিজেরই ক্ষমতায় ইচ্ছা ক'রে ভেঙেছে? নিশ্চয়ই না; ঢিল তো ছিল মাটিতে প'ড়ে, দুষ্ট ছেলেটাই তো ঢিলকে ছুড়ে দিয়ে এই বিপদ ঘটালো। কাজ করার ক্ষমতাকে বলা হয় শক্তি। তাহ'লে ঢিলটা যখন কাঁচ ভেঙেছে তখন তার খানিকটা শক্তি ছিল; এই শক্তিটা এলো কোথা থেকে? ছেলেটাই একে হাত দিয়ে ছুড়ে শক্তি দিয়েছে। আচ্ছা ঢিলটা যে শক্তি পেলো সেটা কাঁচ ভাঙার পর কোথায় গেল? ঢিলটা কাঁচে লেগে শব্দ হ'য়েছিল একটা, আর তুমি যদি কাছাকাছি কোথাও থাকতে তাহ'লে ছুটে এসে কাঁচের টুক্‌রোগুলোতে আর ঢিলে হাত দিলে পরে সেগুলোকে একটু গরম মনে হ'ত, দেখতে। তাহ'লে ঢিলের শক্তিটা ক্ষয় হ'য়েছে শব্দ তৈরী ক'রতে আর তাপ তৈরী ক'রতে। ঢিলে যে শক্তিটা ছিল তার জোরে সে আগিয়ে যাচ্ছিল, পথে কাঁচটা বাধা দেওয়ায় এই সব বিপত্তি ঘটলো। ঢিল যে শক্তির বলে আগিয়ে যাচ্ছিল তাকে বলে গতিশক্তি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ছেলেটা ঢিলকে দিয়েছিল গতিশক্তি, সেই গতিশক্তি তাপ আর শব্দশক্তির সৃষ্টি ক'রলো। সুতরাং দেহশক্তি থেকে হ'লো গতিশক্তি আর গতিশক্তি থেকে হ'লো তাপ আর শব্দশক্তি। এখন ছেলেটির হাতে শক্তি এলো কোথা থেকে। সে যতই দুষ্টু হোক না কেন তার মা তাকে নিশ্চয়ই খুবই ভালবাসেন; কত যত্ন আত্তি ক'রে তাকে খাইয়েছেন। এই সব খাবার খেয়ে ছেলেটির গায়ে হ'ল জোর আর তার ফলই এই। কিন্তু এই সব খাবার তৈরী হয় কিসের থেকে ? চাল, ডাল, রুটি, লুচি, ফলমুল, তরিতরকারি এই সব পাওয়া যায় গাছপালা থেকে ; আর দুধ, দই, রসগোল্লা, সন্দেশ, মাছ, মাংস এসব পাওয়া যায় জীবজন্তু থেকে ; এই সব জীবজন্তু আবার গাছপালা খেয়েই বেঁচে থাকে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সমস্ত খাবার গাছপালা থেকেই তৈরী হয়। সুতরাং ব'লতে গেলে দুষ্ট ছেলেটি শক্তি পেয়েছে এই সমস্ত গাছপালা থেকে। আবার এই সব গাছপালা জীবনীশক্তি লাভ করে সূর্য্যের তাপ থেকে। এখন দেখ, সূর্য্যের তাপশক্তি থেকে গাছপালারা পেল জীবনীশক্তি, এই থেকে দুষ্টু ছেলেটি খাবারের সাহায্যে পেলো দেহশক্তি, তাই থেকে ঢিলটা পেলো গতিশক্তি, ঢিলটার গতিশক্তি আবার কাঁচে লেগে তাপশক্তি আর শব্দশক্তিতে পরিণত হ'ল। তাহ'লে আমরা সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে গাছপালা, ছেলেটি কিম্বা ঢিল কেউই শক্তি তৈরী ক'রতে পারছে না। ডাকপিয়নের মত অবস্থা ; পোষ্ট আফিস থেকে চিঠি নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি দিয়ে বেড়ানো। ডাকপিয়ন চিঠি লিখছেও না প'ড়ছেও না, শুধু মধ্যবর্ত্তী। সেই রকম আমরা কেউই শক্তি সৃষ্টিও ক'রতে পারি না, ক্ষয়ও ক'রতে পারি না। শক্তি অমর, অজর আর নিত্য। পদার্থ শক্তির বাহক মাত্র। হ্যাঁ, গল্পের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কতকগুলো ঢিল কার্ণিশের ওপর

গিয়ে প'ড়েছিল; এগুলো যতক্ষণ কার্ণিশের ওপরে প'ড়ে থাকবে ততক্ষণ কোন ভয় নেই। কিন্তু যদি কোন কারণে সেখান থেকে কারোর মাথায় এসে পড়ে তাহ'লে তার মাথা ভাঙবে নিশ্চিত। আচ্ছা ঢিলটা তো কার্ণিশের ওপর অকর্ম্মা হ'য়েছিল; মাথা ভাঙবার শক্তি পেলো কোথা থেকে। এ যতক্ষণ ওপরে ছিল ততক্ষণ এর মধ্যে উঁচুতে থাকার দরুণ খানিকটা শক্তি ঘুমিয়েছিল। সেই দুষ্ট ছেলেটিই এর মধ্যে এই দুষ্টামি শক্তিটা দিয়ে দিয়েছিল, কার্ণিশের ওপর ঢিলটার ছিল স্থৈতিক (Potential) শক্তি, পড়বার সময় এ বদলে হ'য়ে গেল গতিশক্তি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে পদার্থের অনেক রকম শক্তি থাকতে পারে যেমন স্থৈতিকশক্তি, গতিশক্তি, তাপশক্তি ও শব্দশক্তি। আরো দু' রকমের শক্তি আছে যেমন রাসায়নিকশক্তি, আর চুম্বকশক্তি। এদের কথা পরে শুনো। শক্তির আদিও নেই অন্তও নেই। একটা জিনিষ থেকে আর একটা জিনিষে শক্তি ব'য়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর এই শক্তির মূল কোথায় জানো? আমাদের দুষ্ট ছেলের বেলায় সব শক্তিগুলো এসেছিল সূর্য্য থেকে; তেমনি পৃথিবীর সব কিছু শক্তিরই উৎস হ'চ্ছেন সূর্য্যদেব। একদিন সূর্য্যেরই শক্তি নিয়ে পৃথিবী সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল; সেই সূর্য্যেরই আলো আর তাপ পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, ধরিত্রীমাতা ক'রে রেখেছে। সূর্য্যই শক্তির কেন্দ্রস্থল।

—* মাধ্যাকর্ষণ শক্তি *—

আমরা একটু আগেই দেখেছি দুষ্ট ছেলেটি ঢিলগুলো ওপর দিকে ছুড়ে দেবার একটু পরেই সেগুলো আবার মাটির দিকে নেবে এলো। তেমনি আমরাও যদি নিজেরা উঁচু দিকে লাফাই তা'হলে প্রায় তক্ষুনি নিজের অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মাটির বুকে নেমে আসতে হবে। মা বসুন্ধরা আমাদের খুব ভালবাসেন কিনা তাই আমাদের ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারেন না। পৃথিবী প্রবল বেগে ঘুরছে এ খবর বোধ হয় তোমাদের কাছে অজানা নয়। আমাদের ওপর মা'র যদি ভালবাসার টান না থাকতো তা হ'লে পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর ঘোরার ফলে আমরা যে কে কোথায় ছিটকে পড়তাম তার আর কোন ঠিক ঠিকানা মিলতো না। মা'র এই অদৃশ্য টানকে বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন "পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।" স্যার আইজাক নিউটন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি ছেলেবেলায় একদিন বাগানে ব'সেছিলেন এমন সময় দেখলেন একটা আপেল বোঁটা খ'সে ধপ্ ক'রে মাটির ওপর এসে প'ড়লো। এই দেখে তাঁর মনে মহা ভাবনা হ'ল— আচ্ছা, আপেলটা বোঁটা ছিঁড়ে মাটির দিকে নেমে এলো কেন? আকাশের দিকেও তো উড়ে যেতে পারতো। তোমরা ভাববে, আচ্ছা বোকা তো, এতো মাটির দিকে নেবে আসবেই। তিনি যা'কেই এই প্রশ্ন জিগ্যেস ক'রেছিলেন সেই এই উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হ'লেন না। অবশেষে বড় হয়ে তিনি বহু সাধনার পর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা

আবিষ্কার করেন। কত লোকেই তো গাছ থেকে ফল প'ড়তে দেখেছে কিন্তু এই সাধারণ কথাটা ভেবেছে কজন ?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে ব'লেই আমাদের মাটি থেকে কোন জিনিষ তুলতে হ'লে খানিকটা জোর দিতে হয়। একটা জিনিষ তুলতে হ'লে যতটা জোরের দরকার হয় সেই জোরটাকে এই জিনিষের "ভার" বলা হয় মা'র ভালবাসা সবার ওপর সমান, তবুও কতগুলো জিনিষ আকারে সমান হ'লেও ভারী কম বেশী হ'তে পারে। ধর, এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া আর এক হাত উঁচু একটা লোহার টুকরা আর ঠিক ঐ আকারের একটা সোলার টুকরো নেওয়া হ'ল। আকারে সমান হ'লেও লোহার টুক্‌রোটাকেই বেশী ভারী বলে মনে হবে। লম্বায় চওড়ায় সমান হলেও পণ্ডিত মশাই ড্রইংমাষ্টার মহাশয়ের চেয়ে অনেক বেশী ভার মেজাজী লোক। এই রকম এক রকম চেহারা হলেও ভারের কমবেশী হয়। এই ভার কমবেশী হওয়ার গুণটাকে বলে "আপেক্ষিক গুরুত্ব।" লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সোলার চেয়ে অনেক বেশী তাই লোহা সোলার চেয়ে অত ভারী। তেমনি ড্রইংমাষ্টার মহাশয়ের মেজাজের আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়ে পণ্ডিত মশাইর মেজাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশী ; তাই তোমরা তাঁকে অত ভয় কর।

এখন আমাদের আগেকার লোহার আর সোলার টুক্‌রো দুটো এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে ফেলে দাও দেখবে লোহাটা টুপ ক'রে ডুবে যাবে আর সোলাটা মনের আনন্দে জলের ওপর ভাসবে। কেন এমন হয় বল'তো। তোমরা ব'লবে সোলা হাল্‌কা ব'লে ভাসে। কিন্তু যদি পাঁচশো মণ কাঠ জলে ভাসে আর তার চেয়ে অনেক হাল্কা আধ ছটাক লোহা জলে ভাসবে না কেন ? এর একটা নিয়ম অবশ্যই আছে। মনে কর, এক গ্লাস জল, এক গ্লাস থৈ আর

এক গ্লাস বালি নেওয়া হ'ল; এখন তিনটেকেই যদি একটা বড় গামলার মধ্যে ঢালা যায় তা'হলে দেখবে যে খৈ ভাসছে জলের ওপর আর বালি জলের নীচে প'ড়ে আছে। যদি সব গ্লাসগুলো আগে ওজন ক'রে নিতে তা'হলে দেখতে যে খৈ ভর্ত্তি গ্লাসটা সব চেয়ে হাল্‌কা, বালি ভর্ত্তি গ্লাসটা সব চেয়ে ভারী আর জলের গ্লাসটার ওজন মাঝামাঝি; গ্লাস তিনটে অবশ্য সমান আকারের আর ওজনের ছিল। এখন তুমি যতই বালি, জল আর খৈ গামলার মধ্যে দাও দেখবে সবাই নিজের নিজের জায়গায় চলে যাবে। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে যদি সমান পরিমাণের (আকারের) কতকগুলো জিনিষ নেওয়া হয় তবে তার মধ্যে যে গুলোর ওজন সেই পরিমাণের জলের চেয়ে ভারী সে গুলো জলে ডুবে যাবে আর যে গুলো কম ভারী সে গুলো ভাসবে, অর্থাৎ যার আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের চেয়ে কম সে গুলো ভাসবে আর যার বেশী সে গুলো যাবে ডুবে। সমস্ত তরল আর বায়বীয় পদার্থের বেলায় এই নিয়মই খাটবে। হাইড্রোজেন হ'চ্ছে একরকম বাতাসের মত জিনিষ তবে বাতাসের চেয়ে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক কম অর্থাৎ সমান পরিমাণের বাতাসের ওজনের চেয়ে হাইড্রোজেনের ওজন অনেক কম। স্থতরাং একটা রবারের বেলুন হাইড্রোজেন ভর্ত্তি ক'রে ছেড়ে দিলেই সেটা আকাশে উড়ে যাবে। তোমরা এখন বলবে আচ্ছা পাখীরা তো আর হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা নয় তবে তারা বাতাসে ওড়ে কি ক'রে? পাখীদের ডানাগুলো বেশ লম্বা এ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। এই পাখা জোড়া দিয়ে তারা বাতাসকে ঠেলে দেয়। যে পরিমাণের বাতাসটা এই রকম ভাবে স'রে যায় তার ওজন পাখীটার ওজনের চেয়ে বেশী তাই পাখী স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ায় আকাশে। কিন্তু পাখা জোড়া গুটিয়ে নিলেই পাখীটা ঢিলের মত টুপ ক'রে মাটিতে প'ড়ে যাবে।

আর্কেমেডিস ছিলেন পুরাকালের গ্রীসদেশের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। একদিন গ্রীস দেশের রাজা এক সেকরাকে খানিকটা সোনা দিলেন একটা মুকুট তৈরী ক'রে দেবার জন্য। কয়েক দিন পরে সেকরা এক চমৎকার মুকুট তৈরী ক'রে আনলো। সবাই এটার প্রশংসা ক'রতে লাগলো। কিন্তু সেখানে ছিল একটা কুচক্রী লোক সে বলে উঠলো, "আপনারা মুকুটের এত প্রশংসা ক'রছেন, কিন্তু আপনি যতটা সোনা দিয়েছিলেন তার সবটা সেকরা ব্যবহার না ক'রে খানিকটা নিজে চুরী ক'রে যে ভেজাল মিশিয়ে দিয়ে ওজন ঠিক রেখে দেয় নি তার প্রমাণ কি ?" রাজা ভাবলেন তা তো সত্যি কথা। তিনি তখন সভাসদদের সোনাটা খাঁটি কিনা দেখে দিতে ব'ল্লেন। মুকুটটা গলিয়ে ফেলে সোনা পরীক্ষা ক'রে দেখলেই গোলমাল মিটে যেতো ; কিন্তু এমন চমৎকার মুকুটটা গলিয়ে ফেলতে কারুর ইচ্ছা হ'লো না। রাজা অবশেষে আর্কিমেডিসকে সমস্যা সমাধান ক'রতে বললেন। আর্কেমেডিস আর কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলেন না কি ক'রে মুকুটটা আস্ত রেখে সোনাটা খাঁটি কি ভেজাল ব'লে দেওয়া যায়। খাওয়া দাওয়া তাঁর মাথায় উঠ্‌লো। এক দিন ক্লান্ত হ'য়ে স্নান ক'রতে গেলেন। চৌবাচ্চায় কাণায় কাণায় জল, তার মধ্যে তিনি নাবলেন আর খানিকটা জল উপছে পড়ে গেল। অমনি তাঁর মাথায় একটি উপায় এসে গেল। সেই অবস্থাতেই তিনি "ইউরেকা, ইউরেকা" (পেয়েছি, পেয়েছি) ব'লতে ব'লতে রাজা সভায় ছুটলেন। সবাই অবাক্। তিনি কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না ক'রে মুকুটটার ওজনের একতাল খাঁটি সোনা আন্‌তে ব'ল্লেন। তারপর একটুক্‌রো সুতোয় মুকুটটা বেঁধে কানায় কাণায় ভর্ত্তি এক বাটি জলে মুকুটটা আস্তে আস্তে নাবিয়ে দিলেন। খানিকটা জল উপছে প'ড়ে গেল, কতটা জল প'ড়ে গেল সেটা তিনি মাপলেন ; তারপর সোনার তালটাকে সুতোয় বেঁধে আর একটা জলভর্ত্তি বাটিতে নাবিয়ে

দিলেন। এবারও কতটা জল প'ড়ে গেল তা মাপলেন। দেখলেন প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয় বারে জল বেশী প'ড়লো। তাতে বোঝা গেল সেকরা মুকুটটার মধ্যে থেকে খানিকটা সোনা বের ক'রে নিয়ে সোনার চেয়ে বেশী গুরুত্বের ধাতু দিয়ে ভরাট ক'রেছে ; ফলে ওজন ঠিক থাকলেও মাপ ঠিক থাকলো না। রাজাকে বুঝিয়ে ব'লতে তিনি সেকরাকে দিলেন ফাঁসী আর আর্কেমেডিসকে পুরস্কৃত ক'রলেন।

—* আলো *—

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু একটি দেশলাইএর কাঠি জ্বাললেই সব আলো হ'য়ে যায়। মাছেরা যেমন জলের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের চারধারেই জল কোথাও একটু ফাঁক নেই, তেমনি পণ্ডিতরা বলেন, যে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক রকম তরল পদার্থের মধ্যে ডুবে আছে, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এই তরল পদার্থ নেই। এর নাম দেওয়া হয়েছে "ঈথার।" এর কোন রকম ওজন নেই, গন্ধ নেই, রঙ্ নেই। আমরা সকলেই ঈথার সমুদ্রে ডুবে আছি।

তোমরা দেখেছো জলের মধ্যে যদি ঢিল ছোড়া যায় তা'হলে গোল গোল ঢেউ চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে। যতই দূরে যায় ঢেউগুলো ততই ছোট হ'য়ে যায় অবশেষে তার আর কোন চিহ্ন মেলে না ; সেই রকম ঈথারেও নানা কারণে গোল গোল ঢেউ ওঠে, আর জলের ঢেউএর মতই ছড়িয়ে পড়ে। আলো ঈথারেরই এক রকম ঢেউ। এই ঢেউএর ছোট বড়'র জন্য আলোরও কম বেশী হয়। ঈথারের ঢেউ

আমাদের চোখে এসে লাগলে তবে আমরা আলো দেখ্‌তে পাই। আলো হ'চ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দ্রুতগামী জিনিষ, এত বড় সারা পৃথিবীটাকে এক সেকেণ্ডে সাত পাক ঘুরে আসতে পারে, এ চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল।

আমাদের দেশে বলে, সূর্য্যমামার রথে সাত রঙের সাতটা ঘোড়া জোড়া। এই সাত ঘোড়া হাঁকিয়ে মামা মশাই যখন আকাশের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরোন তখন তাঁর সাদা আলো আমাদের গায়ে এসে পড়ে। এটা সত্যি কথা; ঝাড় লণ্ঠনে যে সব তেকোণা কাঁচ থাকে তাই একটা কাউকে না ব'লে খুলে নিয়ে সাদা আলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, সূর্য্য মামার সাত ঘোড়ার রংকে দেখতে পাবে। বিজ্ঞানের কথায় বলতে হ'লে বলা উচিত সূর্য্যের আলো সাতটা রঙে তৈরী। এই সাতটা রঙের নাম হ'চ্ছে বেগুনী, নীল, ঘননীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা আর লাল। ইংরাজীতে এক কথায় বলে "ভিবগিওর" (Vibgyor); শুধু যে ঝাড় লণ্ঠনের তেকোণা কাঁচই সাদা আলোর শত্রু তা নয়, এ গুণ আরো অনেক জিনিষেরই আছে। ফোঁটা ফোঁটা জলও এই জন্য গর্ব্ব ক'রতে পারে। তাই যখন বৃষ্টি হ'চ্ছে কিংবা একটু আগেই বৃষ্টি ছেড়ে গেছে তখন রোদ উঠলে কেমন সাত রঙা রামধনু দেখতে পাও আকাশের যে দিকে সূর্য্য থাকে তার উল্টো দিকে। কিন্তু রামধনু রামেরও ধনুক নয়, ইন্দ্রেরও ধনুক নয় বরং সূর্য্যমামার ধনুক বলা যেতে পারে। রামধনু সূর্য্যের সাদা আলোভাঙা সাতটা রঙ ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনো কখনো পরিষ্কার জ্যোৎস্নারাতেও রামধনু ওঠে। কখনো বা আকাশে একসঙ্গে ওপর নীচে দুটো রামধনুও দেখা যায়।

গরমের ছুটির সময় দুপুরবেলায় মা যখন তোমাদের নিয়ে ঘরে দুয়ার জানলা বন্ধ ক'রে জোর ক'রে ঘুমোতে বলেন তখন প্রথমটা কিছুতেই

ঘুম আসতে চায়না। এই সময় এদিক ওদিক চাইলেই দেখতে পাবে একটু আধটু ফাঁক দিয়ে রোদ ঘরে এসে ঢুকছে। একটা জামা ঝেড়ে যদি খানিকটা ধুলো ঘরে উড়িয়ে দাও তাহ'লে দেখবে রোদের রাস্তাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য ক'রে দেখ, রাস্তাটা একেবারে সোজা, কোথাও একটু বাঁক নেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আলো ভারি সাদাসিদে, সর্ব্বদা সোজা রাস্তায় চলে। অবশ্য যদি সব সময়ে রাস্তা ফাঁকা না থাকে তা হ'লে একটু বাঁকাচোরা ক'রতে হয় বই কি। আলো সোজা পথে যেতে যেতে একটা প্লেন আর অস্বচ্ছ জিনিষে যদি ধাক্কা খায় তা হলে তাকে ফিরে আসতে বাধ্য হ'তে হয়। আয়নার ওপর রোদ ফেলে দেখো কেমন ফিরে আসে রোদ। এই জন্যই আয়নার ওপরে তোমাদের মুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নানা লোকের সঙ্গে নানারকমের ব্যবহার ক'রতে হয় সবাইর সঙ্গে কি সমান ব্যবহার ক'রলে চলে। তাই আলো যখন এক জিনিষ ছেড়ে আর এক জিনিষে ঢোকে তখন তার রাস্তাটা একটু বেঁকে যায়। কতখানি বাঁকবে তা নির্ভর করে জিনিষ দুটোর হাবভাবের ওপর। একটা খালি বাটিতে একটা টাকা রাখ তারপর বাটিটা এমনভাবে তুলে ধর যেখান থেকে দেখলে টাকাটা ঠিক কাণার আড়ালে পড়ে যাবে আর দেখা যাবে না। এখন বাটির মধ্যে জল ঢালো অমনি টাকাটা দেখা যাবে; কারণ জল থেকে বাতাসে বেরুবার সময় আলোর রাস্তাটা একটু বেঁকে উঠে যাচ্ছে, আর সেই জন্যই আমরা টাকাটা দেখতে পাচ্ছি; একে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে প্রতিসরণ, আর ছায়া পড়াকে বলে প্রতিবিম্বন। কালো রঙটা মোটেই কোন রঙ্ নয়, সব রঙের অভাব হ'লেই কালো দেখা যায়। আগেই বলেছি আলো ঈথারের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয় এখন ঈথারের ঢেউ ছোট বড় নানা রকমের হ'তে পারে, আর এই জন্যই আলোর রঙের ইতর বিশেষ হয়। বেগুনী রঙের ঢেউ সবচেয়ে ছোট

আর লাল রঙের ঢেউ সবচেয়ে লম্বা। আচ্ছা গোলাপফুলের রঙ্ লাল আর পাতার রঙ্ সবুজে কেন? লাল রঙ্টাকে গোলাপফুল দেখতে পারে না তাই যখন সাদা আলো ফুলের 'ওপর এসে পড়ে তখন সে সব রঙ্গুলো টেনে নিয়ে লাল রঙ্টাকে তাড়িয়ে দেয় আর সেই লাল রঙ্টা যখন আমাদের চোখের কাছে নালিশ ক'রতে আসে তখনই আমরা ফুলটার রঙ্ দেখি লাল: তেমনি পাতাগুলো সবুজ রঙ্ দেখতে পারে না। অন্য সব রঙ্গুলোকে নিয়ে সে সবুজটাকে ছেড়ে দেয় আর তার জন্যই আমরা পাতার রঙ্ দেখি সবুজ। যদি সাদা আলো থেকে লাল রঙ্টা বাদ দিয়ে গোলাপফুলের ওপর ফেলা হয় তাহ'লে ফুলটা বাকী সব রঙ্গুলোকেই হজম ক'রে ফেলবে, সেইজন্য সব রঙেরই অভাব হবে তাই ফুলটা তখন দেখাবে কালো। সাদা জিনিষের কারোর সঙ্গেই বনিবনা নেই, সে সব রঙ্ই ফিরিয়ে দেয় তাই তাদের দেখায় শাদা। লাল রঙ্টা নিকটের প্রতীক আর নীল রঙে সর্ব্বদাই দূরত্ব বোঝায়। আকাশের রঙ্ কি বলতে পারো। তোমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠবে—কেন, নীল! কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন জানো? তাঁরা বলেন—আকাশ নীল নয়, লাল নয়, একদম কুচ্‌কুচে কালো, অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কিন্তু বাতাসে খুব মিহি ধুলোর গুঁড়ো প্রচুর পরিমাণে ভেসে বেড়াচ্ছে। এরা ছাঁকনীর কাজ করে। সূর্য্য থেকে যে সাদা আলো নেবে আসে তার খানিকটা এরা হাতিয়ে নেয়, আর সেইটুকুর সমস্ত রঙ্গুলো খেয়ে নিয়ে কেবল নীলটুকু আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে আকাশ দেখায় ঝক্‌ঝকে নীল।

—❋ তাপ ❋—

একটা লোহার তারকে আগুনে ধ'রলে প্রথমে তারটা একটু একটু ক'রে গরম হ'য়ে ওঠে, তারপরে তেতে লাল হ'য়ে যায়; তারপর ক্রমে ক্রমে গরম হ'তে হ'তে শাদা হ'য়ে ওঠে আর বেশ আলোও এর থেকে ফুটে বেরোয়। এর চেয়ে বেশী গরম ক'রলে কিন্তু তারটা গ'লে যাবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি তেতে গিয়ে একটা জিনিষ আলো দিতে পারে; তা'হলে তাপ আর আলো প্রায় একই ধরণের। আগেই ব'লেছি সারা জগৎ ঈথার সমুদ্রে ডুবে আছে আর আলো হ'চ্ছে এই ঈথার সাগরের ঢেউ। তাপও হ'চ্ছে ঈথারের ঢেউ; তবে এ ঢেউগুলো আলোর ঢেউএর চেয়ে অনেক বেশী লম্বা লম্বা।

কি ক'রে গরুর গাড়ির কাঠের চাকার চারধারে একটা লোহা পড়ান দেখেছো? লোহাটা পড়ান হয় যাতে ক'রে কাঠ শিগ্গী ক্ষয়ে না যায়। কামারেরা আগে লোহাটাকে আগুণে টকটকে লাল ক'রে তাতিয়ে নেয়; তারপরে সেটাকে চিমটে দিয়ে ধ'রে তাড়াতাড়ি কাঠের চাকার চারিধারে পড়িয়ে দেয়। এরকম করে কেন জানো? সব জিনিষই গরম হ'লে মাপে বেড়ে যায় আবার ঠাণ্ডা হ'লে ছোট হ'য়ে যায়। লোহার ফ্রেমটা গরম ক'রতে খানিকটা আকারে বেড়ে গেল তখন সেটা চাকায় পড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যখন ঠাণ্ডা হয়ে ফ্রেমটা ছোট হ'য়ে যাবে তখন সেটা চাকার ওপর খুব এঁটে ব'সবে, কিছুতেই খুলবে না সহজে। লক্ষ্য ক'রেছো কিনা জানিনে, রেলের দুটো লাইনের মাঝখানে

খানিকটা ফাঁক থাকে। কেন থাকে জানো? গরমে যখন লাইনগুলো লম্বায় বেড়ে যায় তখন এই ফাঁকে তাদের জায়গা হয়। যদি ফাঁক না থাকতো তাহ'লে লাইনগুলো গরম লাগলে বেড়ে গিয়ে জোড়মুখে উঁচু হ'য়ে থাকতো আর ট্রেণ চলতে গেলে বিপদ ঘ'টতো পদে পদে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক জিনিষই গরমে বাড়ে আর ঠাণ্ডা লাগলে কমে। সুতরাং একটা জিনিষের তাপ বাড়াটা তার আয়তন বাড়া থেকে ধরা যেতে পারে। থার্ম্মমিটার বা তাপমান যন্ত্র দিয়ে তাপ মাপা হয়। একটা কাঁচের নলের তলার দিকে একটা বল থাকে আর সেই বলটা ও নলের গোড়ার খানিকটা পারা দিয়ে ভর্ত্তি করা থাকে। এখন নলের খোলা মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এইবার বলটাকে বরফজলের মধ্যে রাখা হয় তখন নলের যেখান পর্য্যন্ত পারা থাকে সেইখানে একটা দাগ দেওয়া হয়। তারপর বলশুদ্ধ নলটাকে ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে ধরা হয়। তাপ লেগে পারা যায় বেড়ে, আর নলের মধ্যে উঠতে থাকে। যেখানে শেষ পর্য্যন্ত পারাটা গিয়ে দাঁড়ায় সেইখানে আর একটা দাগ দেওয়া হয়। এখন ফরাসী, জার্ম্মাণী এই সব দেশে তলার দাগের পাশে লেখা হয় ০ আর ওপরের দাগটার পাশে লেখা হয় ১০০। আর মাঝখানের জায়গাটা ১০০ ভাগে ভাগ করে দাগ কাটা হয়। এক একটা ঘরকে বলা হয় এক একটা ডিগ্রী। এখন, মনে কর, একটা গরম জিনিষের ওপর বলটা ধরা হ'লো। গরম পেয়ে পারাটা বেড়ে গিয়ে, ধর, ৭৫এর ঘর পর্য্যন্ত গিয়ে উঠলো। তখন বলা হবে জিনিষটার তাপ ৭৫ ডিগ্রি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে জল জমে ০° (ডিগ্রাতে) আর বাষ্প হয় ১০০°তে। ইংল্যাণ্ডে জল যেখানে জমে সেখানে লেখা হয় ৩২ আর যেখানে বাষ্প হয় সেখানে লেখা হয় ২১২ আর মাঝের জায়গাটা ১৮০টা ডিগ্রীতে ভাগ

করা হয়। প্রথম ধরণের এক একটা ডিগ্রীকে বলা হয় সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী আর দ্বিতীয় ধরণের এক এক ডিগ্রীকে বলা হয় ফারেণহীট ডিগ্রী। সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীরই চলন বেশী। মানুষের শরীরের তাপ ফারেণহীট ডিগ্রীতে ৯৮ আর সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে ৩৭। তোমরা নিজেরাও একরকম থার্ম্মমিটার তৈরী ক'রতে পারো। একটা ফাউন্টেন পেনের কালীর দোয়াত দাদাদের কাছ থেকে চেয়ে আন আর এর মুখের মাপের একটা কর্ক ও একটা লম্বা সরু নল জোগাড় কর, ফাউন্টেন পেনের যে কালী ভরার কাঁচের ড্রপার থাকে তাতেও চলবে। এখন কর্কটার মধ্যে ফুটো ক'রে খুব আঁটভাবে নলটা তার মধ্যে ইঞ্চি দেড়েক ঢুকিয়ে দাও। এইবার দোয়াতটা লাল রঙের জল দিয়ে ভর্ত্তি কর; তারপর কর্কটা এমনভাবে দোয়াতের মুখে বসিয়ে দাও যে লাল জল নলের গোড়ার দিকে ইঞ্চি দুই ওঠে। ব্যস, থার্ম্মমিটার তৈরী হয়ে গেল। এখন রোদে দোয়াতটা রাখ, দেখবে চড়চড় করে জল নলের মধ্যে উঠে যাচ্ছে, যত গরম হবে তত উঁচুতে উঠবে; আবার ঠাণ্ডা ক'রলেই জল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। যদি বলি যে ৩২° (ফারেণহীট) তাপে জল বরফ হয়, তাহ'লে বিশ্বাস হবে না নিশ্চয়ই। তাপে বরফ হবে কি ক'রে, বরফ তো হয় ঠাণ্ডায়। তা সত্যি বটে। কিন্তু বরফের চেয়েও এমন সব ঠাণ্ডা জিনিষ আছে যার কাছে বরফ তো বেশ গরম। ০° (সেন্টি') ডিগ্রীর তলায় আর ২৭৩ ঘর নীচে যদি পারাটা নামে তখন যে রকম ঠাণ্ডা হয়; সেই ঠাণ্ডাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় "ঠাণ্ডা" বলা হয়, তার ওপরে সব ঘরগুলোকেই বলা হয় "তাপ"। তাহ'লে বরফ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ঠাণ্ডার চেয়ে ২৭৩° গরম। পাড়াগাঁর ইস্কুলের ফার্ষ্ট বয় যদি সহরের একটা খুব ভাল ইস্কুলে এসে ভর্ত্তি হয় তা'হলে সেখানকার হয়ত ফোর্থ বয়ও তার চেয়ে বেশী নম্বর পাবে। সুতরাং এক জায়গায় ফার্ষ্ট বয় অন্য

জায়গায় এসে ফিফ্‌থ বয় হ'য়ে যাচ্ছে। তেমনি আমাদের কাছে বরফের মত ঠাণ্ডা জিনিষ বৈজ্ঞানিকদের কাছে গরম হ'য়ে যাচ্ছে। বেশী পণ্ডিত কি না!

বরফ, জল আর বাষ্প একই জিনিষ, তাপের কম বেশীর জন্য অবস্থা ভেদ। তোমরা জানো বাতাসে যথেষ্ঠ জলের বাষ্প আছে। যেখানকার মাটি ভিজে আর ঠাণ্ডা ও বাতাস তার চেয়ে গরম সেখানে বাতাসের জলীয় বাষ্প ভিজে ঠাণ্ডা মাটির ছোঁয়াচ লেগে জমে জলবিন্দু হয়ে যায় আর এই বিন্দুগুলো খুব ছোট ব'লে বাতাসে ভেসে বেড়ায়, এই রকম বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভাল ক'রে আলো দেখা যায় না। এই জলে ভরা বাতাসকে আমরা বলি কুয়াসা।

শীতকালে সকালবেলা ফুঁ দিয়ে বাতাস ছাড়লে দেখবে মুখ দিয়ে হু হু কোরে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, যেন সারারাত না খেয়ে খিদের চোটে পেটে আগুন ধ'রে গেছে। এর কারণ কি জানো? মুখের মধ্যেটা বেশ গরম আর জলে ভর্ত্তি। মুখ দিয়ে হাওয়া ছাড়লে খানিকটা গরম জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসে আর সেইটে বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে খুব পাতলা কুয়াসা সৃষ্টি করে আর তাই ধোঁয়ার মত দেখায়।

হয়তো তোমরা কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে ভোর বেলায় মাঠে বেড়াবার সময় দেখেছো যে ঘাস পাতা সব কিছুর ওপরে একটু একটু জল জমে আছে। একেই বলে শিশির কিম্বা হিম। রাত্তিরে তো বৃষ্টি হয় নি, এগুলো এলো কোথা থেকে। এই জলও বাতাসের জলীয় বাষ্প জ'মে তৈরী হ'য়েছে। যে বাতাস যত বেশী গরম সে বাতাস ততবেশী জলীয় বাষ্প ধ'রে রাখতে পারে। দিনের বেলা রোদের তাপে বাতাস গরম হয়ে ওঠে তখন সে অতি লোভীর মত যতখানি পারে জলীয় বাষ্প চুরী ক'রে নেয় পৃথিবী থেকে। কিন্তু রাতের বেলা যখন সারা পৃথিবী ঠাণ্ডা,

হ'তে সুরু করে তখনই হয় বাতাসের মুস্কিল, কিছুতেই এত বেশী জলীয় বাষ্প ধরে রাখা যায় না, কাজে কাজেই পৃথিবীর জল পৃথিবীকেই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হ'তে হয়। এই জল ঘাস পাতা ফুল ইত্যাদির ওপর পড়ে, আর তাকেই বলে শিশির। রোদ্দুরের তাপে হ্রদ, নদী ইত্যাদি জোলো জায়গা থেকে জল ক্রমাগত বাষ্প হ'য়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। তোমরা জানো যত উঁচুতে ওঠা যায় তত ঠাণ্ডা। বোধ হয় দার্জ্জিলিংএর ঠাণ্ডার কথা তোমাদের অজানা নেই। বাষ্প খুব উঁচুতে উঠে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে খুব ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। এই রকম কোটি কোটি জলকণা এক সঙ্গে মিলে প্রকাণ্ড একটা মেঘ তৈরী করে। জলকণা গুলো এত ছোট যে মেঘ ক্রমাগত আকাশে উঠতে থাকে, তারপর আবার নতুন মেঘ তৈরী হয়, এই রকম মেঘের পরে মেঘ জমে। জোর বাতাস মেঘকে দেশদেশান্তরে ব'য়ে নিয়ে যায়। তারপর যখন কোন কারণে বাতাস আর জলকণা গুলোকে ধরে রাখতে পারে না তখন এগুলো টুপটাপ করে মাটিতে পড়ে; একেই বলে বৃষ্টি হওয়া। যদি মেঘের জলকণা গুলো ওপরে গিয়ে দেখে খুব ঠাণ্ডা তা হলে তাড়াতাড়ি সে গুলো ছোট ছোট বরফের টুক্‌রো হ'য়ে যায় আর সে গুলো যখন মাটির বুকে ঝরে পড়ে তখন আমরা বলি শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন কেবল বাষ্পই যে আকাশে ওঠে তা নয়, ছোট ছোট ধূলিকণাও বাতাসের বেগে আকাশে উঠে যায়। মেঘের প্রত্যেক জলবিন্দু এক একটা ধূলিকণার চারধারে জমে ওঠে; এটা বিধাতেরই একটা খেলা। আকাশে যদি ধুলো না থাকতো তা হ'লে আর বৃষ্টি হ'তো না। কি আশ্চর্য্য! বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা বর্ষাকালে বাইরে নূন রাখলে দেখতে পাবে, বাতাসের জল লেগে নূন আস্তে আস্তে গ'লে যাবে।

তোমাদের ক্লাসে মাষ্টার মশাই যখন একবার একটা নতুন রকম অঙ্ক বুঝিয়ে দেন তখন দু'একটা ছেলে বেশ চটপট বুঝে নিয়ে সেই রকম আরো অন্য অঙ্ক ক'ষতে লেগে যাবে, কেউ কেউ খানিকটা খানিকটা বুঝতে পারবে আবার কেউ কেউ একদম কিছু না বুঝতে পেরে হয় হাঁ ক'রে ব'সে থাকবে না হয় পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প ক'রবে। মাষ্টার মশাই বুঝোলেন সবাইকেই সমানভাবে কিন্তু কেউ বা খুব ভাল বুঝলো কেউ কম বুঝলো কেউ বা বুঝতেই পারলো না। যদি উনুনের ধারে একটা কাঠের টুক্‌রো, একটা লোহার টুক্‌রো আর একটা কাঁচের টুকরো রাখা যায় তাহ'লে খানিকটা পরে দেখবে যে লোহার টুকরোটা ভীষণ গরম হ'য়ে গেছে হাত দেওয়াই যায় না, কাঁচের টুক্‌রোটা গরম হ'য়েছে তবে অত নয় আর কাঠের টুক্‌রোটাতো বল্‌তে গেলে গরমই হয়নি, তাপ লেগেছে সকলের ওপরেই সমান কিন্তু তোমাদের ইস্কুলের ছেলেদের মত কেউ কেউ বেশী তাপ নিতে পেরেছে কেউবা পেরেছে কম। এখন এই গরম টুকরো তিনটে বাইরের বাতাসে এনে রাখ, দেখবে লোহাটা চট্‌ ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে আর কাঠটা ঠাণ্ডা হবে সব চেয়ে দেরীতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে লোহা ভারী চট্‌পটে, তাপ নিতেও যেমন দিতেও তেমনি, কাঠ বেচারা বেশী কিছু নিতেও পারে না আর যা নেয় সহজে তা দিতেও চায় না। এই গুণকে বলা হয় পরিবাহন শক্তি, ইংরাজীতে বলে "কন্‌ডাক্‌টীভিটি" (Conductivity)। লোহার পরিবাহন শক্তি কাঠের পরিবাহন শক্তির চেয়ে বেশী। আচ্ছা চা-এর পেয়ালা সবই প্রায় কাঁচের আর চীনামাটির হয় কেন ব'ল্‌তে পারো? কাঁচের পরিবাহন শক্তি খুব কম তাই সহজে গরম চা রাখলেও তেতে ওঠে না কিন্তু লোহার পরিবাহন শক্তি বেশী ব'লে লোহার পেয়ালা এত শিগ্রী এত বেশী গরম হ'য়ে উঠবে; যে চুমুক দিলেই ঠোঁট পুড়ে যাবে; তাই কাঁচের

পেয়ালার এত চলন। কাঁচ চট করে গরম ক'রলে ফেটে যায় কেন? কাঁচের পরিবাহন শক্তি কম তাই একটা জায়গা গরম হ'লেও অন্য জায়গা গরম হ'তে চায় না, গরম জায়গাটা আয়তনে বেড়ে যায়, ঠাণ্ডা জায়গাটা বাড়ে না তাই ঠেলাঠেলির চোটে কাঁচটা যায় ফেটে। কিন্তু একটা জিনিষ মনে রেখো, গরমই কর আর ঠাণ্ডাই কর কোন জিনিষের আয়তন বাড়লে ক'মলেও ওজন কম বেশী কিছুতেই হবে না।

হ্যাঁ আর একটা কথা, সব জিনিষই তাপ পেলে বেড়ে যায় কিন্তু বরফগলা জলে তাপ দিলে সে ক'মতে থাকে আয়তনে, অবশ্য তার যখন তাপ ৪° (সেন্টিগ্রেডে) বেশী হ'য়ে যায় তখন সে আবার বাড়তে থাকে। আবার ১° তাপের জলে যদি আরো ঠাণ্ডা লাগান যায় তাহ'লে জলটা জ'মে বরফ হ'য়ে গিয়ে অনেকটা আকারে বেড়ে যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করে ওজন আর আকারের ওপর। জল আর বরফের ওজন ঠিক একই কিন্তু জমে গিয়ে বরফের আকার গেল বেড়ে সুতরাং আপেক্ষিক গুরুত্ব গেল ক'মে তাই জল আর বরফ এক জিনিষ হ'লেও বরফ জলে ভাসে।

—* শব্দ *—

আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি, বাতাস না থাকলে আমরা এক দণ্ডও টিকতে পারতাম না। আলো যেমন ঈথারের ঢেউ, শব্দও তেমনি বাতাসের ঢেউ, যেখানে বাতাস নেই সেখানে শব্দও হ'তে পারে না। বাতাসের কাঁধে চ'ড়ে শব্দের ঢেউ আমাদের কাণের পর্দ্দায় এসে আঘাত

ক'রে ফলে আমরা শুনতে পাই। শব্দ এক সেকেণ্ডে এগারোশো ফিট চলে। খালি ঘরে, পাহাড়ের নীচে, সাঁকোর তলায় শব্দ ক'রলে একটু পরেই সেই রকম আর একটা শব্দ শোনা যাবে। একে বলে প্রতিধ্বনি। একটা বল দেওয়ালের ওপর ছুড়ে দিলে সেটা আবার হাতেই ফিরে আসে। তেমনি শব্দের ঢেউও ঘরের দেওয়ালে কিম্বা পাহাড়ের গায়ে লেগে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে সেই জন্য প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাজ বা বন্দুকের শব্দ শোনবার আগেই তাদের আলোটা দেখা যায়; কিন্তু আলো আর শব্দের উৎপত্তি হয় এক সঙ্গেই; শব্দের গতির তুলনায় আলোর গতি অনেক বেশী, আলো যতটা এক সেকেণ্ডে যায় শব্দের সেই জায়গাটা যেতে লাগবে প্রায় এগারো দিন সুতরাং শব্দটা শুনতে পাবার আগে আমরা আলোটাই দেখতে পাবো।

একটা কাঁসার বাটির কাণায় একটা কাঠি দিয়ে ঘা মারো, ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হবে। লক্ষ্য ক'রে দেখো বাটির ধারটা থর থর ক'রে কাঁপছে; হাত দিয়ে কাঁপনি বন্ধ ক'রে দাও দেখবে শব্দও থেমে গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা জিনিষ খুব তাড়াতাড়ি কাঁপলে শব্দ তৈরী হয়। সেতারের তারে ঘা দিয়েও এই পরীক্ষাটা ক'রতে পারো।

দুটো সেতার পাশাপাশি রাখ, তারপর একটা সেতারের তারে ঘা দাও, দেখবে অন্য সেতারের একটা তারও সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনি বেজে উঠবে। কেন এ রকম হয় জানো? প্রথম সেতারটার তার যখন শব্দ ক'রে উঠলো তখন বাতাসের মধ্যে কাঁপনি সৃষ্টি হ'লো তাই তুমি শব্দ শুনতে পেলে, এখন সেই বাতাসের কাঁপনিটা অন্য সেতারের একটা বিশেষ তারে গিয়ে লাগলো ফলে সেটাও তালে তালে কেঁপে বেজে উঠলো। বাতাসের ঢেউতে যে শব্দ হয় তা ঠিক ক'রে বুঝতে পারবে যদি একটা প্রদীপ জ্বেলে তার কাছে একটা বোমা পটকা ফাটাও, দেখবে প্রদীপটা নিভে যাবে।

প্রচণ্ড শব্দের চোটে বাতাসে প্রবল ঢেউ জন্মাবে আর কাছাকাছি সব বাতাস তোলপাড় ক'রে উঠবে তাই প্রদীপটা যাবে নিভে।

যদি একটা পাতলা ধাতুর পাতকে আঘাত করা যায় তা হ'লে সেটা কেঁপে শব্দ ক'রবে, আবার যদি তার সামনে শব্দ করা যায় তা হ'লেও সেটা কাঁপবে। শব্দের কম বেশীর জন্য পাতটিরও কাঁপা কম বেশী হবে। এই মূলনীতির উপর নির্ভর ক'রে গ্রামোফোন তৈরী হয়। আমেরিকার এডিসন প্রথম গ্রামোফোন তৈরী করেন।

—* বিদ্যুৎ *—

ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে, আষাঢ় শ্রাবণ মাস, ঘরের মধ্যে রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে আছ হঠাৎ আকাশের একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত যেন চিরে গেল আর তার মধ্যে দিয়ে আগুনের হল্কা বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ফাটানো কাণে তালা ধ'রে যাওয়া শব্দ। ভয়ে মায়ের কাছের দিকে তুমি আরো স'রে যাও। তোমরা সকলেই জানো একে বিজলী বা বাজ বলে। সংস্কৃতে একটা গল্প আছে। বৃত্র ছিল একজন মহাশক্তিশালী অসুর। তার অত্যাচারে দেবতাদের সব স্বর্গ ছেড়ে পালাতে হ'য়ে ছিল। পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয় আর কি। তখন দেবতারা সব জোড় হাতে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে ব'ল্লেন "প্রভু, পৃথিবী যে যায়, রক্ষা করুন!" তাদের কাকুতি মিনতিতে বিষ্ণু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্লেন অবশেষে বল্লেন "মর্ত্তে দধিচী মুনি তপস্যা কর্'ছেন, যাও তাঁর কাছে, তিনি যদি তাঁর হাড় ক'খানা দেন তা'হলে বিশ্বকর্ম্মাকে ব'লো তাই দিয়ে অস্ত্র তৈরী ক'রতে, ইন্দ্র সেই অস্ত্র ছুঁড়ে বৃত্রকে মারলে সে বাছাধনের

আর বাঁচতে হবে না।" দেবতারা তখন গেলেন দল বেঁধে দধিচী মুনির আশ্রমে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কারোর মুখে কথা ফুট্‌লো না, কি ক'রেই বা বলা যায়—হে মুনি, আপনি মরুন আর আপনার হাড়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের হাড় জুড়োই। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রতে লাগ্‌লেন তাই না দেখে দধিচী মুনির কেমন সন্দেহ হ'লো, তিনি ধ্যান ক'রে সব জান্‌তে পারলেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। তিনি বল্‌লেন, "এই ব্যাপার, তা আমায় দিয়ে যদি আপনাদের সামান্য একটু মঙ্গলও হয়, তবে তাতে কি আমার কম সৌভাগ্য।" এই না ব'লে তিনি ধ্যানে ব'সলেন। একটু পরেই তিনি দেহত্যাগ ক'র্‌লেন। দেবরাজ তাঁর হাড় নিয়ে গিয়ে বিশ্বকর্ম্মাকে দিলেন; তিনি তাই থেকে বজ্র তৈরী ক'র্‌লেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ছুড়ে মারতেই বৃত্রাসুরকে আর উঠতে হ'ল না, সেই খানেই প'ড়ে ম'রলো। তারপর থেকে এখনো মাঝে মাঝে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে সেই বজ্র হুঙ্কার দিয়ে ওঠে দধিচীব আত্মত্যাগের কথা স্মরণ ক'রিয়ে দিতে। এসব অবশ্য পুরাণের কথা; বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তাপ, শব্দ আর আলোর মত বিদ্যুৎও এক রকম শক্তি। মানুষ আজ আকাশের বিদ্যুৎকে নিজের হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। নানান যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেরাই বিদ্যুৎ তৈরী ক'রে নিয়ে অনেক কাজে লাগাচ্ছে। তোমরাও নিজেরা বিদ্যুৎ তৈরী ক'র্‌তে পারো। একটা টাকা আর একটা পয়সা বেশ ক'রে জলে ধুয়ে নাও তার পরে টাকাটা রাখ জিভের ওপর আর পয়সাটা রাখ জিভের তলায় এখন টাকাটা আর পয়সাটা আস্তে আস্তে ছোঁয়াও দেখবে জিভটা চিন চিন ক'রে উঠবে। কেন জানো, এতেও একটু খানি বিদ্যুৎ তৈরী হ'য়ে জিভে লাগাতে এই রকম চিন চিন করে।

যেদিন মাথায় সাবান দেবে সে দিন মাথার জল শুকিয়ে গেলে একটা সেলুলয়েডের চিরুণী দিয়ে খানিকটা মাথা আঁচড়াও আর ত'রপরে

কতকগুলো ছোট ছোট কাগজকুচী টেবিলের ওপর রেখে তার কাছে চিরুণীটা ধ'রলে দেখবে কাগজগুলো মনের আনন্দে লাফাচ্ছে। এতেও চিরুণীতে খানিকটা বিদ্যুৎ তৈরী হ'চ্ছে আর তারই টানে কাগজ কুচীগুলো এই রকম লাফাচ্ছে। অবশ্য যে সব বিদ্যুৎ দিয়ে কাজকর্ম্ম করান হয় তার এর চেয়ে অনেক বেশী জোরাল সন্দেহ নেই। এই জোরাল বিদ্যুতের সাহায্যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। আগে আলো জ্বালতে কত মুস্কিল হ'তো, চকমকি, সোলা, এই সব দিয়ে অনেক কষ্টে আলো জ্বালতে হ'তো। তার পরে এলো দেশলাই, তাতেও অসুবিধা কম নয়, একটু ঝড় বাতাসে এসব আলো টি'কতে পারবে না। এখন কি সুবিধাই না হ'য়েছে, একটা সুইচ কেবল মাত্র টেপার অপেক্ষা অমনি ঘরে আলো জ্বলে উঠবে, শত জল ঝড়েও এ আলো নিভবে না। আবার এমন সব ইলেকট্রীকের আলো হ'য়েছে যাতে সুইচও টিপতে হয় না, অন্ধকার হ'লে আপনিই আলো জ্বলে ওঠে। বিদ্যুৎ তাপ সৃষ্টি করে। প্লাটিনাম এক রকম রূপোর মত শাদা আর খুব দামী ধাতু। এর একটা সরু তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ব'হে গেলে তারটি শিগ্রী গরম হ'য়ে ওঠে। ইলেকট্রীকের আলো এই জন্যই জ্বলে। একটা কাঁচের ফাঁপা বলের মধ্যে থেকে বাতাস বের ক'রে নেওয়া হয় আর এর ভেতরে একটা প্লাটিনাম কিম্বা ঐ রকম অন্য কোন ধাতুর প্যাচাল তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বহান হয়। ফলে তারটি খুব গরম হ'য়ে ওঠে কাজে কাজেই আলো দিতে সুরু করে।

চুম্বক বোধ হয় তোমরা জানো। এর সামনে লোহা আনলেই সে টেনে নেয়। সাধারণ লোহাকে বিদ্যুতের সাহায্যে চুম্বক করা যায়। একটা ইংরাজী "U" অক্ষরের মত বাঁকান লোহার দুটো ধারে সুতো দিয়ে ঢাকা তামার তার জড়ান থাকে। এখন এই তারের মধ্যে দিয়ে

বিদ্যুৎ বহালেই লোহাটা চুম্বক হ'য়ে যাবে, সব কিছু টানতে সুরু ক'রবে; বিদ্যুৎ যত জোরাল হবে চুম্বকের জোরও তত বাড়বে। তেমনি চুম্বক থেকেও সহজেই বিদ্যুৎ তৈরী করা যায়। খানিকটা সুতো ঢাকা তামার তার জড়িয়ে একটা রিঙের মতন ক'রে যদি একটা চুম্বক এই রিঙের মধ্যে ঘোরান যায়; তাহ'লে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ ব'হে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ আর চুম্বক একই বাড়ির লোক। বিদ্যুৎ থেকে চুম্বক তৈরী করা যায় আর চুম্বক থেকেও বিদ্যুৎ তৈরী করা শক্ত নয়। এই গুণের ওপর নির্ভর ক'রেই টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইলেক্‌ট্রিকের মোটর, ডাইনেমো ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তোমরা বোধ হয় জানো সুতো দিয়ে একটা চুম্বক ঝুলিয়ে দিলে সেটা উত্তর দক্ষিণ মুখ হ'য়ে সর্ব্বদা দোলে; এই থেকেই কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সূত্রপাত।

তোমরা আগেই শুনেছো যে আমরা ঈথার সমুদ্রে ডুবে আছি, আলো আর তাপ এই ঈথারেরই ঢেউ। আলোর ঢেউএর চেয়ে তাপের ঢেউ অনেক বড়। আবার তাপের ঢেউএর চেয়ে লম্বা এবং আলোর ঢেউএর চেয়েও অনেক ছোট আরো বহু রকমের ঢেউ আছে। "আল্‌ট্রা ভায়োলেট্ রে," "এক্স্‌রে" এরা সব শেষের ধরণের ঢেউএরই রকমফের। "আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্‌রে" বা অতিবেগুনী রশ্মি শরীর পক্ষে খুব ভাল, এ দিয়ে অনেক রকম চিকিৎসা করা হয়। সকাল ও সন্ধ্যাবেলার এবং পাহাড়ে জায়গার সূর্য্য কিরণে যথেষ্ঠ "আল্‌ট্রাভায়োলেট রে" থাকে। "এক্স রে" বা রঞ্জন রশ্মি হ'চ্ছে এক ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার। যেখানে সাধারণ আলো ঢুকতে পারে না "এক্স রে" সেখানে স্বচ্ছন্দে ঢুকে যায়, তাই অনেক জিনিষই যা আলোর কাছে অস্বচ্ছ "এক্স রের" কাছে তা একেবারে কাঁচের মতন স্বচ্ছ। একদিন "রন্‌জন্" নামে এক বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক একটা কাঁচের নলের মধ্যে থেকে বাতাস বের ক'রে নিয়ে তার মধ্যে

বিদ্যুৎ চালিয়ে পরীক্ষা ক'রছিলেন, কাছেই একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে একখানা ফটোগ্রাফীর প্লেট পড়ে ছিল। তিনি ভুলে এই অব্যবহৃত প্লেটটা "ডেভেলাপ" ক'রে ফেলেন, তখন দেখতে পেলেন যে প্লেটে কোন রকমে আলো লেগে গেছে। এর কারণ তিনি কিছুতেই ঠিক ক'রতে পারলেন না অবশেষে দেখেন যে সেই কাঁচের নলের মধ্যে থেকে এক রকম অদৃশ্য আলো বেরুচ্ছে, এর কাছে কাগজ, কাঠ, চামড়া, মাংস ইত্যাদি কম ঘনত্বের সব জিনিষ স্বচ্ছ, কেবল লোহা, তামা এই সব বেশী ঘনত্বের ধাতুগুলোই অস্বচ্ছ। তিনি এই আলোকে "এক্স রে" বা অজ্ঞাত আলো নাম দেন। এই "এক্স রে" যে আজকাল আমাদের কত উপকারে লাগছে তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। মনে কর, তুমি একটা লোহার পেরেক খেয়ে ফেল্লে, তখন পেটের মধ্যেকার "এক্স রে" আলো দিয়ে ফটো তুল্লে কোথায় পেরেকটা আটকে আছে তা চট্ ক'রে ধরা যাবে। শরীরের মধ্যে বন্দুকের গুলি, ধাতুর টুকরো ইত্যাদি ঢুকলে সহজেই তাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। কোনখানকার হাড় ভেঙে গেলে এই আলো ভাঙা জায়গাটা খুঁজতে কাজে লাগে। তাপের চেয়ে বহুগুণ লম্বা ঢেউগুলোকে "ওয়্যারলেস্ ওয়েভ্" বা বেতারের ঢেউ বলা হয়। পুকুরে ঢিল ফেল্লে যেমন ঢেউগুলো চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি বেতারের ঢেউগুলো কোন জায়গায় তৈরী হ'লে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। কথা গান ইত্যাদি যে কোন শব্দকে, এই রকম লম্বা লম্বা ঢেউয়ে পরিণত ক'রে ছেড়ে দিলে সারা আকাশময় এই ঢেউ ব্যপ্ত হ'য়ে প'ড়বে। অনেক দূরে অন্য কোন জায়গায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই ঢেউ ধ'রে আবার তাকে শব্দে রূপান্তরিত ক'রলে তখন আবার আগেকার কথা গান ইত্যাদি শোনা যাবে। এমনি ক'রে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিনি তারে কথাবার্ত্তা পাঠান হয়। এই হ'চ্ছে "ওয়্যারলেস" বা "রেডিওর" মূল নীতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
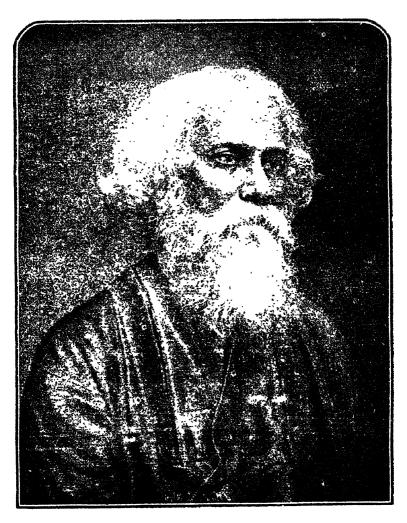
সন্ধানী ঃ-

কথাশিল্পী—সম্রাট শরৎচন্দ্র

—❋ বাতাস ❋-

আগেই ব'লেছি মাছেরা যেমন জলের মধ্যে ডুবে আছে আমরাও তেমনি বাতাসের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছি। আমাদের চারিধারেই বাতাস, এমন কি আমাদের শরীরের মধ্যেও যথেষ্ঠ পরিমাণ বাতাস র'য়েছে। আমরা যদিও বাতাস দেখতে পাইনে তবুও অনুভব করি হাড়ে হাড়ে। যখন বাতাসের বেগ অত্যন্ত বেড়ে ঝড়ের সৃষ্টি করে তখন প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ে আবার বাতাস জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে যখন নিস্তেজ নিথর হ'য়ে গুমোট গরম পড়ে অনেক তখন আবার আমরা হাঁফিয়ে উঠি। সুতরাং বাতাস যে আছে এতে কোন ভুলই নেই, বাতাস একটা পদার্থ। কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আচ্ছা পদার্থের কি কি গুণ থাকে? পদার্থ খানিকটা জায়গা অধিকার ক'রে থাকে আর তার ওজন আছে। একটা ফুটবল ব্লাডারের মুখ খুলে দিয়ে ওজন করো, এখন ব্লাডারটা কুঁকড়ে মুঁকড়ে একটুখানি জায়গা নিয়ে আছে। এইবার ফুঁ দিয়ে ব্লাডারটা গোল কর; তারপর সেটার মুখ বেধে ওজন ক'রে দেখবে এইবার ওজনটা কিছু বেশী। এই বেশীটুকুই ব্লাডারের মধ্যেকার বাতাসের ওজন। আবার এখন ব্লাডারটা গোল হ'য়ে খানিকটা আয়তনেও বেড়ে গিয়েছে; এই বেশী আয়তনটুকু বাতাসেরই আয়তন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাতাসের আয়তন আছে ওজনও আছে, তাহ'লে বাতাস একটা পদার্থ নিশ্চয়ই। বাতাসের শুধু ওজন নয় একটা নিজস্ব চাপও আছে। এই বার একটা ম্যাজিক শিখিয়ে

দিচ্ছি, এই দেখিয়ে বন্ধু বান্ধবদের অবাক্ ক'রে দিতে পারবে। একটা কাঁচের গ্লাস কাণায় কাণায় জল ভর্ত্তি ক'রে একখানা শক্ত কাগজ দিয়ে ঢাকা দাও। তার পরে কাগজের ওপর এক হাত দিয়ে চেপে ধ'রে আস্তে গ্লাসটি উল্‌টিয়ে দাও, এই বারে কাগজ থেকে হাত সরিয়ে নাও; দেখবে কাগজও পড়ছে না গ্লাস থেকে জলও পড়ছে না। আশ্চর্য্য নয় কি? কেন এমন হ'চ্ছে ব'ল্‌তে পারো? বাতাসের একটা নিজস্ব চাপ আছে আগেই বলেছি। বাইরের বাতাস শক্ত কাগজটার ওপর চাপ দিচ্ছে তাই জল প'ড়ছে না। বাইরের চাপটা ভেতরে জলের ওজনের চাপের চেয়ে অনেক বেশী। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে এক ইঞ্চি চওড়া আর এক ইঞ্চি লম্বা জায়গায় বাতাসের চাপ পড়ে প্রায় সাড়ে সাত সের। সুতরাং আমাদের গায়ের ওপর সর্ব্বদা সাড়ে চারশো মণ চাপ পড়ছে। কি ভীষণ! এ চাপে সব কিছুই তো চেপ্টা পাত হয়ে যাবে। কিন্তু সবই অভ্যাস আর তার ওপর বাতাসের চাপ সব ধারেই সমান ভাবে প'ড়ছে ও আমাদের শরীরের মধ্যে রক্তে যথেষ্ঠ চাপ বাইরের দিকে রয়েছে ফলে এই সবগুলো মিলেমিশে শোধবোধ হ'য়ে যাচ্ছে তাই আমরা এই ভয়ঙ্কর চাপ অনুভব ক'রতে পারছি না। অনেক উঁচুতে বাতাসের চাপ খুব কম, সে সব জায়গায় উঠলে বাইরে চাপ ক'মে যাওয়ায় শরীরের মধ্যেকার রক্তের চাপের দরুণ গায়ের চামড়া ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে।

মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত উঁচুতে বাতাস পাওয়া যায়। এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া আর এই পঞ্চাশ মাইল উঁচু বাতাসের ওজন আগেই বলেছি সাড়ে সাতসের। পারা বাতাসের চেয়ে অনেক গুণ ভারী; এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া আর ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু পারার ওজনও প্রায় সাড়ে সাতসের। এখন এক মুখ বন্ধ প্রায় বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটা

কাঁচের নল পারা দিয়ে ভর্ত্তি কর তারপরে খোলা মুখটা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ ক'রে এক গামলা পারার ওপর নলটাকে খাড়া করে দাঁড় করাও যাতে ক'রে বন্ধ মুখটা ওপর দিকে থাকে, এইবার আঙ্গুলটা স'রিয়ে নাও দেখবে নলের মধ্যে থেকে পারা খানিকটা নেবে প্রায় ইঞ্চি ত্রিশ উঁচুতে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবে। বাতাস যে পরিমাণ চাপ গামলার পারার ওপর দিচ্ছে এই নলের মধ্যেও পারাও সেই পরিমাণ চাপ গামলার পারার ওপর দিচ্ছে সুতরাং এই পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাতাসের চাপেরই পরিমাণ; এই হ'চ্ছে "ব্যারোমিটার" বা চাপমাণ যন্ত্রের মূল কথা।

বাতাসের চাপ প্রধানতঃ দুটো কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে স্থানের উচ্চতা। তোমরা বুঝতেই পারছো যত উঁচুতে যাওয়া যাবে ততই বাতাসের উচ্চতা কম হবে, সুতরাং চাপও যাবে ক'মে। জল ফোটার তাপের পরিমাণ নির্ভর করে বাতাসের চাপের ওপর, যতই বাতাসের চাপ ক'মবে ততই কম তাপে জল ফুটবে। মনে কর, তুমি আর তোমার মা কৈলাস পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছো; পথ হেঁটে খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে। মাকে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে ব'ল্লে। তিনি কাঠকুটো জ্বেলে ভাত চড়ালেন, জলও ফুটলো কিন্তু চাল কিছুতেই সিদ্ধ হয় না খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে হাঁড়ির দিকে হাঁ ক'রে ব'সে আছো। কিন্তু ভাত আর হ'চ্ছে না, হবেও না কখনো। কারণ কি জানো? আগেই ব'লেছি বাতাসের চাপ যতই কমে, জল ততই তাড়াতাড়ি ফোটে। কৈলাস খুব উঁচু জায়গা ব'লে জল খুব তাড়াতাড়ি ফুটে যাবে চাল সিদ্ধ হ'তে যতটা তাপের দরকার তা আর কিছুতেই হবে না। সুতরাং কৈলাস যেতে হলে নীচে থেকে ভাত রেঁধে নিয়ে যাওয়াই উচিৎ।

বাতাস নানান জিনিষ দিয়ে তৈরী, জলীয় বাষ্প তাদের মধ্যে একটা। এই বাষ্পের ওজন খানিকটা হাল্কা। তাই বাতাসে জলীয়

বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাতাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ক'মে যাবে, ফলে বাতাসের চাপও যাবে ক'মে, সুতরাং সাধারণ সময়ের মত অতখানি পারাকে নলের মধ্যে আর ঠেলে তুলে রাখতে পারবে না। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হ'লে ঝড় তুফানের সম্ভাবনা হয়। তাই ব্যারোমিটারের পারার উচ্চতা চট্ ক'রে ক'মে গেলে দুর্য্যোগভরা আবহাওয়ার আশঙ্কা করা হয়।

তোমরা জানো কোন জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করে তার আকার আর ওজনের ওপর। সুতরাং যদি কোন জিনিষের ওজন ঠিক থাকে কিন্তু আকার বেড়ে যায় তা'হলে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব যাবে ক'মে। তোমরা আরো দেখেছো যে দুটো তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থ এক সঙ্গে রাখলে যেটার গুরুত্ব কম সেটা ওপরে উঠে যাবে। এখন দিনের বেলা রোদের তাপে মাটি বেশী তাড়াতাড়ি গরম হ'য়ে পড়ে জলের চেয়ে, তাই মাটির ওপরের বাতাস শিগ্রী গরম হ'য়ে যাবে ফলে তার আকার যাবে বেড়ে ও আপেক্ষিক গুরুত্ব যাবে ক'মে সুতরাং গরম বাতাসটা ওপরে উঠে যাবে আর জলের ওপরকার ঠাণ্ডা বাতাস আসবে তার জায়গা ভর্ত্তি ক'রতে। আবার রাতের বেলা মাটি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে তাড়াতাড়ি সুতরাং তখন বাতাস ডাঙার দিক থেকে জলের দিকে বইতে সুরু ক'রবে। এই সব কারণেতে বাতাস বয় এধার ওধার। যদি কোন কারণে কোন কোন জায়গা তাড়াতাড়ি গরম হ'য়ে ওঠে, তখন সেখানকার বাতাস হুহু ক'রে ওপরে উঠে যায় আর সব জায়গা ভর্ত্তি ক'রতে ঠাণ্ডা বাতাস নেমে আসে। ফলে সেই জায়গাতে একটা ঝড়ের সৃষ্টি হবে। বিষুব রেখার ওপরে যে সব জায়গা আছে সে সব জায়গা গুলো সূর্য্যের সব চেয়ে বেশী তাপ পেয়ে খুব গরম হ'য়ে ওঠে, ফলে সেখানকার বাতাস হাল্কা হয়ে উঁচুতে উঠে যায় আর অন্যান্য সব ঠাণ্ডা দেশ থেকে

বাতাস এই সব জায়গা গুলোতে বয়ে আসে। এই রকম ক'রে সর্ব্বদা একটা বাতাসের প্রবাহ এইধার দিয়ে চলে। একেই বলে বাণিজ্য বায়ু বা "ট্রেইড্ উইণ্ড্" (Trade wind)।

রসায়ণ বিজ্ঞান

আমাদের ক'রকমের জিনিষ জানা আছে; একথা জিগ্যেস ক'রলেই ব'লবে—কেন দু'রকম, দুধ জল এসবের মত তরল জিনিষ একরকম আর ইঁট কাঠের মত কঠিন জিনিষ আর একরকম। ঠিক তা নয় কিন্তু, এ ছাড়া আরও একরকম জিনিষ আছে যেমন ধোঁয়া, এদের সব জাতভাইদের বলা হয় বায়বীয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে পদার্থ তিন রকম কঠিন, তরল আর বায়বীয়। একই জিনিষ তিন রকম ভাবে থাকতে পারে। ধর জল, যখন জমে বরফ হয় তখন তাকে বলা হয় কঠিন পদার্থ, যখন গরম হ'য়ে বাষ্প হ'য়ে যায় তখনি তাকে বলা হয় বায়বীয় আর নিজে তো সব সময়েই তরল হ'য়েই আছেন।

আগেকার আমাদের দেশের লোকেদের ধারণা ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝি পাচটা জিনিষ দিয়ে তৈরী যেমন ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুণ) মরুৎ (বাতাস), ব্যোম (আকাশ)।

সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, ছানাবড়া, সব আলাদা আলাদা জিনিষ খেতেও আলাদা কিন্তু সকলের মুলে কি ? একটা জিনিষ, সেটা হচ্ছে ছানা। সুতরাং এই সব খাবারের মুল বলা যেতে পারে ছানা। বৈজ্ঞানিকেরা

বলেন পৃথিবীময় যেসব জিনিষ দেখা যাচ্ছে সে সবই কয়েকটা মূল জিনিষ দিয়ে তৈরী। এই কয়েকটা মূল জিনিষকে তাঁরা বলেন "মৌলিক পদার্থ" বা "এলিমেণ্ট" (Element); আর কয়েকটা মৌলিক পদার্থ মিলিয়ে যে সব জিনিষ তৈরী তাদের বলা হয় "যৌগিক পদার্থ" বা "কম্পাউণ্ড" (Compound)। অবশ্য মৌলিক পদার্থরা একা একাও পৃথিবীতে অনেকে আছে।

জল একটা যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নামে দুটো মৌলিক বায়বীয় পদার্থ মিলে সৃষ্টি করে জলের। তেমনি বাতাসও আর একটা যৌগিক পদার্থ, এরও মূলে আছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য কয়েকটা মৌলিক বায়বীয় পদার্থ।

পণ্ডিতদের মতে মৌলিক পদার্থ ৯২টি। তবে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শতকরা নিরেনব্বই ভাগেরও বেশী তৈরী এদের মধ্যে দশটা দিয়ে, যেমন—অক্সিজেন, সীলিকণ (এর সঙ্গে অক্সিজেন মিশালে বালি তৈরী হয়) ক্যালশিয়াম (চূণ জাতীয় একটা পদার্থ), অ্যালুমিনায়ম, লোহা, সোডিয়াম, পটেশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম (দেয়ালীর দিন যে ইলেক্ট্রীকের তারগুলো জ্বালাও সেগুলো এই দিয়েই তৈরী), হাইড্রোজেন আর অঙ্গার।

একটা মোমবাতী জ্বালিয়ে রাখলে সেটা পুড়ে নষ্ট হ'য়ে যাবে, শেষে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে না হয়তো। এই জলজ্যান্ত মোমবাতীটা গেল কোথায়? বহুকাল ধরে পুরাযুগের বৈজ্ঞানিকদের মনে এই প্রশ্নটাই জেগেছিল। সমাধান অবশ্য হ'য়েছিল, কিন্তু অনেকদিন পরে। একজন বৈজ্ঞানিক ক'রলেন কি মস্তবড় একটা কাঁচের পাত্রে অনেকটা বাতাস পুরে তার মধ্যে একটা মোমবাতি রাখলেন। তারপর সবশুদ্ধ একটা দাঁড়িপাল্লায় চাপালেন ও অন্যদিকে কতকগুলো ওজন বাটখরা দিয়ে

পাল্লাটা সমান ক'রলেন, এইবার তিনি মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে পাত্রের মুখটা বন্ধ ক'রে দিলেন। আস্তে আস্তে অনেকটা মোমবাতী পুড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল; তারপরে বাতাসের অভাবে আগুণ গেল নিভে। অনেকটা মোমবাতী নষ্ট হ'য়ে গেল বটে কিন্তু দেখা গেল পাল্লা ঠিক সমানই আছে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে মোমবাতীর খানিকটা অংশ আমাদের চোখের সামনে থেকে স'রে গেলেও নষ্ট কিছু এতটুকুও হয়নি কারণ ওজন তো সমানই রয়েছে। নষ্ট হয়নি তো সেটুকু গেল কোথায়? বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন খানিকটা কঠিন মোমবাতী অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থে পরিণত হ'য়েছে তাই সেটুকুকে আর দেখা যাচ্ছে না। এমনি অনেক উদাহরণ দিয়ে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ ক'রে দিলেন পৃথিবীতে কোন জিনিষই নষ্ট হয় না, সমস্তই অক্ষয়। কেবল এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র। এই রূপান্তরই পৃথিবীর জীবন।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন সমস্ত যৌগিক পদার্থকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাঙতে সুরু ক'রলে সবশেষে এমন একটা ছোট টুক্‌রো পাওয়া যাবে যখন এটাকেও ভাঙ্‌লে সেই যৌগিক পদার্থটা আর থাকবে না, কয়েকটা মৌলিক পদার্থে পরিণত হ'য়ে যাবে। এই সবশেষের ছোট টুক্‌রোটাকে ইংরাজীতে বলে "মলিকিউল"; বাঙ্‌লায় "অনু" বলা যেতে পারে। এক একটা অনু কতবড় জান? একটা দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে ৬,৯১,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০টা অনু বেশ স্বচ্ছন্দে বাস ক'রতে পারে। এক একটা অনুর ভারের কমবেশীর জন্য যৌগিকপদার্থের ওজনেরও তারতম্য হয়। যদি একটা মৌলিকপদার্থকে ক্রমাগত ভাগ ক'রে যাওয়া যায় তা'হলেও এমন একটা অবস্থা আসে যখন আরো ভাগ করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, আরো ভাগ ক'রলে পদার্থটির আর অস্তিত্বই থাকে না। এই শেষ অবস্থার এক একটা কণাকে ইংরাজীতে বলে "অ্যাটম", বাঙ্‌লায়

একে "পরমাণু" বলতে পারো। কয়েকটা মৌলিক পরমাণু নিয়ে একটা যৌগিক অণুর সৃষ্টি হয়। তোমরা হয়তো ভাবছো এইবার হাতে সময় পেলেই একটা ছুরী দিয়ে ইঁটকাঠ যা পাবে তাকেই ভাগ ক'রে ক'রে অণু বা পরমাণু তৈরী ক'রবে। কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব, একটা অণুকে খালি চোখে দেখা দূরে থাকুক সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা অসম্ভব।

তোমাদের ক্লাসে কতকগুলো ছেলে আছে যারা খুব গায়েপড়া, তারা খুব তাড়াতাড়ি সবাইর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ব'সতে পারে; কিন্তু আবার কতকগুলো ছেলে আছে যারা কারুর সঙ্গে মিশতে চায় না কথা বলতে গেলেই হয় তেড়ে আসে নয় স'রে বসে। তেমনি মৌলিক আর যৌগিক পদার্থদের মধ্যেও কতকগুলো হ'চ্ছে ভারী আলাপী ও চটপটে; চট ক'রে এর ওর সঙ্গে ভাব ক'রে কথনো বা জোর জবরদস্তি ক'রে সকলের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে; আবার কতকগুলো পদার্থ আছে তারা ভারী গোমড়ামুখো কারুর সঙ্গে কথা ব'লবে না কিছুতে, এরা আবার অত্যন্ত অলস কোন কাজই ক'রতে চায় না। অক্সিজেন, ক্লোরীন, এই রকম কয়েকটা বায়বীয় পদার্থ আর সোডিয়াম, পটেশিয়াম এই রকম কয়েকটা কঠিন পদার্থ ভারী মিশুক আর চটপটে; কিন্তু নীয়ন, আর্গন, হিলিয়ম প্রভৃতি কয়েকটা বায়বীয় পদার্থ ভারী অসমাজী।

তোমরা জান পদার্থ তিন রকম—কঠিন, বায়বীয় আর তরল। মৌলিক পদার্থদের দু'ভাগে ভাগ করা হয় যেমন ধাতব আর সাধারণ। লোহা, তামা, টিন, সোনা, রূপো এই রকম; সব ধাতুগুলো হ'চ্ছে প্রথম শ্রেণীর, আর যেগুলো ধাতু নয় যেমন কয়লা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি এরা হ'চ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। ধাতুরা প্রায়ই খুব শক্ত হয়, এদের তাপ পরিবাহনশক্তি খুব বেশী, এরা খুব উজ্জ্বল হয়, এদের বৈদ্যুতিক

পরিবাহন ক্ষমতাও যথেষ্ঠ; এরা প্রায়ই সাধারণ অবস্থায় কঠিন থাকে কেবল একটি ধাতু তরল, এর নাম পারা। সাধারণ মৌলিক পদার্থ-দের ধাতুগত কোন গুণই নেই, এরা প্রায়ই বায়বীয় আর কঠিন হয়, কেবল-মাত্র ব্রোমিন বলে একটা মৌলিক পদার্থ তরল।

রেডীয়াম একটা ধাতু, এটা ভারী আশ্চর্য্যধরণের; ক্রমাগত এর থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে, অবশেষে একদিন রেডীয়াম তাপক্ষয়ের ফলে সীসা হ'য়ে যাবে; অবশ্য এ দু'এক দিনে হয় না, কোটি কোটি বছর লাগে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত রেডীয়াম ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিষ; সারা পৃথিবীতে মাত্র পাঁচ ছ' চামচে রেডীয়াম পাওয়া যায়। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় রেডীয়াম একমাত্র ওষুধ। এখন "অ্যাকটিনাম" ব'লে একটা এই রকমই ধাতু আবিষ্কার হয়েছে; এইটেই নাকি সবচেয়ে দামী।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

—* সৌরজগৎ *—

মেঘহীন অমাবস্যার রাতে আকাশের দিকে তাকাও, দেখবে শত শত সহস্র তারার মাথায় কালো আকাশ ঝলমল ক'রে উঠছে। মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়েছিল। শিশু জন্মানর পর থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েছে।

তার মা, দিদি এরা সবাই চাঁদ মামাকে ডেকে শিশুর কপালে টিপ দিয়ে যেতে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। কেবলই মনে হয় এই তারাগুলো কি। বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, এগুলো সব ছোট বড় আলাদা আলাদা সূর্য্য। এরা অনেকেই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরে আছে ব'লে এদের অত ছোট দেখাচ্ছে। আচ্ছা এই যে অগণন তারার দল এরা দিনের বেলায় পালায় কোথায়? আর রাত হ'লেই বা ফিরে আসে কি ক'রে? না, দিনের বেলায় ওরা পালায় না যার যেখানে জায়গা সে সেইখানেই থাকে কেবল সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোয় এরা ঢাকা প'ড়ে যায়। তোমরা দেখেছো তোমাদের গ্রামের দারোগা মশাইএর কি প্রবল প্রতাপ; কিন্তু যে দিন সদর থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামে আসেন সে দিন আর দারোগা মশাইএর সে প্রতাপ থাকে না তিনি প্রায় তখন চোখেই পড়েন না। তেমনি সূর্য্যের আলোয় সমস্ত তারাদের জারীজুরী ফুরিয়ে যায়। যখন সূর্য্যের আলো নিভে আসে তখন এই সব তারারা একে একে ফুটে উঠে আসর জমিয়ে বসে।

একটা বড় ঘুড়ি যখন আকাশে ওঠে তখন তাকে কত ছোট দেখায়। ঐ যে আকাশের ওপরে ছোট ছোট কালো জিনিষ উড়ছে দেখতে পাচ্ছো ওরা যখন নেবে আসবে তখন দেখবে ও'গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিল। দূরে গেলে সব জিনিষই খুব ছোট দেখায়। সূর্য্য প্রকাণ্ড, প্রায় তের লক্ষ একত্রিশটা পৃথিবীর জায়গা এই সূর্য্যের মধ্যে সহজেই হ'য়ে যাবে। সূর্য্য যে বহু দূরে আছে এ কথা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। আমাদের দেশ থেকে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি একটা রেললাইন পাতা থাকতো আর এই লাইন দিয়ে একবারো না থেমে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যদি একটা ট্রেণ চল'তো তাহ'লে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গাড়িতে চেপে ব'সেও এই ১৯৩৭-৩৮ সালে মামারবাড়ীর দেশে পৌছতে পারতে। ভাগ্যিস

সূর্য্যমামা অতদূরে আছেন তা না হ'লে তিনি যা ভীষণ গরম, কোন রকমে আমাদের কাছাকাছি এলেই তাঁর স্নেহের উত্তাপে আমরা দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতাম। সূর্য্য তো এতো বড় কিন্তু আবার আকাশে এত বড় বড় তারা আছে যার কাছে সূর্য্য একেবারে ছেলেমানুষ।

জ্যোতির্ব্বিদরা তারাদের কয়েক ভাগে ভাগ ক'রেছেন। যারা পৃথিবীর মতন আমাদের সূর্য্যের চারধারে ঘুরে বেড়ায় তাদের বলা হয় গ্রহ; চাঁদের মতন যারা কোন গ্রহের চারধারে ঘোরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ আর এই গ্রহ উপগ্রহ সমেৎ সূর্য্যের মত সমস্ত তারাদের বলা হয় নক্ষত্র। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্য একটা নয়, সংখ্যাহীন সূর্য্য আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত্রে নক্ষত্র আর গ্রহ দর চেনা যায়? যারা মিট মিট ক'রে জ্বলে তারা হ'চ্ছে নক্ষত্র আর গ্রহগুলো সব স্থির হ'য়ে জ্বলে। একটু লক্ষ্য ক'রলেই তারাদের কোনটা গ্রহ, কোনটা নক্ষত্র সহজেই চিনতে পারবে।

গ্রহ উপগ্রহদের নিজের কোন আলোই নেই সূর্য্যের ধার করা আলোতেই তারা আলোকিত। আমাদের সূর্য্যের নটা গ্রহ আছে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। বুধ হচ্ছে সূর্য্যের খুব আদুরে তাই তিনি একে কাছে কাছে নিয়ে বেড়ান; প্লুটো থাকে সূর্য্য থেকে সব চেয়ে দূরে। বৃহস্পতি আর মঙ্গলের মাঝখানে ছোট্ট ছোট্ট আরো কতকগুলো গ্রহের একটা দল আছে, এদের বলা হয় "গ্রহমালা" বা অ্যাস্টরইড্স্ (Asteroids) প্রত্যেক গ্রহের আবার কয়েকটা ক'রে উপগ্রহ আছে, এদেরই চাঁদ বলা হয়। পৃথিবীর একটি চাঁদ, বৃহস্পতির নটী, মঙ্গলের দুটি, ইউরেনাসের চারটি, নেপচুনের একটি আর শনিরও নটি চাঁদ। সূর্য্যমামা আর তাঁর দলবল সমষ্টিকে বলা হয় সৌরজগৎ।

দিন রাত হয় কি ক'রে? তোমরা ব'লবে যখন পূর্বদিকে সূর্য্য ওঠে তখন হয় দিনের সুরু। যখন চক্রাকার পথে বেড়াতে বেড়াতে সূর্য্য মাথার ওপর আসে তখন দুপুর হয় আর সূর্য্য গড়িয়ে পশ্চিম দিকে নেমে আসলে হয় সন্ধ্যা। তারপর যখন সূর্য্য অদৃশ্য হয় তখন রাত্রি নেমে আসে। তোমাদের সকলের ধারণা সূর্য্য পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর চারধারে ঘুরে চ'লেছেন। সেকালের লোকেরা তাই মনে করতেন; তাঁদের ধারণা ছিল পৃথিবীই বুঝি সমগ্র সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু আমাদের দেশের ভাস্করাচার্য্য বলে এক মহাপণ্ডিত বহুদিন আগে গণনার সাহায্যে অঙ্ক কষে আর রীতিমত প্রমাণ দিয়ে ব'লেছিলেন সূর্য্যই স্থির আর পৃথিবী তার চারধারে ভীষণ বেগে ছুটে চ'লেছে। তোমরা ব'লবে পৃথিবী যদি এতই বেগে ঘুরে চ'লছে তা'হলে আমরা তার গতি বুঝতে পারি না কেন? রেলগাড়ি চ'ড়ে কোথাও যাবার সময় নিশ্চয়ই দেখেছো গাড়ি যখন চ'লে তখন মনে হয় তুমি বুঝি স্থির রয়েছো আর গাছপালাগুলো সব তুমি যেধার থেকে এসেছে, সেইদিকে ফিরে যাচ্ছে। যদি গাড়ির ঝাঁকনি আর শব্দ কিছুই না থাকতো তবে বুঝতেই পারতে না যে গাছপালাগুলো স্থির আছে আর গাড়িটাই চ'লেছে। পৃথিবী অত্যন্ত নিঃশব্দে আর স্থির গতিতে ঘুরছে তাই তার চলাটা টের পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হ'চ্ছে যেন বাইরের সব কিছুই বুঝি ঘুরছে।

তোমরা জান পৃথিবী গোল আর তার উত্তর দক্ষিণ দিকটা কিছু চাপা। এই দুই চাপা দিককে বলা হয় মেরু। যদি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে পৃথিবীর পেটের মধ্যে কাঁটার যে দাগটা প'ড়বে তাকে বলা হয় পৃথিবীর মেরুদণ্ড। এরকম কাঁটা ফোটান অবশ্য অসম্ভব। কারণ এত বড় কাঁটাই বা পাবে কোথায় আর পৃথিবীর মধ্যেটা এত গরম যে সেখানে কিছু ঢোকান মাত্রই সেট

গ্রহণ
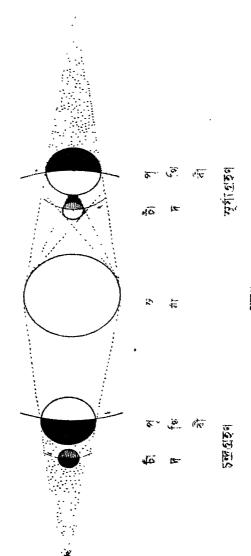
সন্ধানী :-

ঋতুপরিবর্ত্তন
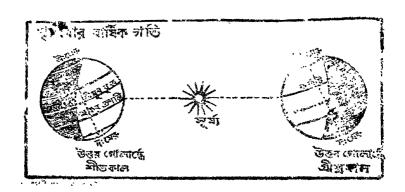
বাষ্প হ য়ে যাবে। যাক্, পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের চার ধারে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে। যখন যে ধারটা সূর্য্যের দিকে ফিরছে তখন সেইধারে হয় দিন আর অন্যধারে হয় রাত। মেরুদণ্ডটা যদি উত্তর দিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে যে বিন্দুতে গিয়ে এটা আকাশের সঙ্গে মিশবে সেই বিন্দু বরাবর একটা তারা আছে, তাকে বোধ হয় তোমরা সবাই জানো, এর নাম ধ্রুবতারা।

আচ্ছা, পৃথিবীর গ্রীষ্ম বর্ষা এই সব ঋতু পরিবর্ত্তন হয় কি ক'রে? পৃথিবা যেমন নিজের মেরুদণ্ডের চারধারে ঘুরছে তেমনি তার আরো একটা গতি আছে। তার মেরুদণ্ডটা সর্ব্বদা একটু কাত হ'য়ে থাকে। লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে খেতে সে বছরে একবার সূর্য্যের চারধারে ঘুরে আসে। তার মেরুদণ্ডটা বাঁকা ব'লে এক সময় সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর ওপর ঠিক সোজা হ'য়ে এসে পড়ে তখন পৃথিবীতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করা যায় তাই সেই সময়টাকে বলে গ্রীষ্মকাল আর যখন সূর্য্যের কিরণ এসে পড়ে কাত হ'য়ে তখন সূর্য্যের তাপ যায় ক'মে, সেই সময়টা সেইজন্য বেশ ঠাণ্ডা, একেই ব'লে শীতকাল। পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের চারধারে ঘোরাকে বলা হয় আহ্নিকগতি আর সূর্য্যের চারধারে ঘোরাকে বলা হয় বার্ষিকগতি। ২১শে জুন সবচেয়ে বড় দিন হয় আর সব চেয়ে বড় রাত হয় ২৩শে ডিসেম্বর ; দিন রাত সমান হয় ২১শে মার্চ্চ আর ২২শে সেপ্টেম্বর, এই দু'দিনকে যথাক্রমে বিষুবপদ আর হরিপদ বলা হয়। আগেই ব'লেছি পৃথিবী কিম্বা চাঁদের কোন নিজের আলো নেই সমস্তই সূর্য্য থেকে ধার করা আলো। চাঁদ পৃথিবীর চার ধারে ঘোরে প্রায় একমাসে। যখন পৃথিবীর যে ধারে সূর্য্য তার উল্টো দিকে থাকে চাঁদ তখন আমরা চাঁদের এক পিঠটা সম্পূর্ণভাবে আলোকিত দেখতে পাই সেসময় আমরা চাঁদকে দেখি একটা থালার মত। এই

সময়কে বলা হয় পূর্ণিমা। আবার চাঁদ যখন আসে পৃথিবী আর সূর্য্যের মাঝখানে তখন চাঁদের আলোকিত পিঠটা থাকে সূর্য্যের দিকে আর অন্ধকার পিঠটা থাকে আমাদের দিকে। তাই তখন আমরা চাঁদ দেখতে পাই না, একেই বলে অমাবস্যা। এই রকম অন্যান্য জায়গায় এসে আমরা চাঁদের অন্যান্য আকার দেখি। একে বলে চাঁদের কলা। আচ্ছা ভোর বেলায় আর বিকাল বেলায় যখন সূর্য্য থাকে না আকাশে তখন পৃথিবী তো ঠিক অন্ধকারে থাকে না! কেন? তোমরা আগেই দেখেছ আলো যদিও সোজা চলে তবু যখন সে একটা জিনিষের মধ্যে থেকে অন্য আর একটা জিনিষে গিয়ে ঢোকে তখন তার রাস্তাটা বেঁকে যায়। পৃথিবীর খানিকটা ওপর পর্য্যন্ত বাতাস; তার পরে মহাশূন্য; সূর্য্যের আলো শূন্যের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে যখন বাতাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন তার পথটা বেঁকে উঠে যায় তাই সূর্য্য নীচে নেবে গেলেও তার আলো উঠে এসে আমাদের ওপর পড়ে; ফলে ঊষা আর গোধূলির সৃষ্টি হয়।

আলো সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল চলে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর আলো আসতে সময় লাগে দেড় সেকেণ্ড আর সূর্য্য থেকে আসতে সময় লাগে আট মিনিট। আবার এমন সব দূরে দূরে তারা আছে যাদের আলো পৃথিবীতে আসতে লাগে একবছর, দুবছর, দশবছর, বিশবছর, এমন কি কোন কোন বছর পর্য্যন্ত কয়েকটা নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌছুতে লাগে। বোঝ এরা সব কি ভীষণ দূরে দূরে আছে। তোমরা নিশ্চয়ই সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের কথা জানো। পুরাণে একটা চমৎকার গল্প আছে। আকাশে রাহু নামে একটা রাক্ষস আছে। দেবতারা তার শরীরটা কেটে ফেলে দিয়েছিলেন শুধু গলা পর্য্যন্ত মাথাটা এখনো আছে। এই ভদ্রলোকের চাঁদ আর সূর্য্যের ওপর

মহা লোভ। সুবিধা পেলেই তাঁদের গিলে ফেলেন কিন্তু পেট তো আর নেই তাই দুই মামা টুপ ক'রে তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন; যতক্ষণ তাঁরা রাহুর মুখের মধ্যে থাকেন ততক্ষণই হয় গ্রহণ। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা এসব মানেন না। তাঁরা অন্য কথা বলেন। সূর্য্য, চাঁদ পৃথিবী সবাই ঘুরতে ঘুরতে কোন কোন পূর্ণিমার দিন এক এক সময় এমন এক ব্যাপারের সৃষ্টি করেন যখন তিন জনাই প্রায় এক সরল রেখায় এসে দাঁড়ান তখন পৃথিবীর ছায়া প'ড়ে চাঁদ একবারে ঢেকে যায় আর আমরা বলি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হ'লো; যদি ঠিক সরল রেখায় না এসে তার কাছাকাছিও তিন জনায় দাঁড়ান তাহ'লেও চাঁদের খানিকটা ঢাকা প'ড়ে গ্রহণ হয়; একে বলে আংশিক গ্রহণ। আবার যখন চাঁদ সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে সরল রেখায় এসে পড়ে তখন কিন্তু চাঁদ সূর্য্যকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল ক'রে দাঁড়ায় আর তাই হয় সূর্য্যগ্রহণ, এ ব্যাপারটা ঘটে অমাবস্যার দিন। আগেকার মত এবারেও আংশিক অথবা পূর্ণগ্রহণ হয়। আবার আরেক রকম ভারী মজার জিনিষ কখনো কখনো ঘটে। সময় সময় চাঁদ সূর্য্যের ঠিক মাঝখানটা ঢেকে ফেলে আর এই অন্ধকারের চারধারে আঙটির মত উজ্জ্বল সূর্য্য দেখতে পাওয়া যায়, একে "বলয় গ্রহণ" বলা যেতে পারে। চাঁদ পৃথিবী আর সূর্য্যের চেয়ে অনেক ছোট হওয়াতে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যগ্রহণ মাত্র খানিকটা জায়গা থেকেই দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকরা গণনা ক'রে ব'লেছেন খুব বেশী ধরলে বছরে সাতটা গ্রহণ হ'তে পারে, চারটে সূর্য্যগ্রহণ আর তিনটে চন্দ্রগ্রহণ কিম্বা পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ও দুটো চন্দ্রগ্রহণ; তবে বছরে দুটো সূর্য্যগ্রহণ হবেই হবে। কিন্তু আগেই ব'লেছি যে সূর্য্যগ্রহণ সব জায়গা থেকে একসঙ্গে দেখা যায় না তাই আমরা এতগুলো গ্রহণ এক জায়গা থেকে দেখতে পাই না।

এবার খানিকটা গ্রহদের গল্প বলি শোনো। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহের নাম মঙ্গল। বৈজ্ঞানিকরা বলেন মঙ্গল গ্রহতে আমাদের মতই বায়ুমণ্ডল আছে। অনেকের মতে মঙ্গলগ্রহে জীবের বাসও র'য়েছে। এই গ্রহের বছর হয় ৬৮৭ দিনে। সূর্য্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহের নাম বুধ। গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট এইটি। বুধের বছর ৮৮ দিনে। যদি বুধে কোন স্কুল থাকতো তাহ'লে সেখানকার ছেলেরা তিন মাস অন্তর অন্তরই ক্লাস প্রমোশন পেয়ে যেতো। গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হ'চ্ছেন বৃহস্পতি এঁর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় এগারোগুণ। বৃহস্পতির ৪৩৩২ দিনে বছর। শনিগ্রহ একটি অদ্ভুত জিনিষ, এর চাঁদ হ'চ্ছে নটি তাতেও এর তৃপ্তি নেই তাই একে ঘিরে কয়েকটি আংটির মত জিনিষ আছে। এগুলোতে যথন সূর্য্যের আলো প'ড়ে তখন যে কি চমৎকারই দেখায় তা আর কি ব'লবো। শনির বছর ১০৭৫৯ দিনে। প্লুটোগ্রহ সবচেয়ে নতুন আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ১৯৩০ সালে ডাঃ স্লিপার একে খুঁজে বার করেন। যদি একটা তিরেনব্বই লক্ষ মাইল লম্বা মাপ কাঠি যোগাড় ক'রতে পারো তা হলে বুধ থেকে সূর্য্যের দূরত্ব হবে প্রায় সেই কাঠির চার কাঠি, শুক্রের সাত কাঠি, পৃথিবীর দশ কাঠি, গ্রহমালাদের ছাব্বিশ কাঠি, বৃহস্পতির বাহান্ন কাঠি, শনির পঁচানব্বই কাঠি, ইউরেনাসের একশো একানব্বই কাঠি, নেপচুনের তিনশো কাঠি আর প্লুটোর প্রায় চারশো কাঠি।

নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়া আকাশে আরো অনেক রকম জিনিষ আছে। নির্ম্মেঘ অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে উজ্জ্বল মেঘের মত খানিকটা খানিকটা জিনিষ এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা বা নেবুলা (Nebula) জ্যোতির্ব্বিদরা বলেন এগুলো নানান জিনিষের গরম বাষ্প,

আকাশের কোটী কোটি মাইল জায়গা জুড়ে বসে আছে। এইগুলোই জমাট বেঁধে এক একটা সৌরজগতের সৃষ্টি করে। অন্ধকার রাত্রে আরো একরকম জিনিষ দেখা যায়। এদেরও দেখতে ধোঁয়াটে মেঘের মত তবে এরা আকাশের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত সরল ভাবে পথের মত হ'য়ে পড়ে আছে। কিন্তু এরা আসলে মেঘও নয়, পথও নয়। কোটী কোটী নক্ষত্র আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে আকাশের একদিকে জ'মে থাকার জন্য এই রকম দেখায়। এর নাম হ'চ্ছে ছায়াপথ। গ্রীক পুরাণে আছে বৃহস্পতির স্ত্রী জুনো তাঁর ছেলে মঙ্গলকে দুধ খাওয়াবার সময় সারা আকাশময় দুধ ছড়িয়ে ফেলেছিলেন; তাই থেকেই ছায়াপথের উৎপত্তি; এই জন্যই এর ইংরাজী নাম "মিল্কীওয়ে", এর আর একটা নাম হ'চ্ছে "গ্যালাক্সী"। আকাশে মাঝে মাঝে ঝাঁটার মতন চেহারার আর এক রকমের জিনিষ দেখা যায়। এদের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতুর চেহারা হ'চ্ছে একটা কেন্দ্রীভূত আলোর পেছনে প্রকাণ্ড একটা লেজ লাগান। অনুমান করা হয়, গলিত লোহা আর পাথরের পুঞ্জীভূত পিণ্ড ওদের দেহ আর তাই থেকে যে বাষ্প বের হয় তাই ওদের লেজ। ধূমকেতুগুলো আমাদের সৌরজগতের কেউ নয়। অজানা আকাশ থেকে এসে অজানা আকাশেই চ'লে যায়। তোমরা কেউ কেউ হয়তো "হেলীর ধূমকেতুর" নাম শুনে থাকবে। এটা দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালে, অনুমান ৭৭ বছর পরে একে আবার দেখা যাবে। এসব ছাড়াও আর এক রকম জিনিষ মহাশূন্যে দেখা যায়। এদের নাম উল্কা। এরা আলোকহীন কতকগুলি কঠিন জিনিষ, নিকেল লোহা পাথর এই সব দিয়ে তৈরী। একটা বালির কণার ওজন থেকে দুশো তিনশো মন এমন কি অনেক সময় তার চেয়েও অনেক গুণ বেশী ওজনের উল্কা আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

অনুমান করা যায় যে এগুলো ধূমকেতু ও অন্যান্য গ্রহেরই অংশ। দিনরাত এবং বছরের সব সময়েই উল্কাপাত হয়। তবে আগষ্ট মাসের ৯, ১০, ১১ তারিখে আর নভেম্বর মাসের ১২, ১৩ ১৪, ও ২৭, ২৮, ২৯ তারিখেই খুব বেশী উল্কাপাত হয়। উল্কারা নিজের খেয়ালে আকাশে ঘুরে বেড়ায়; পৃথিবীর কাছে এসে প'ড়লে পৃথিবী তাদের ছেড়ে দেয় না, প্রবল বেগে টেনে ধরে আর সেগুলোও ভীষণ বেগে মাটির দিকে ছুটে আসে; সেই সময় সেগুলো বাতাসের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে। কলিকাতা যাদুঘরের একতলার বাঁ দিকের ঘরে অনেকগুলো উল্কা রাখা আছে, একদিন গিয়ে দেখে এসো। একটা উল্কা পিণ্ড ১৯৩১ সালে পর্ত্তুগালের লিসবন সহরের চারধার আলো ক'রে সমুদ্র গিয়ে প'ড়েছিল। এইটেই নাকি ভূপতিত উল্কাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়।

খালি চোখে প্রায় সাতহাজার তারা দেখা যায়। জে, ঈ, গোর্ বলেন দুরবীন দিয়ে দেখলে ৭,০০,০০,০০০ তারা দেখা যায় আর ইয়ং বলেন ১০,০০,০০,০০০; তবে আজকালকায় সকলের মতে দুরবীক্ষণ দিয়ে প্রায় ১৬০,০০,০০,০০০ তারা দেখা যায়। কিন্তু দুরবীণ দিয়েও যে সব তারা দেখা যায় না তাদের সংখ্যা যাদের দেখা যায় তাদের চেয়েও অনেক গুণ বেশী।

আগেই বলেছি হিন্দু জ্যোতিষীরা জানতেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চারধারে গোল হ'য়ে ঘোরে। তাঁরা পৃথিবীর এই গোল রাস্তাটাকে বারোটা ভাগে ভাগ ক'রেছিলেন, এক একটি ভাগের নাম এক একটি রাশি। মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন এই হ'চ্ছে বারোটা রাশি। এই বারোটা রাশিতে তাঁরা সাতাশটা নক্ষত্রকে লক্ষ্য ক'রে রেখেছিলেন, যথা—অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, অশ্বিনী, পূষ্যা, মঘা, পূর্ব্ব ও

উত্তর ভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, শতভিষা আর রেবতী। রাশি চক্রের যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকলে পুর্ণিমা হয় সেই নক্ষত্র অনুসারে সেই মাসের নাম হয়, যখন বিশাখা নক্ষত্র পুর্ণিমা হ'লে মাসের নাম হবে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠার জ্যৈষ্ঠ, ভদ্রায় ভাদ্র ইত্যাদি।

—॥ পৃথিবী ॥—

তোমরা জান, আমাদের পৃথিবী বিরাট সৌরজগতের একটা অংশ। এ অন্যান্য গ্রহদেরই মধ্যে একজন। আমাদের জ্ঞানের পরিধি আমাদের নিজেদের গ্রাম বা সহর কি বড় জোর আমাদের বাঙলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তোমাদের মধ্যে যারা বোম্বাই, পেশোয়ার, কাশ্মীর প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছো তারা হয়তো গোটা ভারতবর্ষের আয়তন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ক'রতে পারবে। কিন্তু সারা পৃথিবী এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়। যদি পৃথিবীকে চারধারে জড়িয়ে বাঁধবার তোমাদের ইচ্ছা হয় তা'হলে একটা অন্ততঃ পঁচিশ হাজার মাইল লম্বা দড়ি খুঁজতে হবে। আবার যদি একটা কাঠিকে পৃথিবীর এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে বিঁধোবার দরকার হয় তাহ'লে একটা আট হাজার মাইল লম্বা কাঠি চাই। পৃথিবীর ওজন হ'চ্ছে ১৬৮, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মণ। তোমরা সবাই জানো, অন্ততঃ শুনেছো, যে পৃথিবী গোল তবে কমলা লেবুর মত উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা। তোমাদের মধ্যে অনেকেই ব'লবে

আমরা পৃথিবীকে এমন চমৎকার সোজা সমতল দেখি, এ আবার গোল হ'তে যাবে কি ক'রতে! আচ্ছা, একটা কাজ কর, যত বড় দেখে পারো একটা দড়ি জোগাড় কর, দড়িটা যত লম্বা হবে ততই ভাল। এই বার তোমাদের ফুটবল খেলার মাঠের মাঝখানে একটি খুঁটিতে দড়ির এক মুখ বাঁধো; তারপর দড়ির আর একটা মুখে মুখে একটা ছোট্ট কাঠি বাঁধো এই বার দড়িটা টান ক'রে ধ'রে ছোট কাঠিটা মাটিতে ঘসতে ঘসতে খুঁটির চারধারে ঘুরে এসো দেখবে একটা প্রকাণ্ড গোল দাগ হ'য়েছে। এই দাগটার এক এক ফুট ক'রে মুছে ফেলো দেখবে প্রত্যেক ছোট দাগটাই একটা সরল রেখার মত মনে হচ্ছে। তেমনি পৃথিবী এত বড় আর আমরা যতটুকু দেখতে পাই সেটুকু সারা পৃথিবীর তুলনায় এত ছোট যে এই ছোট ছোট টুক্‌রো গুলোকে সমতল বলেই মনে হয়। পৃথিবী যে গোল তার অনেক অবশ্য প্রমাণ আছে; তোমাদের গোটা কয়েক প্রমাণ দিচ্ছি। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কোন জাহাজকে উপকূলে আসবার সময় লক্ষ্য ক'রলে আমরা প্রথমে তা'র ধোঁয়াগুলো দেখতে পাই, জাহাজটা তখন মনে হয় জলের অনেক নীচে ডুবে আছে আর জলের ওপর থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার পর জাহাজের সব চেয়ে উঁচু মাস্তুল চোখে পড়ে তার পর তার ধোঁয়া ছাড়বার ফানেলগুলো দেখা যায়। এই রকম ক'রে জাহাজ যতই কাছে আসে ততই তার নীচের অংশগুলো দেখা যায়, পৃথিবী যদি গোল না হ'তো তা হ'লে এটা কি ক'রে হবে। দেখা গেছে ড্রেক; ম্যাগ্‌লীন প্রভৃতি অনেক নাবিক ক্রমাগত এক দিকে জাহাজ চালিয়ে গিয়ে যে জায়গা থেকে প্রথমে যাত্রা ক'রেছিলেন আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এসেছেন। পৃথিবী গোল না হ'লে এ কিছুতেই সম্ভব হ'তো না। আমরা আগেই দেখেছি যে চন্দ্রগ্রহণের

সময় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে এই ছায়াটা সর্ব্বদাই গোল। এইটাই হ'চ্ছে পৃথিবীর গোলত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সৌরজগৎ আলোচনা ক'রবার সময় আমরা নীহারিকার কথা জেনেছিলাম। লা প্লাঁস প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে এই থেকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হ'য়েছে। স্যার জেমস্ জীন্ ও জেফ্রিস নামে দুজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পৃথিবীর উৎপত্তির পরিকল্পনা সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁরা বলেন যে অতি আদিম কালে গ্রহ উপগ্রহ কিছুই ছিল না; নীহারিকা থেকে সবে সৃষ্ট সূর্য্য প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় এক বিরাট নক্ষত্র এই শিশু সূর্য্যের কাছে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। আমরা জানি চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের তারতম্যের জন্য পৃথিবীর সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা হয়। এই বিরাট নক্ষত্রও সূর্য্যের ওপর বিরাট আকর্ষণের প্রভাব বিস্তার ক'রতে লাগলো। এই প্রচণ্ড টানের ফলে সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পের গোলা থেকে একটা ছোট বাষ্প পিণ্ড ঠেলে বেরুতে লাগলো। নক্ষত্রটি যতই নিকটে আসতে লাগলো বাষ্প পিণ্ডটা তত ঠেলে উঠতে লাগলো। অবশেষে নক্ষত্রটি যখন সূর্য্যের একেবারে কাছে এসে পৌঁছুলো তখন এই পিণ্ডটি শসার আকার ধারণ ক'রে তার ওপরে পড়তে গেল। এমন সময় কোন কারণে আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে নক্ষত্রটি স'রে চলে গেল। শসার মতন চেহারার পিণ্ডটি আর সেই নক্ষত্রের ওপরে এসে পড়বার সময় পেলো না। ক্রমে ক্রমে ঘোরার ফলে এই পিণ্ডটা সূর্য্য থেকে পৃথক হ'য়ে পড়লো; তারপর আস্তে আস্তে তাপ হারিয়ে ফেলাতে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসতে লাগলো; এইবার এইটে

ভেঙেচুরে কয়েকটি গ্রহে ও উপগ্রহে পরিণত হ'লো এবং সৌরজগতের নিয়মানুসারে সকলেই সূর্য্যের চারিধারে ঘুরতে লাগলো। এই রকম ক'রেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই ভাবে সৃষ্টি হবার প'র তরল পৃথিবী তাপ হারাতে হারাতে সূর্য্যের চারধারে ঘুরতে লাগলো। এই তরল জিনিষটা কোনও একটা বিশেষ জিনিষের তৈরী নয় অনেকগুলো বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জিনিষ দিয়ে এইটে তৈরী ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এই সব জিনিষগুলো নিজের নিজের গুরুত্ব অনুসারে কেন্দ্র থেকে ওপর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। সব চেয়ে ভারী ভারী সব কিছু থাকলো কেন্দ্রের কাছাকাছি আর হাল্কা জিনিষগুলো ওপর দিকে ভেসে উঠ্‌লো; ক্রমে পৃথিবীর উপর দিকটা বেশী ঠাণ্ডা হ'য়ে জ'মে গেল। এতে পৃথিবীর গায়ের ওপর একটা শক্ত পাথরের চামড়ার সৃষ্টি হ'লো। পৃথিবীর বাষ্পীয় আদিম উপাদান জলীয় বাষ্পের অভাব ছিল না! এই এই সমস্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে জলে পরিণত হ'লো আর এই জল মহাসাগর রূপে পৃথিবীর আবরণের সব নীচু জায়গাগুলোতে স্থান পেলো। সে সমস্ত বায়বীর পদার্থগুলো আগে কাজে লাগেনি এই বার সেইগুলো মিলে বাতাস সৃষ্টি করলো। আর এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে ঘিরে রইল। এই হচ্ছে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিকদের পরিকল্পনা।

পৃথিবীর বয়স কত জানো। শুনলে অবাক হবে যে পৃথিবী কত বুড়ো, এর বয়স হচ্ছে প্রায় দু'লাখ কোটি বৎসরের মধ্যে। যখন পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল তখন এর খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল এই পরে জ'মে গিয়ে হ'লো চাঁদ। চাঁদ ক্রমাগত পৃথিবী থেকে স'রে যাচ্ছে। চাঁদ এখন যেখানে আছে পৃথিবী থেকে সেখানে যেতে এখন যে গতিতে চাঁদ স'রে যাচ্ছে সেই গতিতে তার লাগে প্রায় দু লাখ

কোটি বৎসর। পৃথিবীর বয়সও প্রায় এই রকম। উরেনীয়াম্, থোরিয়াম ইত্যাদি কয়েকটা ধাতু ক্রমাগত কিরণ ছড়াতে ছড়াতে অবশেষে হিলিয়াম ও সীসাতে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পাথরে সীসা মিশানো উরেনীয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি দেখে স্থির ক'রেছেন যে যতটা সীসা তৈরী হ'য়েছে উরেনিয়াম ও থোরিয়ান থেকে ততটা হ'তে লাগে প্রায় তিন লাখ কোটি বছর। এই সব থেকে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বয়স নিশ্চয়ই তিন লাখ কোটি বছরের কম ও দু'লাখ কোটি বছরের বেশী।

ভূবিজ্ঞান

—※ জীবনের ক্রম-বিকাশের ধারা ※—

পুরাযুগের কথা জানতে হ'লে আমাদের সেই যুগে লেখা ইতিহাস প'ড়তে হয়। বইএর পাতার পিঠে ইতিহাস থাকে লেখা। কিন্তু বহুকাল আগে যখন পৃথিবীতে মানুষেরই চিহ্ন ছিল না তখন বই আসবে কোথা থেকে! তা হ'লে সে সব যুগে যা ঘ'টেছিল তার কথা কি আমরা কিছুই জানতে পারবো না? অবশ্য আমরা কল্পনায় সে সব

যুগের কথা ভাবতে পারি; কিন্তু কল্পনায় আর যাই হোক না কেন ইতিহাস লেখা চলে না। তবে আমাদের অন্য উপায়ও আছে, সে যুগে মানুষের লেখা বই না থাকলেও প্রকৃতির লেখা বই যথেষ্ঠ পাওয়া যায়। পাহাড়ে, পর্ব্বতে, আকাশে, বাতাসে পৃথিবীর যুগ যুগান্তরেরই ইতিহাস লেখা আছে। শুধু আমাদের সেই সব লেখা পড়বার চোখ চাই। যে দিন আমরা এই সমস্ত লেখা প'ড়তে পারবো, যে দিন আমাদের প্রকৃতির বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় হবে সে দিন পৃথিবীর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্তের গল্প আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

পথে ঘাটে যে সব ছোট ছোট পাথরের নুড়ি প'ড়ে থাকে তারাই হয়তো কেউ কেউ পৃথিবীর ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার দু একটা। কবে কোন যুগে কোথায় এই পাথরের টুকরোর সৃষ্টি হ'য়েছিল। হয়তো প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে এর হ'লো জন্মলাভ। তার পরই সুরু হ'লো এর কঠিন জীবনের যুদ্ধ। জল বাতাস সবাই একে নষ্ট ক'রে ফেলতে চেয়েছে। তাদের অত্যাচারের দাগ এখনও এর বুকে আঁকা আছে। বাতাসে একে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেললো কোন পাহাড়ের ধারে। বৃষ্টি তাকে টেনে ফেলে দিল গভীর উপত্যকায় কোন পাহাড়ে-নদীর বুকে। নদীর জল-ধারা তাকে কঠিন মাটির ওপর দিয়ে ঘ'সতে ঘ'সতে নিয়ে গেছে কত দূরে; জলের চাপে পাথরটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে, ঘ'সে ঘ'সে তার গা হয়েছে মসৃন, কোণাগুলো গিয়েছে মরে। এ হয়তো ভাগ্যক্রমে কোন রকমে তীরে আটকে গিয়ে এখনো বেঁচে আছে। এরই অন্যান্য জ্ঞাতভাইদের নদী গুঁড়িয়ে বালী ক'রে ফেলেছে, তাদের তারপর সমুদ্রতীরে এনে ফেলে তাদেরই দেহ দিয়ে সমুদ্রের তট তৈরী ক'রেছে। পাথরটা হাতে ক'রলে তার আর্ত্তনাদ

কাণে এসে পৌঁছাবে, নদীর জল-ধারার গান এখনো শুনতে পাবে। যদি সামান্য একটি পাথরের নুড়িতে এত ইতিহাস লেখা থাকতে পারে তাহ'লে না জানি পাহাড়ে পর্ব্বতে গিরিকন্দরে কত ইতিহাসই না লেখা আছে। শুধু তাদের পড়বার জন্য চাই চোখ।

তোমাদের আগেই বলেছি পৃথিবী তার ছেলে বেলায় ছিল অত্যন্ত গরম। সেই সময় এখানে কোন জীবের বাসের কল্পনাই করা যায় না। তার পর কালে কালে সব ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো, পৃথিবীর দেহের ওপরটা গেল শক্ত হ'য়ে জমে। তারপর আরো যখন ঠাণ্ডা হ'ল তখন কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এখানে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। সেই প্রাণ-বিন্দুটি কত শত যুগের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হ'তে হ'তে আজ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের রূপ ধ'রে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা চারধারে অজস্র রকমের জীবের দেখা পাই। সকলের ওপরে রাজত্ব ক'রছে মানুষ; তারপরে হাতি, বাঁদর, পিঁপড়ে এই সব বুদ্ধিমান প্রাণীর স্থান। তার তলায় আছে যত বুদ্ধিহীন প্রাণী। জলের মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা ওদের চেয়েও নীচু জাতের। প্রাণী জগতের সব চেয়ে তলায় স্পঞ্জ আর জেলীফিস জাতীয় জীব। এরা গাছ আর প্রাণীর মাঝামাঝি। এদের পরেই ডাঙ্গার আর জলের গাছ পালার কথাই মনে হয়।

আমাদের দেখতে হবে, কোনটা ঠিক, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল পৃথিবী সহসা এই সব বহুতর জীবে ও উদ্ভিদে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, না একে একে আস্তে আস্তে একটার পর একটা ক'রে এই বিশাল জীবজগৎ গড়ে উঠলো। কেমন ক'রে আমরা এই সমস্যার সমাধান ক'রবো? প্রকৃতির ইতিহাসই আমাদের এ বিষয়ে একমাত্র সাহায্য ক'রতে পারে। সৃষ্টির প্রথম যুগে পৃথিবী ছিল জলময়;

সেই মহাসিন্ধুর বুক থেকে একদিন আমাদের মা বসুন্ধরা মুখ তুলে চাইলেন। আস্তে আস্তে মহাদেশের সৃষ্টি হ'লো ক্রমে ক্রমে সৃষ্টির কত লীলা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল। কোথাও বা মাটি সাদা বরফের মুকুট প'রে উঁচু পাহাড় হ'য়ে দাঁড়ালো; কোথাও হ্রদ, কোথাও নদ নদী, কোথাও বা শ্যামল বনানী দেখা দিল। সূর্য্যের তাপ, বৃষ্টি, তুষারপাত সারা পৃথিবীর মাটি পাথরকে ক্রমাগত চিরকালই ক্ষয়িয়ে দিতে চেয়েছে। এই সব মাটি পাথরের গুঁড়ো স্রোতের জলের টানে হ্রদের, সাগরের বুকের তলায় জ'মতে সুরু ক'রল। বছরের পর বছর এই রকম পলি পড়ে। স্তরের পর স্তর জ'মতে জ'মতে ক্রমশঃই উঁচু হ'তে থাকে। যত গাছপালা পশুপাখী সব স্রোতের জলে ভেসে ভেসে এসে এই সমস্ত স্তরের মধ্যে সঞ্চিত হ'তে সুরু ক'রলো। তার পরে কালে কালে তাপে আর চাপে সবই পাথর হ'য়ে গেল। পৃথিবীর বুকের স্তরগুলো সব পর পর সাজানো। তাদের মধ্যে গাছপালা আর পশুপাখী সবায়ের কঙ্কাল পাওয়া যায় এই রকম ভাবেই সাজানো। এই স্তরগুলো হ'চ্ছে প্রকৃতির ইতিহাসের এক একখানা পাতা। পুরাযুগের প্রাণীদের দেহবিশিষ্ট চিহ্নগুলিকে বলা হয় "জীবাশ্ম" (ফসিল্)। যদি আমরা পৃথিবীর সমস্ত স্তরগুলোর খবর কোন রকমে যোগাড় ক'রতে পারি তা হ'লে দেখবো যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রাণী আর গাছপালা পৃথিবীতে বাস ক'রতো। তারা সকলে এক সঙ্গে তৈরী হয় নি। প্রথমে খুবই সাধারণ গঠনের প্রাণী আর গাছপালা দেখা দেয়। তাদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জটিল থেকে জটিলতর হ'য়ে বর্ত্তমান জীবজগৎ সৃষ্টি ক'রেছে। খুব সম্ভব সৃষ্টির প্রথম বিকাশ ঘটে সমুদ্রের তলায়। সহসা একদিন সৃষ্টির অরুণরাগ রঞ্জিত প্রভাতে প্রথম অচেতন পদার্থের মধ্যে জীবন-স্পন্দন প্রকাশ পেলো। প্রকৃতি

অতি সন্তর্পণে তাঁর এই নবজাত শিশুকে নানা দুর্য্যোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কে তখন জানতো যে এই ক্ষুদ্র প্রাণ-বিন্দুই ভাবী সজীব জগতের অগ্রদূত।

অনেক পণ্ডিতের মতে গাছপালারাই পৃথিবীর সব চেয়ে পুরোণো বাসিন্দা। এ হয়তো সত্যি কথা, গাছপালারা নিজেদের খাবার নিজেরাই জল বাতাস মাটি থেকে তৈরী ক'রে নিতে পারে কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না, তাদের দরকার তৈরী খাবার। সুতরাং এ চিন্তা মনে আসা স্বাভাবিক যে প্রকৃতি প্রথমে খাবারের সংস্থানের জন্য গাছপালা তৈরী ক'রে, তার পর প্রাণীজগতে হাত দেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার যথেষ্ঠ প্রমাণ দিয়ে বলেন যে উদ্ভিদ আর প্রাণী একই সময়ে পাশাপাশি সৃষ্ট হয়। যা হোক শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ আর এককোষযুক্ত সহজতম প্রাণী যে গাছপালা আর জীবজন্তুর পূর্ব্ব পুরুষ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সমুদ্রের ধারে যে সব ঝিনুক, কড়ি, শামুক এই সব পাওয়া যায় তারা ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রাণীর গায়ের আবরণ। এই সব প্রাণীরাই পরবর্ত্তী যুগে জন্ম লাভ করে। এরাই হ'চ্ছে পৃথিবীর আদিম বনিয়াদী বংশীয়। তারপরে খুব সম্ভব কাঁকড়া জাতীয় জীব আর নানা রকম পোকামাকড় সৃষ্ট হয়। এদের মধ্যে কোঁন কোন জাতি একেবারে নষ্ট হ য়ে যায়, কেউ কেউ বা এখনো টিঁকে আছে।

বইকে যেমন সুবিধার জন্য পরিচ্ছদ, অধ্যায় এই সবে ভাগ করা হয় তেমনি প্রকৃতির ইতিহাসকেও পণ্ডিতেরা চার ভাগে ভাগ ক'রেছেন যথা আর্কিওজয়ীক, প্যালিওজয়ীক, মেসোজয়ীক আর কেইনোজয়ীক। এদের প্রত্যেককে আবার ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করা হয়।

আর্কিওজয়ীক যুগেই প্রথম পৃথিবী সৃষ্ট হয়, জীবনের কোন লক্ষণই এ যুগে দেখা যায়নি. প্রায় একশো কোটি বছর আগে এই নির্জ্জীব যুগ শেষ

হ'য়ে যায়। প্যালিওজয়ীক যুগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় নতুন আর পুরোণো। পুরোণো প্যালিওজয়ীক যুগেই বোধ হয় সবচেয়ে আদিম উদ্ভিদ আর প্রাণীর জন্ম হয়। তারপর প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে নতুন প্যালিওজয়ীক যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের শেষের দিকে জীবনের ইতিহাসে প্রধানতম অধ্যায়ের সূত্রপাত। এ যাবৎ পৃথিবীতে যত সব প্রাণী ছিল তাদের কারুর শক্ত খোলা ছিল কারুর বা ছিল হারড় ঢাকনি কিন্তু মেরুদণ্ড ছিল না কারুরই। এই সময়ে মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী প্রথম পৃথিবীতে দেখা দিল। মেরুদণ্ডহীনপ্রাণীদের সব চেয়ে বড় অসুবিধা এদের শরীর বড় নরম; এই নরম শরীর নিয়ে চলা ফেরা করা, শিকার করা, এমন কি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত বড় মুস্কিলের ব্যাপার। প্রকৃতি প্রথমে ভাবলেন একটা শক্ত আবরণ দিয়ে এদের নরম দেহটা ঢেকে দিলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হবে; তাই প্রথমে কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক এই সব সৃষ্টি হ'লো। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সবটা সফল হ'ল না; এতে আত্মরক্ষার খানিকটা সুবিধা হয় বটে কিন্তু চলাফেরা ক'রতে বড় অসুবিধা। তখন তাঁর মাথায় এলো এই শক্ত জিনিষটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই বেশী সুবিধা হবে। এই বারেই মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব হ'লো। প্রাণীজগতের যে দিকেই আমরা তাকাই না কেন সব দিকেই দেখি সব চেয়ে নীচু আর অপরিণতদেহী প্রাণীর সন্ধান মেলে জলের তলায়। ডাঙ্গায় বাস ক'রতে হ'লে যথেষ্ঠ গায়ের জোর আর কার্য্যক্ষমতার দরকার হয়, এখানে সবাই সবাইকে দেখতে পায়, তাপও যথেষ্ঠ বেশী, এখানে নিজেকে বাঁচাতে হ'লে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। জলের মধ্যে ওসব বালাই নেই। এখানে কম বুদ্ধি আর শক্তির দরকার। হাঁ ক'রে ব'সে থাকলে জলের স্রোতে খাবার আপনিই মুখে এসে ঢোকে। গভীর জলে কোন

সন্ধানী :—

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সন্ন্যাসী :—
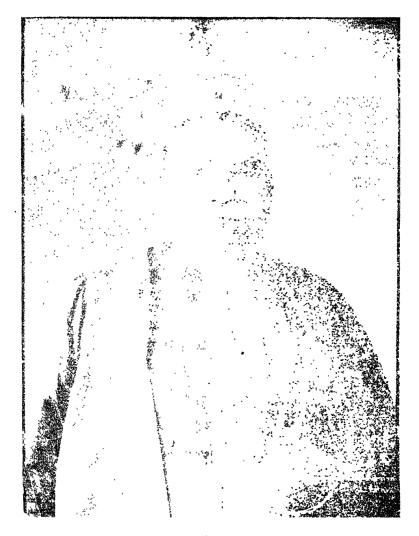
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

শব্দ আর আলো পৌঁছুতে পারে না। তাই জলবাসীদের কাণ, চোখ, নাক, স্পর্শশক্তি এ সব একেবারে না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। সেই জন্য সমস্ত আদিম সহজ প্রাণীর দেখা মেলে জলের মধ্যে। প্রকৃতির গবেষণাগার জলের তলায়।

তোমরা জানো বরফের দেশে যারা থাকে তাদের গা হ'য়ে যায় প্রায়ই ধপ্‌ধপে সাদা, প্রচুর লোম জন্মায়, খুব কম খাবার পেলেই তাদের দিন কাটে; মরুভূমির প্রায় সব প্রাণীই ধূসর রঙের, তাদের জলের দরকার কম, জল জমিয়ে রাখবারও উপায় আছে; আর যারা বনের মধ্যে বাস ক'রে তারা হয় পেটুক, গায়ের দাগগুলো প্রায় লতা পাতার দাগের মত। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে জীবজগৎ বাইরের সঙ্গে সবসময়েই খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। দেশ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতেরও পরিবর্ত্তন হয়।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণী থেকেই অধিকতর উপযোগী মেরুদণ্ডী প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল। মাছেরাই প্রথম মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী ব'লে গর্ব্ব ক'রতে পারে। পুরাণকারেরা বোধ হয় এ খবর রাখতেন তাই বিষ্ণুর প্রথম অবতার হ'ল মৎস্য-অবতার।

মাছেরা প্রথমে থাক্‌তো জলে, তাই তখন তাদের কান্‌কো আর ঝিল্লা থাকলেই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চ'ল্‌তো ক্রমে ক্রমে ডাঙার ভাগ বাড়তে লাগলো, জলের জীবের সংখ্যা হ'লো অসংখ্য তাই জায়গার অকুলান হওয়াতে কতকগুলো মাছ ডাঙ্গায় উঠে আসতে চেষ্টা ক'রতে লাগলো। ডাঙ্গার প্রাণীদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ফুসফুস আর চলা ফেরার জন্য হাত পা দরকার। প্রকৃতি এ সব দিতে কৃপণতা ক'রলেন না; ফলে কতকগুলো মাছজাতীয় প্রাণীর ফুসফুস আর কিছু কিছু হাত পা লাভের সৌভাগ্য হ'ল; এরা খুব ভাগ্যবান সন্দেহ নেই

কারণ আগেকার ঝিল্লী পাখনা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই থাকলো, মাঝখান থেকে কিছু বেশী লাভ হ'ল। ফলে এরা জলে স্থলে সব জায়গাতেই বাস করবার অধিকার পেল। মনে হয় এই উভচর প্রাণীই স্থলের সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর পিতৃ-পুরুষ। প্রথম যুগের উভচরেরা প্রায়ই মাংশাসী ছিল, প্রথম যখন তারা ডাঙ্গায় বাস ক'রতে এলো তখন দেখলো এখানে খুব কমই আমিষ খাবার মেলে তাই তারা জলের মায়া ছাড়তে পারলো না। ব্যাঙ্ এই জাতের সব চেয়ে ভাল উদাহরণ, ইনিই স্থলের প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী। অবশেষে সত্যিকারের ডাঙ্গার প্রাণীরা একে একে দেখা দিতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে উভচর থেকে প্যালিওজয়ীক যুগের শেষ দিকে কুমীর, কচ্ছপ, সাপ এই সব ধরণের কতকগুলো জীব জন্ম নিল। এই জাতকে বলা হয় সরীসৃপ; এদের মধ্যে কেউ থাকে জলে, কেউ বা ডাঙ্গার অধিবাসী আর কারুর কাছে আবার জল আর স্থল দুই সমান।

প্রাণীদের ডাঙ্গায় আসবার আগেই গাছপালারা এখানে পত্তনী নিয়ে বসেছিল। যখন প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী জল থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাঙ্গার দিকে তাকালো তখন সে দেখলো এখানে গভীর বন। সে বনের আদিও নেই অন্তও নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, এই সব গাছেদের সঙ্গে এখনকার গাছের বড় একটা কোনই মিল নেই। এ সব গাছে না হ'তো ফুল না হ'তো ফল। অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির ছিল তারা। বনগুলো সমস্তই ছিল জলা জায়গায়। সমস্ত বনের চাপে মাটি আস্তে আস্তে ব'সে যেত; একদিন হয়তো জলের তলায় এই বিশাল বন লুকিয়ে পড়লো, বছরে বছরে তার ওপর পলি প'ড়ে গেল। আবার এই পলির ওপর জন্মাল বন, আবার ডুবে গেলো। এই রকম ক'রে স্তরের পরে স্তরে মাটির তলায় গাছপালা

সব চাপা প'ড়ে গেল। কালে কালে চাপে আর তাপে এই সব সবুজ গাছপালারা হ'য়ে গেল কালো কয়লা। এই বনানীর যুগেই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী ডাঙ্গায় উঠে আসে; তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায় কয়লার মধ্যে মধ্যে।

এইবার হয় মেসোজয়ীক যুগের সূত্রপাত। এই যুগ সরীসৃপদের এক মহা গৌরবের যুগ। প্রথম প্রথম প্রকৃত ডাঙ্গার অধিবাসীদের ছিল নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার। তারপর যখন যথেষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি হ'লো তখন থেকেই আমিষ খাবার প্রচলিত।

মেসোজয়ীক যুগের সরীসৃপরা একটু বড় চেহারার জন্য প্রসিদ্ধ। এখনকার সব চেয়ে বড় জন্তুরা তাঁদের কাছে একেবারে ছেলে মানুষ। যাঁরা সাধারণ গোষ্ঠির তাঁরা এই হাতি জিরাফ এদের চেয়ে কিছু বড় হ'তেন, যাঁরা উঁচু ধরণের ছিলেন তাঁরা এদের চেয়ে চার পাঁচগুণ লম্বা চওড়া হ'তেন। আর যাঁরা একদম অভিজাত শ্রেণীর তাঁদের সঙ্গে এখনকার কারুর তুলনাই করা চলে না। এঁদের মাটি থেকে ঘাস পাতা খেয়ে অরুচি হ'লে মুখ বাড়িয়ে তাল গাছের ডগার কচি পাতা ছিঁড়ে খাবার কোনই বাধা ছিল না। বিরাট দেহ সরীসৃপদের বলা হয় "ডাইনো-সৌরাস।" এদের চেহারাও ছিল তেমনি অদ্ভুত। কারুর গায়ে ছিল সজারুর মত কাঁটা, কারুর গায়ে ছিল বড় বড় শক্ত আঁস; কারুর সারা অঙ্গ ছিল ইস্পাতের মত শক্ত আর ধারাল বর্ম্মে ঢাকা। "টাইটোনা-সৌরাস" বলে এক জন্তু ছিলেন তাঁর মুখটা হ'চ্ছে কুমীরের মত কিন্তু দেহটা কাছিমের সঙ্গেই বেশী মিলতো। ক্যাঙারু যদি হাতির চেয়ে দশগুণ বড় হয়, তার মুখটা যদি হয় কুমীরের মত, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা আর সারা গায়ে এবড়ো খেবড়ো শক্ত বর্ম্ম লাগান তা হ'লে কিরকম চেহারাটা হয় ধারণা ক'র্‌তে পার। এই রকম চেহারা ছিল "ষ্টেগোসৌরাস"

বলে একটা জীবের। এঁরা লম্বা হ'তেন প্রায় একশো ফুট। "অ্যাটল্যাণ্টোসৌরাস" নাকি সব চেয়ে ছিলেন লম্বা, এঁরা প্রায় দুশো ফুট লম্বা হ'তেন। কি ভীষণ ব্যাপার এই "ডাইনোসৌরাসরা" প্রায় দশলক্ষ বছর সসাগরা পৃথিবীতে রাজত্ব ক'রে গেছেন। খুব বড় জন্তুরা প্রায়ই নিরামিষাশী হ'তো, কিন্তু ছোটগুলো ছিল খুব হিংস্র মাংসাশী, তাদের খুব ধারাল নখ আর দাঁত ছিল, গায়ে জোরও ছিল অসম্ভব। বাঘ সিংহদের এদের সঙ্গে তুলনা করাই যায় না। এদের বুদ্ধি ছিল কিন্তু অত্যন্ত কম। একটা হাতির চেয়ে চার গুণ বড় জন্তুর মগজ হ'তো একটা খরগোসের মগজের চেয়েও ছোট। তাদের স্পর্শ শক্তি ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। একটা বড় জাতের 'ডাইনোসৌরাসর' লেজটা উনুনের মধ্যে পুরে দিলে তার মালিকটি এখবর টের পেতেন প্রায় দশ মিনিট পরে। এত বড় দেহ নিয়ে পৃথিবীর দুঃখকষ্টের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই নির্ব্বোধ প্রাণীরা টিঁকে থাকতে পারলো না, তাই সহসা একদিন তারা পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়ে গেল। তবে অনেকে বলেন যে এই ডাইনোসৌরাসরা পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি, আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার বনে হয়তো এদের কাউকে কাউকে এখনও দেখা যেতে পারে। সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ব'লেছেন যে তিনি নাকি আসামে এক গভীর বনের মধ্য হ্রদে একটা ডাইনোসৌরাসের জীবন্ত চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। কি ভীষণ ব্যাপার বলতো! যদি তারা আমাদের দেশে হাওয়া বদলাতে আসে!

সরীসৃপরা আকাশের দিকেও নজর দিয়েছিল; তবে তারা ঠিক আকাশের জীব হয়ে উঠতে পারে নি। মাঝে মাঝে চেষ্টাচরিত্র ক'রে খানিকটা উড়তো এই মাত্র, এদের সত্যিকারের পাখা ছিল না বাদুড়ের

মত হাত পায়ের সন্ধিস্থানের চামড়াগুলো বড় হ'য়ে জুড়ে যেত, এই পাখার মত চামড়ার ওপর ভর ক'রে তারা উড়ে বেড়াত। এদের এক জাতীর নাম ছিল "আর্কিওপ্‌টেরিস্‌", এদের রক্ত ছিল ঠাণ্ডা, গায়ে পালক ছিল না, কিন্তু এরাই সত্যিকারের পাখীর পূর্ব্ব-পুরুষ।

এই মেসোজয়ীক যুগে আর একটা নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হ'য়েছিল। এ যাবৎ সব জীবই ডিম পাড়তো আর তার মধ্য থেকে বাচ্ছাগুলো সব স্বাবলম্বী হয়েই বেরুতো। আমরা দেখেছি মুর্গির ডিম ফুটে ছানা বের হওয়ার পরে থেকেই তারা মার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁটে খেতে সুরু করে। কিন্তু ছাগল গরু ভেড়া এদের বাচ্ছাগুলো বেশ অসহায় ভাবেই জন্মায়, তারপর কিছুদিন মায়ের দুধ খেয়ে তবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। এদের বলে স্তন্যপায়ী, এদের রক্ত গরম।

মেসোজয়ীক যুগের পর আসে আধুনিক বা কেইনোজয়ীক যুগ, এর প্রথম থেকেই স্তন্যপায়ী জন্তুরা প্রাধান্য লাভ ক'রতে সুরু করে। প্রথম যখন সরীসৃপ থেকে উৎপন্ন হয় তখন স্তন্যপায়ী জীবরা খানিকটা সরীসৃপের মতনও ছিল। এই মাঝামাঝি ধরণের জন্তুদের কেউকেউ এখনো বেঁচে আছে। "ডাকবিল" নামে অষ্ট্রেলিয়ায় এক রকম জন্তু আছে তাদের ঠোঁট হাঁসের মত, পা জোড়া, ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চা ডিম ভেঙে বেরিয়ে মায়ের দুধ খায়। এদের থেকে আর এক রকম জন্তু সৃষ্টি হ'ল তারা ডিম পাড়ে না বটে কিন্তু তাদের বাচ্চারা জন্মাবার সময় এত অসহায় আর শক্তিহীন থাকে যে তাদের পৃথিবীতে ছেড়ে দিলে একদণ্ডও তারা বাঁচতে পারে না। তাই তাদের মায়েদের পেটে একটা চামড়ার থলি থাকে এর মধ্যে বাচ্চাগুলো জন্মাবার পরে বাস করে, বেশ বড় হ'লে তবে তারা থলি থেকে বেরিয়ে আসে, ক্যাঙারু এই জাতের উদাহরণ। এদের রক্ত গরম। এইসব জন্তু থেকেই সত্যিকারের স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি

হ'য়েছে। স্তন্যপায়ীরাও প্রথমে সরীসৃদের মত বড় হ'তে সুরু ক'রেছিল, কিন্তু প্রকৃতি শিগ্রী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ ক'রলেন। এই সময় "বেলুচীথেরিয়াম" নামে একরকম জন্তু ছিল, তাদের ওজন প্রায় চারশো মন, চল্লিশ ফিট উঁচু গাছের উপর থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়া এদের কাছে ছিল ছেলেখেলা। এরপরে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। অনেক জন্তুই আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গিয়েছে। এইতো সেদিন আমাদের চোখের সামনে কত জিনিষ লুপ্ত হয়ে গেল। ডোডো, মোয়া প্রভৃতি সেদিনকার পাখীগুলোরও চিহ্ন তো আজ মেলে না। মানুষের জন্মাবার কিছুদিন পর্য্যন্ত আগে ম্যাষ্টোডন নামে একরকম প্রকাণ্ড হাতি, খড়্গাদন্তী নামে এক রকম বাঘ পৃথিবীতে বাস ক'রতো, মানুষ হয়তো এদের দেখেও থাকতে পারে; কিন্তু তারা আজ কোথায়?

স্তন্যপায়ীজন্তুরা যখন খুব উন্নতি লাভ ক'রলো তখন জীবের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় বিপ্লব উপস্থিত হ'ল শস্যশ্যামলা বসুন্ধরায় মানুষের আবির্ভাব দেখা গেল। প্রকৃতি বোধ হয় আগে পৃথিবীকে মনমত ক'রে সাজালেন তারপর সেখানে আনলেন মানুষ। বল্‌লে হয়তো বিশ্বাস ক'রবেনা যে মানুষ বাঁদর জাতীয় জন্তু থেকেই উৎপত্তি হ'য়েছে, কিন্তু বোধ হয় এইটেই সত্যি; অবশ্য এর কোন ঠিক ধারাবাহিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু মানুষ আর বাঁদরের দেহ গঠন দেখে মনে হয় যে দুজনারই একই পূর্ব্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি। বাঁদরেরা আমাদের অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতি।

এই হ'চ্ছে প্রকৃতির বিবর্ত্তনাবাদের ছোট ইতিহাস। শুধু মোটামুটি ধারাগুলো ব'লে গেলাম; খুঁটিনাটির কিছুর প্রয়োজন নেই, আমরা সব জানিওনা। আমাদের জ্ঞানের বাইরে অনেক কিছু পড়ে আছে, এসব

আমাদের কল্পনারও অগম্য। আমরা অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু যা জানি তাতেই অবাক হ'য়ে যাই। কি অদ্ভুত এই জীবন ধারার বিকাশ, এই ক্রমোন্নতি, থেকে কোন উদ্দেশ্যে প্রকৃতি জীব জীবান্তরে নবনব জীবনের স্পন্দন ধারা ব'হে নিয়ে যা'চ্ছেন কে জানে! আমরা শুধু স্তব্ধ হ'য়ে তাঁরই লীলা দেখছি।

ভূতত্ত্ব
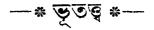
কবি গেয়েছেন,—

—"ধনধান্যেপুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—

মা ধরিত্রী যে বসুন্ধরা ও ধনধান্যেপুষ্পে ভরা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু চিরকালই কি সব এমনি ছিল! তোমরা নিজেরাই উত্তর দেবে না। কারণ একটু আগেই তোমরা প'ড়েছো পৃথিবী প্রথমে সূর্য্যেরই একটা অংশ ছিল; সুতরাং জন্মের সময় পৃথিবী ছিল একটা অগ্নিময় বাষ্পপিণ্ড মাত্র। ক্রমে যত দিন যেতে লাগল ততই তাপ হারাতে হারাতে বাষ্পীয় পৃথিবী তরল পদার্থে পরিণত হ'ল। গরম দুধ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'লে যেমন সর পড়ে তেমনি তরল পৃথিবীর ওপর আস্তে আস্তে একটা কঠিন সর প'ড়ে গেল। যখন পৃথিবী তরল ছিল তখন ভারী জিনিষগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নেমে যেতে লাগলো আর হাল্কা জিনিষগুলো ভেসে উঠতে সুরু ক'রলো। পৃথিবীর ওপরের কঠিন সরের অংশকে বলা হয় শিলামণ্ডল, তারপর কঠিন আর তরলের মাঝামাঝি

অবস্থাটাকে বলা হয় গুরুমণ্ডল আর পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত তরল অংশকে বলা হয় কেন্দ্রমণ্ডল।

পৃথিবীর মাটির কাছে যে আমরা কতখানি ঋণী তা আর মুখে ব'লে শেষ করা যায় না ; আমাদের খাবার দাবার, পোষাক পরিচ্ছন্ন ঘর বাড়ি সব মাটিই যোগাচ্ছে। তাই বলা হয় "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"। এত যে উপকারী এই মাটি তাও পৃথিবীর প্রথম জীবনে ছিল না। পৃথিবীতে পাথরের উৎপত্তির পর থেকেই তার ওপর বৃষ্টি, রোদ, বাতাস প্রবল অত্যাচার ক'রে আসছে। এর ফলে পাথর আস্তে আস্তে গুঁড়া হ'য়ে যাচ্ছে। গাছপালা তাদের শিকড় পাথরের মধ্যে চালিয়ে বড় বড় পাথরের টুকরোকে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ফেলছে। গাছের পাতা, ডাল, ফুল, ফল, জীবজন্তুদের মৃতদেহ পচে গিয়ে গুঁড়ো পাথরের সঙ্গে মিশে পৃথিবীর বুকের ওপর ছড়িয়ে প'ড়ছে। এই সব একত্রে মিলে কঠিন পাথরের ওপর নরম মাটির স্থষ্টি ক'রছে। ঝড় বৃষ্টি জলের স্রোত এই মাটিকে ব'হে দূরে নিয়ে যায়। বর্ষাকালে দেখবে নদীর জল কত ঘোলা, এই ঘোলা জলের মাটি পলির আকারে প'ড়ে আমাদের জমি উর্ব্বরা ক'রছে ; আবার খাল বিল নদীর মোহনায় পলি ফেলে নতুন নতুন জমি স্থষ্টি ক'রছে।

পৃথিবীর ওপরে সব জায়গা সমান নয়। কোথাও বা বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী কোথাও বা অতলস্পর্শী সমুদ্র। দেখলেই মনে হয় যে এরা চির কালই এমনি ছিল, থাকবেও চিরকাল এই রকমই। কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর বাইরের গড়ন যুগ যুগ ধ'রে কেবল বদ্‌লেই আসছে ; অবশ্য দু'চার বছরের মধ্যেই যে এই সব পরিবর্ত্তন হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু এটা ঠিক যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছরে পৃথিবীর বাইরের গঠনের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে আশ্চর্য্য রকম। আজ যেখানে বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী

সগর্ব্বে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই এককালে হয়তো এক অসীম মহাসমুদ্র বিরাজিত ছিল, কালে আবার এই বিরাট পর্ব্বত যে সমুদ্রের তলায় যাবে না তাই বা কে বলতে পারে? পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় যখন জায়গাটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো তখন তার ফলে ক্রমশঃ এই শিলামণ্ডল কুঁচকে যেতে সুরু ক'রল, সেই জন্য কোন জায়গা ঠেলে উপর দিকে উঠে গেল আর কোন জায়গায় নেমে গেল বিশাল খাদ; নীচু জায়গায় জল এসে জ'মলে সেই সব জায়গাগুলো হ'য়ে গেল সমুদ্র আর উচু অংশগুলো পাহাড় হ'য়ে জেগে রইলো জলের ওপর। এই খানে পাথরগুঁড়ো স্তরে স্তরে থিতিয়ে প'ড়ে নতুন পাথরের স্তর সৃষ্টি হ'লো। আগেই ব'লেছি বাতাস জল এরা পাহাড় গুঁড়িয়ে এনে ক্রমাগত সমুদ্রে ফেলে ফেলে পাহাড় নীচু হ'য়ে সাগরের সমান হ'য়ে আসে আর সাগরের বুকে যে সব পলি পাথরের স্তর প'ড়েছিল সে গুলো হয়তো একদিন ভূমিকম্পে কিম্বা অন্য কোন কারণে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আবার কালে এই পাহাড় ক্ষয়ে গিয়ে নতুন পাহাড়ের সৃষ্টি হ'ল; এমনি ক'রে চলেছে স্থান পরিবর্ত্তন। পরে আস্তে আস্তে পৃথিবীতে জন্তু জানোয়ার গাছপালার আবির্ভাব হ'লো। জল বাতাস এদেরও মৃতদেহ পলির সঙ্গে সঙ্গে সাগরের বুকে এনে ফেলতে লাগলো। এই মৃতদেহের কঠিন অংশগুলো ক্রমে ক্রমে পাথর হ'য়ে পাথরের স্তরের মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে থাকলো। এই প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহকে বলে জীবাশ্ম (ফসিল্)।

একটু আগেই বলেছি পৃথিবী পেটের মধ্যে সব পাথর আছে গলা অবস্থায়, এর ওপর পৃথিবীর কঠিন অংশের ভয়ঙ্কর চাপ প'ড়েছে; সুতরাং গলা পাথরের রাশ একটু সুবিধা পেলেই ওপরে উঠে আসতে চায়। এই গলা পাথরকে বলা হয় লাভা। অনেক সময় দেখা

যায় লাভা ওপরের পাথরের স্তরগুলোকে চাপ দিয়ে ঠেলে ঠেলে উঁচু ক'রে পাহাড় ক'রে তোলে। কথনো কথনো ওপরের স্তরগুলো এর চাপ সহ্য না ক'রতে পেরে ফেটে যায় আর সেই ফাঁক দিয়ে লাভা ফোয়ারার মত বেরিয়ে পড়ে। একেই বলে অগ্ন্যুৎপাত। অনেক সময় পাহাড়ের চুড়োর মধ্যে দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয় আবার কথনও কথনও বা মাটি ফেটে সমতল ভূমির ওপরে লাভা বেরিয়ে আসে। যে পাহাড় দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাকে বলে আগ্নেয়গিরি। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে পৃথিবীর কত অনিষ্ট হয় তা আর ব'লে আর শেষ করা যায় না, গাছপালা জীবজন্তু সব এই লাভার ছোঁয়া পেয়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। তোমরা নিশ্চয়ই পম্পাই নগরের কথা শুনেছো, বিসুবিয়স নামে একটা আগ্নেয়-গিরির উৎপাতে একদিনে এই প্রসিদ্ধ সহরটি শ্মশান হ'য়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর তরল অংশ সরাসরি জ'মে গিয়ে যে পাথর হয় তাকে বলে আগ্নেয়শিলা, যে পাথরের স্তর গুঁড়ো পাথরের পলি দিয়ে তৈরী হয় তাকে বলে পললশিলা, আর আগ্নেয়শিলা পললশিলা আগুন, জল, বাতাস, চাপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যে পাথরে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় পরিবর্ত্তিতশিলা।

কিছু দিন আগেকার বেহার আর কোয়েটার ভূমিকম্পের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। তোমরা জান ভূমিকম্প কি ভীষণ, এর দাপটে বিহারের কত সহরেই কি না ধ্বংস হ'য়ে ছিল, কত বাড়ি ঘর দুয়ার ভূমিসাৎ হ'য়েছে কত পরিবারের না হাহাকরে ধ্বনি উঠেছিল। কেন ভূমিকম্প হয় সে কথা অশিক্ষিতদের জিজ্ঞেস ক'রলে তারা ব'লবে পৃথিবী আছেন বাসুকী নাগের ফণার ওপর, যখন বাসুকীর ভার অসহ্য মনে হয় তখন তিনি দয়া ক'রে একটুকু মাথাটা নাড়েন ফলে হয় ভূমিকম্প। এই কথাটার অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। পৃথিবীর ওপরের

চল্লিশ মাইল কঠিন স্তরের নীচে আছে এর চেয়ে নরম তরলপ্রায় স্তর ; এই নীচুকার স্তর আস্তে আস্তে কুঁচকে যাচ্ছে, এর জন্য ওপরের কঠিন স্তর-গুলোও ভাঁজ খেয়ে যায়। এই রকম কোঁচকান স্তরের দুদিকের পার্শ্বচাপ যদি হঠাৎ কোন কারণে বেশী হয় তাহলে ভাঁজ ভেঙে গিয়ে এক পাশ অন্য পাশের তলায় নেবে যায়, একেই বলে চ্যুতি। হঠাৎ এই রকম চ্যুতি কোন প্রদেশে হ'লে সেখান মাটি ভীষণ ভাবে কেঁপে ওঠে ফলে হয় ভূমিকম্প। ভূমিকম্প আরো অন্যান্য কারণে হয়। মনে কর সমুদ্রের জলে মাটির নীচেকার খানিকটা অংশ ক্ষয়ে গেল; যখন ক্ষয় খুব বেশী হয় তখন ওপরের স্তরগুলো ধ্বশে নীচে প'ড়ে যাবে, এর ফলে কাছাকাছি জায়গার মাটি কেঁপে ভূমিকম্প হ'তে পারে। অগ্ন্যুৎপাতের সময়ও ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে এক বছরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিরিশ হাজার বার ভূমিকম্প হয়।

কয়লা আমাদের যে কত দরকারে আসে তা আর এক মুখে বলা যায় না। কয়লা জ্বালিয়ে আমরা রান্না করি, রেল গাড়ি চলে, কয়লার গ্যাসে আলো জ্বলে ; কয়লা থেকে পাই আলকাতরা, আবার আলকাতরা থেকে নানা রকম রং, ফিনাইল, নানা রকমের ওষুধ, স্যাকারীন নামে এক মিষ্টি জিনিষ ইত্যাদি কত জিনিষই যে পাওয়াঁ যায় তার আর সীমা পরি-সীমা নেই ; সুতরাং কালো ব'লে কয়লাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কয়লা কি ক'রে তৈরী হয় জানো ; এক রকম কয়লা হয় কাঠ পুড়ে তাকে বলা হয় কাঠকয়লা ; তার কথা বলছি না, বলছি পাথুরে কয়লার কথা। পৃথিবী যখন ছেলেমানুষ তখন এর বুকের ওপর ছিল গাছপালার ভীষণ জঙ্গল, সে যে কি জঙ্গল তা এখন তোমরা কল্পনাও ক'রতে পারবে না ; অবশ্য তখনকার গাছের সঙ্গে এখনকার গাছের প্রভেদ ছিল অনেক। আস্তে আস্তে ওপরকার চাপে এসব গাছপালা শুদ্ধ জলাজমি

নীচে ব'সে যেতে লাগলো ; তার ওপরে এসে জ'মল জল, এই জলে আবার পলি প'ড়লো, তার থেকে ডাঙ্গা হ'ল, সেখানে আবার গাছপালা জন্মাল, আবার জমি ব'সে গেল ; এই রকম ভাবে যে কত কাল চ'ললো তার ঠিক ঠিকানা নেই। নীচেকার গাছপালাগুলো ওপরকার চাপে, তাপে আর অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে যায়। অবশেষে তাদের দেহ পাথরের মত শক্ত কয়লায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। এই কয়লাই আরো অনেক বেশী তাপ আর চাপ পেয়ে হীরা হ'য়ে যায়। কে বলবে কয়লা আর হীরে একই জিনিষ।

কেরাসিন আর পেট্রোলের কথা তোমরা সবাই জানো। পেট্রোল না হলে মটর চ'লবে না, এরোপ্লেন চলবে না, ইলিকট্রীকের আলো জ্বলবে না, কি ভীষণ মুস্কিল হবে! কেরাসিন তেলের প্রয়োজনও কম নয়, যাদের পাড়াগায়ে বাড়ি তারা এর দরকার হাড়ে হাড়ে বোঝে। কেরাসিন আর পেট্রোল কয়লারই মত মাটির তলায় থাকে। এর উৎপত্তিও কয়লার মত তবে কয়লা যেমন গাছপালা দিয়ে তৈরী, এই তেলগুলো তেমনি শামুক গুগ্‌লির খোলা ও জীবজন্তুর হাড়গোড় থেকে তৈরী। মাটি চাপা প'ড়ে জীবজন্তুদের শরীর পচে উঠলো এর ফলে এই সব থেকে যে বাষ্প বেরুতে লাগলো তা নানা 'রকমের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ও মাটির চাপে তেলে পরিণত হ'ল। একশো বছর আগে খনিজ তেলের খবর বড় একটা কেউ জানতো না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে মাটির হাজার হাজার ফুট নীচে এর সন্ধান পাওয়া গেল, তখন মাটিতে গর্ত্ত ক'রে বড় বড় নল বসিয়ে তাকে ওপরে ওঠাতে সুরু হ'ল, তারপর সেই অপরিষ্কার খনিজ তেলকে ক্রমশঃ পরিষ্কার ক'রে মোম, ক্রুডঅয়েল, কেরাসিন আর পেট্রোল এই থেকে পৃথক করা হয়, ও এদের নানা কাজে লাগান হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

সন্ন্যাসী :—

স্বামী বিবেকানন্দ

জৈব বিজ্ঞান

—* প্রাণ *—

অগণন জীব এই পৃথিবীতে। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই জীবনের চিহ্ন দেখতে পাবে। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সব জায়গাতেই প্রাণের প্রচার। অফুরন্ত প্রাণবন্ত এই পৃথিবী। ছোট বড় কত কোটি কোটি রকমের কত যে জীব আছে তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আজও আমাদের চোখের পরিচয়ও হয় নি। আকাশে কত শত রকমের পাখী, কীট, পতঙ্গ, প্রজাপতি, অদৃশ্য জীবাণু বীজাণু, মাটির ওপর কত রকম জীবজন্তু গাছপালা; সাগর মহাসাগরের অগাধ জল প্রকাণ্ড দ্বীপের মত চেহারার তিমি মাছ থেকে আণুবীক্ষণিক জীব জন্তুতে ভর্ত্তি। এমন সব ছোট ছোট জীব আছে যাদের দেড়শ' লক্ষ কোটিটা এক সঙ্গে ওজন ক'রলেও একটা ছোলার চেয়ে ভারী হবে না। শুধু তাই নয়; আবার জীবের মধ্যে জীব। আমাদের এবং অন্যান্য প্রাণীদের চোখে, হাড়ে, রক্তে, মাংসের মধ্যেও অজস্র অতিনির্ভরশীল জীব বাস ক'রছে। এক একটি জীব আবার আর একটি পূর্ণ জগতের আধার। উঁচু পর্ব্বতের চুড়োয়, গহন বনে, সমুদ্রের অতল তলায় নানা আকারের নানা রঙের জীব কত যে আছে তার আর সংখ্যা করা যায় না। যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের চেয়ে যাদের দেখতে পাই না তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই সমস্ত অদৃশ্য জীবদের জীবন রহস্য খানিকটা আমরা বুঝতে পারছি বটে কিন্তু এখনো কত বাকী; যাদের আমরা দেখতে পাই, তাদের কথাই কি আমরা সব জানি!

—⁕ গাছ পালার কথা ⁕—

এই সমস্ত অগন্তি জীবদের দুভাগে ভাগ করা হয়—প্রাণী আর উদ্ভিদ্। তোমরা আপত্তি তুলবে উদ্ভিদ্ অর্থাৎ গাছপালা আবার জীব হ'লো কবে থেকে, এরা তো ইঁট, কাঠের মত অচেতন পদার্থ। তোমরা ব'লবে গাছের নড়ন নেই চড়ন নেই, প্রাণ নেই, একে জীব বলা হবে কি ক'রে? পাখী এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়ায়, জীবজন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অতল জলের তলায় মাছেরা অবিরাম সাঁতার কাটছে, এদের সকলেরই প্রাণ আছে, নড়াচড়াই হ'চ্ছে তাদের প্রাণের লক্ষণ। কিন্তু এই যে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ কি নিষ্প্রাণ, এর কি প্রাণ নেই? এ ছুটে লাফিয়ে বেড়াতে পারে না ব'লে একে কি ব'লবে জড় পদার্থ? না গাছ জড় নয়; গাছেরও জীবন আছে তবে তার জীবনের লক্ষণ সজোরে হাত পা নাড়া থেকে প্রকাশ পায় না। পাখী আগে একটা ছোট্ট ডিমের মধ্যে ছিল ঘুমিয়ে। তারপর একদিন সে ডিমের অন্ধকার খোলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এই পৃথিবীর আলো বাতাসে, এধার ওধার থেকে খাবার সংগ্রহ ক'রে খেয়ে সে বড় হ'তে লাগলো। তারপর বাসা বাঁধল, বসন্তে গান ক'রলো, ডিম পাড়লো, শীতকাল কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে কাটিয়ে দিল, বর্ষায় ভিজলো, তারপর একদিন হয়তো তার দিন এলো ফুরিয়ে, সে মারা গেল।

গাছের ইতিহাসও কি ঠিক সেই রকম নয়। গাছের প্রাণশক্তি লুকিয়ে ছিল বীজের মধ্যে। মাটিতে প'ড়ে তার মধ্যে থেকে একদিন দুখানা ছোট ছোট কচি পাতা সম্বল ক'রে গাছের শিশু পৃথিবীর আলো হাওয়ার মধ্যে মুখ তুলে চাইলো। তার পরে সে বাড়তে লাগলো, বড় হ'লো; সে ফুলের ডালি জগতের সামনে মেলে দিল, ফুলের থেকে

জন্মাল ফল, সেই ফলের মধ্যে থাকে বীজ, এই বীজের মধ্যেই আবার গাছের ভবিষ্যৎ জীবন লুকিয়ে রইল। গাছ ঝড় ঝাপটা শীত বৃষ্টি মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল। তার পর সেও হয়তো একদিন গেল মরে। সে শুধু ঘুরে বেড়াতে পারল না আর গান গাইতে পারল না ব'লে, এতগুলো জীবনের লক্ষণ দেখান সত্বেও তাকে কি ব'লবো প্রাণহীন। না, না; তা নয়, গাছও প্রাণী, তারও প্রাণ আছে, সেও অনুভব ক'রতে পারে, সেও হাসে সেও কাঁদে; বসন্তে তারও আনন্দ হয়, শীতে সেও কষ্ট পায়। গাছ যে অনুভব ক'রতে পারে এ আমরা সব সময়ে বুঝতে পারি না; কিন্তু আমরা দেখেছি লজ্জাবতীর গায়ে হাত দিলে সে কেমন কুঁকড়ে যায়, সে অনুভব ক'রে ব'লেই তো সাড়া দেয়। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির আগে অনেক গাছেরই পাতা নীচু হ'য়ে যায়। এ কি তাদের ভবিষ্যৎ অনুভব করার ক্ষমতার পরিচয় নয়? কতকগুলো গাছপালার বুদ্ধিও আছে যথেষ্ঠ, মাছিধরা গুল্মগুলো মাছি ধরবার সময় যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। পৃথিবীর সামনে কে প্রথম আমাদের এই বোবা, স্থির বন্ধুদের প্রাণের কথা প্রচার ক'রেছিলেন জানো? তিনি হ'চ্ছেন আমাদেরই দেশের ঋষি বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর মতে শুধু গাছপালার নয়, পাথরেরও খানিকটা প্রাণ আছে।

যাক্, আমরা দেখেছি গোলাপ, জুঁই, এই সমস্ত গাছে ভারী চমৎকার চমৎকার ফুল হয় কিন্তু ফার্ণ, বেঙের ছাতা এই সব জাতের গাছে ফুল ধরে না মোটেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদদের দুভাগে মোটামুটি ভাগ করা যেতে পারে, যাদের ফুল হয় তাদের বলা যেতে পারে "পুষ্পক" আর যাদের ফুল হয় না তাদের বলা যেতে পারে "অপুষ্পক"। ফুলথেকে হয় ফল, এই ফলের মধ্যে থাকে বীজ। কতকগুলো ভিজান ধান আর ছোলার খোসা ছাড়াও দেখবে ছোলার মধ্যে দুটো বীজের টুক্‌রো একটা সুতোর মত জিনিষ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। কিন্তু ধানের মধ্যে বীজের টুক্‌রো

মাত্র একটা। ঐ জন্য প্রথম জাতীয়কে বলা হয় "দ্বিদলবীজ" আর দ্বিতীয় জাতির বীজকে বলা হয় "একদল বীজ"। অপুষ্পক গাছকেও চারভাগ করা হয় যেমন আল্‌গী, শৈবাল, ছত্রক আর ফার্ণ।

আমরা হাত দিয়ে কাজকর্ম্ম করি, মুখ দিয়ে খাই, পা দিয়ে চলাফেরা করি, প্রত্যেক কাজের জন্য একটা ক'রে নির্দ্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। যার জন্য যা, পা দিয়ে আমরা খেতে পারি না। তেমনি গাছেরও কাজ-কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। মূল অর্থাৎ শিকড় মাটি থেকে জল আর অন্যান্য জলীয় খাবার টেনে নেয়; কাণ্ড অর্থাৎ গুঁড়ি সেগুলো ওপর দিকে পাঠিয়ে দেয়, পাতা এগুলোকে সূর্য্যের তাপে খাবার মত ক'রে রান্না ক'রে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমরা যেমন নাক দিয়ে নিশ্বাস নেই গাছেরাও তেমনি পাতা দিয়ে নিশ্বাস নেয়। বাতাসে কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইড্ নামে একরকম বায়বীয় জিনিষ আছে। এটা প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত। গাছের পাতারা কিন্তু এই কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইড্ টেনে নিয়ে তাই থেকে অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাটা পৃথক ক'রে নিয়ে নিজেদের শরীরের পুষ্টিসাধন করে; সেই জন্যই গাছ পোড়ালে কয়লা পাওয়া যায়। গাছেরা কার্ব্বন ডাই অক্সাইডের অক্সিজেনটা ছেড়ে দেয়। প্রাণীরা আবার এই অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেয়। এরা এই অক্সিজেনকে কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে আর প্রশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দেয়। সেই জন্য গাছেরা আর প্রাণীরা কখনোই আলাদা আলাদা বাঁচতে পারে না।

পাতার রঙ্ সবুজ, কারণ গাছের পাতায় এক রকম সবুজ রাসায়নিক জিনিষ আছে তার নাম ক্লোরোফিল (Chlorophyl)। এই ক্লোরোফিল দিয়েই গাছ সূর্য্য থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করে। ক্লোরোফিল আবার সূর্য্যের আলো ছাড়া জন্মায় না ও কাজ ক'রতে পারে না। তাই গাছকে অন্ধকারে রাখলে পাতাগুলো সাদা হ'য়ে যায়। এই সব কারণে

গাছ সর্ব্বদা আলো আর হাওয়া খোঁজে। একটা বন্ধ ঘরে জানলা থেকে কিছু দূরে টবশুদ্ধ একটা গাছ রাখলে দেখতে পাবে কিছু দিন পরে গাছটা জানলার দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে। এও গাছের প্রাণেরই একটা পরিচয়।

গাছ যে শুধু এই রকম সাধারণভাবে খাবার জোগাড় ক'রে খায় তা নয়; আরো অনেক রকম উপায়ে তারা খাবার সংস্থান করে। গাছের মধ্যে চোর ডাকাতেরও অভাব নেই। অনেক গাছ আছে তারা অন্য গাছের তৈরী করা খাবার চুরি ক'রে খায়। এদের বলা হয় "পরভৃতিকা"। তোমরা দেখেছো আম গাছে একরকম লম্বা হল্‌দে দড়ির মত গাছ জন্মায়; এদের সঙ্গে মাটির কোন সংস্রবই নেই, এরা আশ্রয়-দাতা গাছের শরীরের মধ্যে শিকড় চালিয়ে তার তৈরী করা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের নাম "আলোকলতা"। আর এক রকম গাছ আছে তারা বাঘ ভাল্লুকের মত অন্যান্য জ্যান্ত প্রাণী শিকার করে খায়। আমাদের দেশের পুকুরে এক রকম গাছ আছে তারা পোকামাকড় মশা-মাছি ধ'রে খায়। এদের নাম "কলসগুল্ম" ইংরাজীতে বলে "পিচার প্ল্যাণ্ট।" এদের কতকগুলো পাতা গোল হ'য়ে চারধারে জুড়ে গিয়ে একটা কলসীর মত হয়, কলসীর ধারটা হয় খুব পিছল আর তার মধ্যে থাকে এক রকম সুগন্ধী মিষ্টি রস। ছোট ছোট পোকা-মাকড়েরা এই মিষ্টি রসের লোভে কলসীর ধারে এসে ব'সলেই পিছলে তার মধ্যে প'ড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কলসীর ঢাকনীও যায় বন্ধ হ'য়ে। তখন কলসীর গা থেকে এক রকম রস বেরিয়ে এসে শিকার হজম ক'রে ফেলে। খানিকটা পরে কলসীর মুখ খুলে যায়। গাছ আবার পোকা ধরার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পেতে ব'সে থাকে। আফ্রিকায় নাকি এক রকম গাছ আছে তারা গরু হরিণ ছাগল প্রভৃতি বড় বড় সব জন্তু ধরেও খায়, সত্যি কিনা কে জানে।

গাছেরা কেমন ফুলের ডালি সাজিয়ে ব'সে থাকে। কেন তারা ফুল ফোটায় জানো? ফুল ফোটার সময় থেকেই দেখা যায় হাজারো

রকমের পোকা মাকড়ের সমারোহ ফুলের ওপর। তারা সকলেই ফুলের ওপর ব'সে মধু সংগ্রহ করে। সেই সময় তাদের পায়ে আর ডানায় ক্রমাগত ফুলের পরাগ লেগে যায়। একটা ফুলের মধু শেষ হ'য়ে গেলে তারা বসে অন্য আর একটা ফুলে গিয়ে। ফুল-বেড়ানোর তাদের আর বিরাম নেই। তাদের এই মধু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। পোকা মাকড়রা যখন এ ফুল থেকে ও ফুলে গিয়ে বসে তখন তাদের গা থেকে আগেকার ফুলের পরাগগুলো নতুন ফুলের মধ্যে ঝরে পড়ে; এরই ফলে গাছে ফল ধরে। যে ফুলের গন্ধ নেই তার চমৎকার রঙ্ আছে, যার রঙ্ নেই তার গন্ধ আছে, অবশ্য কোন কোন ফুলের গন্ধ আর রঙ্ দুই আছে, মধু প্রায় সব ফুলেই পাওয়া যায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে গাছ নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য ফুল ফোটাচ্ছে না। এটা তাদের পোকামাকড়দের লোভ দেখাবার ফন্দি।

তোমরা দেখেছো যে সরস মাটিতে একটা বীজ পুঁতলে সেটা জলে ভিজে প্রথমে ফুলে ওঠে। তারপরে তার গায়ের খোসাটা যায় ফেটে আর একটা ছোট্ট কলি তার মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে এই কলিটি বেঁকে নীচু হ'য়ে মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। আর একটা কলি মাটি ফুটো ক'রে ওপরের আলো বাতাসের দিকে উঠে আসে। একেই বলে "অঙ্কুর"। এই অঙ্কুরে গজায় মাত্র দুখানি খুব কচি ছোট পাতা। তোমরা যেমন ছোটবেলায় খালি মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে অন্য কিছু খেতে পারতে না পরে বড় হ'য়ে সব খেতে শিখলে, তেমনি এই শিশু গাছেরাও বাইরের কিছু খেতে পারে না। তাদের জন্য বীজের মধ্যে খাবার সঞ্চিত থাকে, প্রথমে এই খাবার খেয়েই উদ্ভিদ শিশু বাড়ে; তারপরে একটু জোর পেলে, মাটি থেকে খাবার শুষে নিতে আরম্ভ করে।

যদি প্রত্যেক গাছের বীজ গাছ তলাতেই প'ড়তো তা হ'লে ক্রমে ক্রমে একজায়গাতেই অসংখ্য গাছ জন্মাত, আর নিজেদের মধ্যে খাবার সংগ্রহের জন্য মারামারি ক'রতে ক'রতে সবগুলোই ম'রতো। তাই প্রকৃতি গাছের বীজগুলো যাতে চার ধারে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থাও যথেষ্ঠ ক'রেছেন। যেমন গাছ অনেক রকমের তেমনি তাদের ফুলফলগুলোও বহুরকমের, তাদের বীজগুলোও ছড়িয়ে পড়ে নানা রকমে। অনেক গাছের বীজ খুব ছোট আর হাল্কা তাই একটু বাতাসেই তারা অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। শিমুল আকন্দ এই সব ফলগুলো পাকলে তার মধ্যে থেকে তুলো ফেটে বেরোয়। এই তুলোর সঙ্গে খুব ছোট ছোট বীজ আটকান থাকে, তুলোর সঙ্গে উড়তে উড়তে গিয়ে বীজগুলো বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মাধবীলতার বীজে প্রজাপতির মত দুখানা পাখা লাগান থাকে, এই পাখায় ভর ক'রে উড়তে উড়তে বীজ অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। দোপাটিফুলের ফল এত জোরে ফাটে যে তাতে বীজগুলো বেশ খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক গাছের ফলে থাকে আঁকড়া আর কাঁটা। কোনও জন্তু জানোয়ার যখন এই সব গাছপালার মধ্যে দিয়ে যায় তখন তার নিজের অজান্তে অনেক ফল গায়ে আটকে যায়। তারপরে যখন এই বাহনটি এবনে ওবনে ঘুরে বেড়ায় তখন তার গা থেকে ফলগুলো নাড়া পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যখন তোমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাও তখন তোমাদের কাপড়ে কত চোরকাঁটা লেগে যায়। এগুলো আর কিছুই নয়, এক রকম ঘাস জাতীয় গাছের ফল। বাড়ি গিয়ে যখন কাপড় থেকে চোরকাঁটাগুলো বেছে ফেলে দাও তখন সেই ফলগুলোও এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ওদের বিস্তারের সুবিধা হয়। আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মধ্যে চমৎকার রসাল শাঁস থাকে। সেই শাঁসের লোভে লোকে কিংবা পশু পাখীতেও ফলগুলো পেড়ে নিয়ে আসে তারপরে শাঁসটা খেয়ে

বীজটা এধারে ওধারে ফেলে দেয়। এতে তাদের অনেক বিস্তার ঘটে। অনেক পাখী সারাদিন জলের ধারে ঘুরে বেড়ায়। জোলো গাছের বীজগুলো সব কাদায় পড়ে থাকে। পাখীরা এধার ওধার চলে ফিরে বেড়াবার সময় বীজশুদ্ধ কাদা তাদের পায়ে নখে লেগে যায়। সেখান থেকে কোন দূর জলার ধারে পাখীগুলো উড়ে গিয়ে ব'সলে তাদের পায়ের থেকে বীজগুলো কোন না কোন সময়ে ঝ'রে পড়ে। সমুদ্রের ধারে লোনা মাটিতে নারকোলের বন দেখা যায় অজস্র। গাছ থেকে নারকোল সমুদ্রের জলে ঝ'রে পড়ে, তারপর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যায় বহুদূর। শেষে হয়তো কোন জায়গায় তীরে সেগুলো আটকে যায়। আর তখন তাই থেকে আবার গাছ গজিয়ে ওঠে। কি রকম তাড়াতাড়ি আর বিস্তৃত ভাবে গাছের বীজগুলো ছড়িয়ে পড়ে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। কয়েক বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভূমিকম্পের ফলে একটা ছোট্ট দ্বীপ জলের ওপর জেগে ওঠে। তখন তাতে একটা গাছের চিহ্নও ছিল না। এক বছর পরে সেখানে আঠারো বিভিন্ন রকমের শ' চারেক গাছ দেখা গেল; তিন বছর পরে সেখানে পঁচাত্তির রকমের গাছ দেখা গেল প্রায় হাজার দশেক। দশ বছর পরে সেখানে এক বিশাল বন গ'ড়ে উঠলো, সেখানে অন্ততঃ সাড়ে ছ'শ রকম বিভিন্ন জাতের গাছের সন্ধান পাওয়া গেল। সেখান থেকে নিকটতম ডাঙ্গা হচ্ছে আড়াইশো মাইল দূরে। ভাবো কি ব্যাপার! কতকগুলো গাছ যে কি তাড়াতাড়ি বাড়ে তা ভাবতেও পার না। "ক্রেষ্টেড্ হুইট্ গ্রাস্" ব'লে এক রকম ঘাস আছে, এদের প্রত্যেকটির শিকড়গুলো একদিনে যা বাড়ে তা একত্র ক'রলে প্রায় দু মাইল লম্বা হয়, এই জাতের একটা দু বছর বয়সী গাছের শিকড় লম্বা হয় সব শুদ্ধ তিনশো মাইল। বিভিন্ন গাছের পরমায়ু বিভিন্ন রকমের; কেউ বা দু'চার ঘণ্টা বাঁচে, কেউ পাঁচ সাত দিন বাঁচে, কেউ বা বর্ষজীবি, দ্বিবর্ষজীবি। কতকগুলি

গাছ বিশ ত্রিশ বছর বাঁচে আবার কেউ বা বাচে হাজার হাজার বছর। কালিফোর্নিয়ায় (আমেরিকা) একটা "কনিকার" জাতীয় গাছ আছে, তার বয়স প্রায় চার হাজার বছর। এটা উঁচু তিনশো সাতাশ ফিট আর হাতে হাতে দিয়ে একে ঘিরে দাঁড়াতে কুড়ি জন লোকের দরকার হয়। এর গুঁড়ি ফুটো ক'রে রাস্তা করা হ'য়েছে, তার মধ্যে দিয়ে মটরগাড়ী যাতায়াত করে। এইটেই নাকি ডাঙ্গার ওপর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাছ। জলের সবচেয়ে বড় গাছ হচ্ছে এক রকম শেওলা, এর নাম "ল্যামিনোরিয়াম"। এরা লম্বায় হয় হাজার ফুটেরও বেশী, এদের বাস কুমেরু মহাসাগরে।

জন্তু জানোয়ারদের নিজেকে বাঁচাবার কত উপায় আছে। কেউ বা দাঁত, নখ, হাত, পা, থাবা এই সব দিয়ে বিপদের সঙ্গে লড়াই করে, কেউ জোরে দৌড়ে পালায় কেউ বা লুকিয়ে থেকে নিজেদের বাঁচায়। গাছেরও এমন অনেক উপায় আছে। পদ্ম, গোলাপ. বেল, শিমুল, কুল, বেগুণ, লেবু ইত্যাদি গাছের ডাল কাঁটায় ভরা, কাঁটার জন্য এই সব গাছে হাত দিতেও ভয় করে। শেয়ালের একবার বেগুণ খেতে গিয়ে নাকে কাঁটা ফুটে যে কী দুর্দ্দশা হ'য়েছিল তা তো জানই। বিছুটির পাতায় ছোট ছোট সরু শুঁয়ো আছে, এগুলো খুব ধারালো আর তার মধ্যে থাকে এক রকম বিষাক্ত রস, বিছুটির পাতা গায়ে লাগলে এই শুঁয়োগুলো গায়ে ফুটে গিয়ে তাই থেকে খানিকটা বিষাক্ত রস বেরিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় ; ফলে অত্যন্ত জ্বালা করে তাই সহজে কেউ বিছুটির কাছেও ঘেঁসতে চায় না। কারোর পাতা খুব দুর্গন্ধময়, কারোর বা পাতায় ঘন আঠার মত তেতো রস থাকে, গরু ছাগল কেউ এতে মুখ দিতে চায় না। আর এক রকমের গাছ আছে তারা ভারী চালাক। নিজের কোন অস্ত্র শস্ত্র নেই, সকলকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে নিজেকে বাঁচায়। আমাদের দেশে এক রকমের গাছ আছে তাদের দেখতে ঠিক জলবিছুটির মত ;

কিন্তু আসলে তাদের পাতায় হাত দিলে জ্বালা করে না; কিন্তু তার চেহারা দেখে গরু, ঘোঁড়া কেউই তার কাছে ঘেঁসতে চায় না। মধ্য-ভারতে এক রকম গাছ আছে তার পাতা বিদ্যুতে ভর্ত্তি; হাত দিলে ভীষণ ইলেকট্রীক শক পাওয়া যায়। প্রায় পঁচাত্তর ফিট দূর থেকে এরা কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়ে দেয়।

—* প্রাণী জগৎ *—

(অমেরুদণ্ডী)

আমরা দেখেছি পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত জিনিষকে দুভাগে ভাগ করা যায়—উদ্ভিদ আর প্রাণী; উদ্ভিদেরা নিজের খাবার নিজেই তৈরী ক'রে নিতে পারে কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না, তাদের কোন না কোন রকমে নির্ভর ক'রতে হয় গাছের ওপর। সারা পৃথিবীর জল স্থল আকাশ জুড়ে যে কত প্রাণী আছে তার সংখ্যা কে ব'লতে পারে? প্রাণীদের মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়। তোমরা জান মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কুমীর, পায়রা, শালিক, হাতী বাঁদর, মানুষ প্রভৃতি প্রাণীদের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে সেইজন্য এদের বলা হয় "মেরুদণ্ডী প্রাণী"। চিংড়ী, মশা, কেঁচো, প্রজাপতি, শামুখ এদের শরীর খুব নরম, মেরুদণ্ডও নেই এদের বলা হয় "অমেরুদণ্ডী"।

সমুদ্রের প্রবাল এক জাতের অমেরুদণ্ডী জীব। যেখানে সমুদ্রের জল পরিষ্কার আর স্রোতহীন সেইখানে প্রবালেরা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে; সেইখানেই তাদের মৃতদেহ জ'মতে থাকে; যুগ যুগ ধ'রে এই রকম ক'রে জ'মতে জ'মতে শেষে একটা প্রবাল দেহের তৈরী দ্বীপ সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠে; একেই বলা হয় প্রবাল দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরে বেশীর ভাগ দ্বীপই প্রবালের তৈরী।

যে সব শাঁখ, গুগলী, ঝিনুক দেখতে পাও সেগুলো হ'চ্ছে আর এক ধরণের অমেরুদণ্ডী জীবের শরীরের ঢাকনী। তোমরা বোধ হয় জানো না যে মুক্তো পাওয়া যায় ঝিনুকের পেটের মধ্যে। তবে সব ঝিনুকেই মুক্তো থাকে না। ঝিনুক বালিতে দাগ কেটে চলে আর পোকা মাকড় ধ'রে খায়। সেই সময় হয়তো খাবারের সঙ্গে একটা ছোট বালির কণা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। ঝিনুকের শরীরটা ভারী নরম তাই বেচারার এতে বড় কষ্ট হয় সেই কষ্ট দূর ক'রবার জন্য পেটের মধ্যেকার বালির কণার চারধারে একরকম রসের আস্তর পড়ে। এই স্তরগুলো জমে শক্ত হ'য়ে যায়। ঝিনুকের যন্ত্রণা বন্ধ হয় কিন্তু স্তর পড়া থামেনা, বছরে বছরে পুরু হয়ে শেষে সুন্দর সুগোল স্বচ্ছ দামী একটা মুক্তায় পরিণত হয়; ঝিনুক এ খবর নিজেই জানতে পারে না। জাপানে ঝিনুকের চাষ হয় রীতিমত। জাপানীরা ঝিনুক ধ'রে ইচ্ছে ক'রে মধ্যে বালি পুরে দেয়, ফলে স্বাভাবিক মুক্তো জন্মায়। কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, চিংড়ী এই সব জন্তু পড়ে অমেরুদণ্ডী জীবেদের আর একভাগে। আমরা বলি বটে চিংড়ী মাছ কিন্তু মাছের শিরদাঁড়া আছে আর চিংড়ীর শিরদাঁড়া নেই। চিংড়ী মাছ নয় কেন্নোজাতের এক রকম পোকা। সমস্ত প্রাণীজগতের চার ভাগের তিন ভাগ পতঙ্গ আর একভাগ মাত্র অন্যান্য প্রাণী। পিঁপড়ে, মশা, মাছি প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গ প্রথমে ডিম পাড়ে, তারপর সেই ডিম থেকে যখন বাচ্চা বের হয় তখন দেখতে হয় ঠিক কৃমির মত, এদের বলা হয় "লার্ভা" বা শুক। তোমরা বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ক'রবে না যে বিশ্রী কাঁটাওলা যে সব শুঁয়োপোকাগুলো দেখতে পাও সেগুলো অমন সুন্দর রঙীন প্রজাপতিরই শুককীট। শুককীটগুলো প্রথমে খুব পেটুক থাকে। গুরু ভোজনের পর এদের শরীরে একরকম সুতোর মত আবরণে ঢেকে যায়। এই ঢাকা পোকাকে বলে "গুটিপোকা"; প্রজাপতির গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরী হয়।

কিছুদিন মরার মত পড়ে থাকার পর গুটি কেটে পাখাওলা পতঙ্গ বেরিয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ পতঙ্গরা আলাদা আলাদা থাকতে ভালবাসে। কিন্তু পিঁপড়ে, উই, মৌমাছি এই সব পতঙ্গেরা আমাদেরই মত রীতিমত সমাজ, গ্রাম তৈরী ক'রে বাস করে। পিঁপড়েদের সমাজ গঠন যে কি আশ্চর্য্য তা আর মুখে বলা যায় না। পিঁপড়ে তিন রকমের হয়, পুরুষ, স্ত্রী আর শ্রমিক। স্ত্রী আর পুরুষ পিঁপড়ের দু'জোড়া পাতলা পাখা আছে, কিন্তু যে সমস্ত পিঁপড়েদের আমরা সচরাচর দেখি সেগুলোর পাখা থাকে না; এদের বলা হয় শ্রমিক পিঁপড়ে। পৃথিবীতে বোধ হয় মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী পিঁপড়েদের বুদ্ধিকে হার মানাতে পারবে না। পিঁপড়েদের মধ্যে সৈন্য সামন্ত, চাকর, দরওয়ান, মেথর, ডাক্তার, চাষা সবই আছে। স্ত্রী পিঁপড়েগুলো খালি ডিম পেড়েই মুক্তি পায়; এদের বলা হয় "রাণী"। একটি পরিবারে একটির বেশী রাণী থাকে না। পুরুষ পিঁপড়েরা ভারী অলস কোন কাজই করে না, এদের কেউ যত্নও করে না, তবু এদের নাম "রাজা"। অদ্ভুত হ'চ্ছে শ্রমিক পিঁপড়েগুলো, এরা যেমনি বুদ্ধিমান তেমনি চটপটে। বাসা তৈরী, মেরামত, পরিষ্কার করা, খাবার জোগাড় করা, বাচ্ছাদের মানুষ (?) করা, সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজ এই শ্রমিকদেরই ক'রতে হয়; এদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া নেই, মারামারি নেই, ভুলচুক নেই, কলের মত সব কাজ হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ কোন জায়গায় খাবারের সন্ধান পেলে তখনি দলে খবর দেয়; তারপরে সকলে মিলে বাড়িতে খাবার ব'য়ে নিয়ে আসে; তারা পেটুকের মত যে সব খেয়ে ফেলে তা নয়, ভবিষ্যতের জন্য খানিকটা সঞ্চয়ও করে রাখে। এদের বাসা তৈরী করাও অদ্ভুত। নানান জাতের পিঁপড়ে নানা ভাবে বাসা করে। কেউ করে মাটির মধ্যে বাসা, কেউ গাছে বাসা করে, কেউ পাতা সেলাই ক'রে তার মধ্যে বাসা বাধে। বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, শোবার

ঘর, বৈঠকখানা, গোয়াল, রাজদরবার, জেলখানা সবই থাকে। একই বাসায় এরা অনেক দিন বাস করে। যখন আর বাসায় জায়গা হয় না তখন কতকগুলো শ্রমিক একটা রাজা আর একটা রাণী নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বাসা বাঁধে। শ্রমিকরা রাজা আর রাণীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে পাছে তারা দল ছাড়া হ'য়ে যায়। এরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাবার জিনিষ এনে সকলকে খাইয়ে নোংরা জিনিষগুলো বাসার বাইরে ফেলে দেয়; কেউ মরে গেলে তাকেও তখুনি বাইরে এনে ফেলে। কয়েক জাতের পিঁপড়ে আবার মৃতদেহ কবর দেয়। রাজাদের আর রাণীর পাখা হ'লে কেবল উড়ে পালাবার চেষ্টা করে আর শ্রমিকরা তাদের প্রাণপণে বাধা দেয়। তবু যারা পালাতে পারে তারা বাইরে গিয়ে অন্য জন্তুর ভক্ষ্য হয়। সেইজন্যই বলে "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।" পিঁপড়েদের শূক নিজেরা খেতে পারে না শ্রমিকরাই তাদের যত্ন করে খাইয়ে পড়িয়ে বড় ক'রে তোলে।

আমরা যেমন গরু পুষি তেমনি পিঁপড়েরাও এক রকম পোকা পোষে। এদের খুব ক'রে গাছের পাতা এনে খাওয়ায়, এদের থাকবার জন্য গোয়াল তৈরী করে দেয়। এই সব পোকাদের গা থেকে এক রকম দুধের মত রস বেরোয়, পিঁপড়েরা তাই খেতে খুব ভালবাসে। এরা চাষবাস ও কৃষিকার্য্য করে। বর্ষার আগে বাইরে থেকে ব্যাঙের ছাতার মতন উদ্ভিদের বীজ মুখে ক'রে এনে বাসার চারধারে বুনে দেয়। ক্ষেতের তদারক করে এরা খুব, বর্ষাকালে বীজ থেকে গাছ জন্মায়, তাদের নরম পাতা এদের প্রিয় খাদ্য। এক জাতের পিঁপড়ে আছে তারা ভারী মজার উপায়ে খাবার সঞ্চয় করে। শ্রমিক পিঁপড়েগুলো কতকগুলো দাস পিঁপড়ের কৌশলে হজমশক্তি নষ্ট ক'রে দিয়ে খুব ক'রে খাবার খাওয়ায়। দাস পিঁপড়েগুলো কিন্তু খাবার হজম ক'রতে পারে না তাই সমস্ত খাবার তাদের পেটের মধ্যে জমা থাকে। ভবিষ্যতে যখন আবার খাবারের দরকার পড়ে

তখন শ্রমিকরা এই পিঁপড়েদের পেট ফাটিয়ে খাবার বার ক'রে নেয়। নানা কারণে দুদলের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বেধে যায় মাঝে মাঝেই। যে দলের জয়লাভ হয় সেই দল অন্যদলের বাসা লুটতরাজ ক'রে তাদের জিনিষপত্র নিজেদের বাসায় নিয়ে আসে, বন্দীদের ধ'রে এনে দাস বা চাকর ক'রে রেখে দেয়।

আফ্রিকায় একরকম ভীষণ স্বভাবের পিঁপড়ে আছে, তারা প্রকাণ্ড দল বেঁধে থাকে। এই রকম দল বেঁধে যখন তারা শিকারে বের হয় তখন সিংহ, হাতী গরিলা পর্য্যন্ত সভয়ে পথ ছেড়ে পালায়। কোন জন্তু সামনে প'ড়লে তাকে তক্ষুনি নিঃশেষে খেয়ে ফেলে, শুধু হাড় কখানা প'ড়ে থাকে সাক্ষী দেবার জন্য।

মৌমাছিরাও এমনি দল বেঁধে থাকে। তাদের বাসায় মধু থাকে বলে তার নাম মৌচাক। এক একটা চাকে অজস্র ছকোণা ঘর থাকে; শ্রমিক মৌমাছির শরীর থেকে মোম বেরোয়, তাই দিয়ে মৌচাক তৈরী হয়। নানান ফুলে উড়ে উড়ে গিয়ে মৌমাছি মধু জোগাড় ক'রে চাকে এনে ভর্ত্তি করে ভবিষ্যতে খাবার জন্য। যদি মাইল খানিকের মধ্যে কাছাকাছি ফুলের বন থাকে তাহলে একেবারে মধু জোগাড় ক'রতে মৌমাছিকে প্রায় ৮৬,৫৫২ মাইল পথ উড়তে হয়। ভাবো কি ব্যাপার! এরা ঝড় বৃষ্টির সম্ভবনা আগে থেকেই বুঝতে পারে, তার আশঙ্কা থাকলে মধু জোগাড়ের কাজ বন্ধ রেখে দল বেঁধে বাসায় ফিরে আসে। অনেক দেশে লোকে মধুর জন্য মৌমাছি পোষে।

মাছি, মশা, প্রজাপতি, এরাও সব এই জাতের। ঈশ্বরগুপ্ত ব'লেছিলেন "রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।" তা সত্যি, এদের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। মশা অনেক রকমের। যারা ম্যালেরিয়া বিষ ছড়ায় তাদের নাম "এনোফেলিস্", যখন মাটিতে বসে তখন এদের শরীর মাটির ওপর কোণাকুনী থাকে। যারা ফাইলেরিয়া রোগের বিষ ছড়ায় তাদের নাম "কিউলেক্স", এদের শরীর মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হ'য়ে থাকে। মশারা

অগভীর জলে ডিম পাড়ে। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতে চারধার থেকে জোনাকীর ঝাঁক পিট পিট ক'রে বেরিয়ে পড়ে। জোনাকীর বাহার আঁধার রাতে। জোনাকীও একরকম পতঙ্গ। কিন্তু জোনাকীর গায়ে কি সত্যিই আগুন জ্বলে? না, ওই আলোর তাপ নেই আর জিনিষটা আগুনও নয়। এটা একটা রাসায়নিক জিনিষ, আভা বেরোয় তাই থেকেই। কোন পতঙ্গই মুখ দিয়ে শব্দ ক'রতে পারে না; মৌমাছি, বোলতা, ঝিঁঝিঁ এরা সব পাখার সঙ্গে পাখা ঘসে শব্দ করে।

(মেরুদণ্ডী)

তোমরা বোধ হয় জান যে পাঁচ রকমের মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে, যেমন মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখী আর স্তন্যপায়ী।

মাছ যে কতরকমের আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। স্ত্রী মাছেরা ডিম পাড়ে আর পুরুষ মাছ এসে তাদের ওপর এক রকম রস ছড়িয়ে দেয়, তারপর কেউ আর ডিমের খোঁজখবর করে না। এক একটা মাছের ডিমের সংখ্যা আট দশ লক্ষ। এদের প্রায় অর্দ্ধেক নিজেরা কিম্বা অন্য মাছে খেয়ে ফেলে, বাকীগুলো থেকে বাচ্চা হয়। হাঙরও এক রকমের মাছ। এদের সমুদ্রের বাঘ বলা যায়। এরা যেমনই হিংস্র, তেমনি গায়ের জোর আর চট্‌পটে। আমরা বলি বটে "তিমি মাছ", কিন্তু তিমি সত্যি মাছ নয়, এক রকম স্তন্যপায়ী জন্তু, এরা ডিম পাড়ে না। আজকাল তিমিরাই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাণী। একটা একটা দ্বীপের মতনও এদের চেহারা হয়। নেষ্টীংস্পুড্‌ল্ ব'লে কৈ মাছের মতন একরকম মাছ আছে, এরা জলের ধারে খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধে আর ডিমে তা দেয়।

ব্যাঙ্ উভচর জাতের, এরা স্থলেও বাস করে, জলেও বাস করে। এরা অতি বিশ্রী জানোয়ার। এদের রক্ত ঠাণ্ডা, সারা শীতকাল এরা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বর্ষাকালে পুকুরপাড়ে যে সুমধুর কনসার্ট শুনে থাকি পুরুষ

ব্যাঙ্‌রাই তার জন্য মেডেলের দাবী ক'রতে পারে। ব্যাঙ্‌ ছোট অবস্থায় মাছের মত, বড় হ'লে তবে ডাঙ্গায় উঠতে পারে। সাপ, কুমীর, টিকটিকি, গিরগীটি, কচ্ছপ এরা সব সরীসৃপ। এরা বুকে হাঁটে। কতকগুলো সাপের ভীষণ বিষ কেউ বা নির্বীষ। বিষাক্ত সাপের চোয়ালের সামনে এক জোড়া ধারাল বাঁকা আর ফাঁপা দাঁত আছে, এরই তলায় থাকে বিষের থলি, সুতরাং কাউকে কামড়ালেই দাঁত দিয়ে বিষ গড়িয়ে এসে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় ফলে ঘটে বিপদ। কেউটে সাপের বিষ সব চেয়ে বেশী। অনেকের ধারণা সাপ বিদ্যুৎ বেগে ছোটে কিন্তু মানুষ সব চেয়ে দ্রুতগামী সাপের চেয়ে জোরে হাঁটতে পারে। এদের দ্রুততম গতি হ'চ্ছে ঘণ্টায় চার মাইল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ যে টিকটিকী কেমন দেওয়াল, ছাদের তলাব দিকের গা এই সব জায়গা দিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে স্বচ্ছন্দে, কি ক'রে এরকম হয়? এদের পায়ের তলার মাংস নরম আর তার মধ্যে একটা ছোট গর্ত্ত আছে। কোথাও পা রাখলেই চাপে পায়ের গর্ত্তটা থেকে বাতাস বেরিয়ে যায় সুতরাং পাটা চেপে আটকে যায়। তা ছাড়া এদের পায়ের থেকে একটু আঠাল জিনিষ বের হয়, এও আটকে থাকতে খুব সাহায্য করে।

সরীসৃপদের পরেই আসে পাখী। এদের রক্ত গরম, আর ডিম পাড়ে। প্রায় পাখীই বাসা করে। ঈগল আর চিল সবচেয়ে উঁচুতে উঠতে পারে। পায়রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়েও ক্লান্ত হয় না। এরা আগে ডাকের কাজ ক'রতো। বাবুই পাখীর বাসা সব চেয়ে চমৎকার। তালচোঁচ বলে একরকম পাখী আছে, চীনেরা এর বাসা রান্না ক'রে খায়। আমাদের দেশে দেখা যায় যে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস পদ্মার চরে, সুন্দরবনের খালে, বড় বড় বিলের তীরে উড়ে আসে। এরা কোথা থেকে আসে জানো? এরা আসে মানস সরোবরের তীর আর সাইবেরিয়ার প্রান্তর থেকে। সারা

শীতকালটা এদেশে কাটিয়ে বসন্তকালে এরা আবার দেশে ফিরে যায়। আরো অনেক যাযাবর পাখী আমাদের দেশে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে ঠিক শীতের আগেই ছোট বড় নানারকমের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অন্য দেশে চ'লে যায়। একদিন হয়তো দেখা গেল হাজার হাজার পাখী কলরব ক'রতে ক'রতে আকাশে ভেসে উড়ে যাচ্ছে। বিশাল সমুদ্র, উন্নত পর্ব্বত, উষর মরুভূমি কিছুই তাদের গতিরোধ ক'রতে পারে না। এদের কেউ কেউ আমেরিকা থেকে, আতলান্তিক মহাসাগর পার হ'য়ে ইউরোপে বেড়াতে আসে। এরা এমন ভাবে উড়ে যায় কেন? শীত-প্রধান দেশে শীতকালে মাঠঘাট সব বরফে ডুবে যায়, খাবার মেলে না সহজে, শীত পড়ে ভয়ঙ্কর; সেইজন্য এরা গরমের দেশে উড়ে যায়। তাদের পথ ভীষণ বড়, কারোর পথ এক হাজার মাইল, কারোর দু' হাজার মাইল কারোর বা আট দশ হাজার মাইল পর্য্যন্ত। কি ক'রে যে তারা এই দীর্ঘ পথ দিক ঠিক রেখে উড়ে যায় তা খুবই আশ্চর্য্য! বুনোহাঁস, বক, পানকৌড়ি, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীর ঝাঁক খুব উঁচু দিয়ে উড়ে চলে। কতকগুলো পাখী অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে, কোকিল কাকের বাসায় আর পাপিয়া ছাতারে পাখীর বাসায় ডিম ফেলে উড়ে পালায়, কাকে আর ছাতারে অজ্ঞাতে এই সব ডিমগুলোকেও তা' দিয়ে ফোটায়। উটপাখী সবচেয়ে বড় পাখী আর আমেরিকার "হামিং বার্ড" সব চেয়ে ছোট পাখী।

পাখীর পরে স্তন্যপায়ী। সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী হ'চ্ছে তিমি, এর কথা আগেই বলেছি আর "শ্রু" বলে এক রকম ইঁদুরের মত প্রাণী সব চেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী। জিরাফ সব চেয়ে উঁচু প্রাণী। এরা একদম শব্দ ক'রতে পারে না। বাদুড় পাখীর মত উড়তে পারলেও এরা পাখী নয়, এরা ডিম পাড়ে না, এরা স্তন্যপায়ী জন্তু; শীতকালে খাবারের অভাব হয় ব'লে আর খুব ঠাণ্ডা পড়ে ব'লে বাদুড়রা সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। পশু পাখী সকলেই চারিধারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে

নিতে চায় এ খবর আগেই দিয়েছি। উট থাকে মরুভূমিতে সেখানে জল পাওয়া যায় না সব সময়ে; ৪-৫দিন পর্য্যন্ত জল না খেয়ে থাকতে হয়। সেই জন্য এদের পেটের মধ্যে অনেকগুলো বাড়তি জলপাত্র আছে, কোথাও জল পেলেই এগুলো ভর্ত্তি ক'রে নেয় আর তাই দিয়েই অনেক দিন চলে। গরু, মহিষ, এরা আগে থাকতো বনে, শত্রু চারধারে, আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় নেই, তাই কোন জায়গায় খাবার দেখতে পেলেই তাড়াতাড়ি ক'রে না চিবিয়ে গিলে ফেলে তো। এদের পাকযন্ত্রে দুটো খোপ। তারপর কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে, প্রথম খোপ থেকে খাবারগুলো মুখে তুলে এনে ভাল ক'রে চিবিয়ে দ্বিতীয় খোপে পাঠায় তো; সেই খানেই হজম হয়, একে বলে "রোমন্থন" করা। এখন বনের বিপদ নেই বটে কিন্তু অভ্যাস র'য়ে গেছে। আফ্রিকার কৃষ্ণসার হরিণ জলের কাছে যেতে বড় ভয় পায় পাছে কেউ দেখে ফেলে। সেই জন্য তারা একেবারেই জল খায় না; তারা যে সব গাছপালা খায় তাই থেকেই তাদের প্রয়োজন মেটে। লোকে বলে বুনো শুয়োরই নাকি সব চেয়ে সাহসী প্রাণী আর চিতাবাঘ নাকি সব চেয়ে জোরে দৌড়োতে পারে। আমেরিকার বনে "শ্লথ" ব'লে একরকম জন্তু আছে তারা সব চেয়ে কুঁড়ে, একটি গাছেই ঝুলে থেকে জীবন কাটিয়ে দেয়।

জীবজন্তুরা আত্মরক্ষা করে নানা উপায়ে। কতকগুলো বিক্রমশালী জন্তু জানোয়ার আত্মরক্ষার জন্য সামনাসামনি যুদ্ধ করে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো তাদের থাবা দাঁত এই সব দিয়ে আত্মরক্ষা আর খাবার যোগাড় করে; গণ্ডারের নাকের ওপর খাঁড়াখানা আর গায়ের শক্ত চামড়াই এর অস্ত্র। কোন কোন জাতের গণ্ডারের আবার একজোড়া খাঁড়া থাকে। হাতী শুঁড় দিয়ে নিজেকে বাঁচায়। বিপদে প'ড়লে আফ্রিকার গরিলারা আক্রমণকারীদের দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বুকের উপর চেপে দম বন্ধ ক'রে মারতে চায়। বাইসনের শিংই তাদের একমাত্র বাঁচবার উপায়। সাপ নিজেকে বাঁচায় তাদের বিষ দাঁত

দিয়ে আর জড়িয়ে মারবার উপযোগী শক্তিশালী শরীর দিয়ে। অনেক জন্তু আছে তারা দুর্ব্বল ব'লে সামনাসামনি লড়তে পারে না কিন্তু তাদেরও আত্মরক্ষার নানা উপায় আছে। হরিণ, ঘোড়া, উটপাখী এরা সব প্রবল বেগে ছুটতে পারে ; এইজন্য তারা বিপদের সময় ছুটে পালিয়ে বাঁচে। উটপাখী আবার একটা মজা করে, তারা যখন দেখে আর পালাবার কোন উপায়ই নেই তখন তারা বালির মধ্যে মাথা গুঁজে দেয় ভাবে বুঝি কেউ দেখতে পাবে না। কয়েক জাতীয় হরিণ, জেব্রা, জিরাফ এরা থাকে লম্বা লম্বা ঘাসের বনে তাই তাদের গায়ে হলদে, পাঁশুটে রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে সুতরাং তাদের শরীর ঘাস পাতার সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়। উট ও অন্যান্য মরুভূমিবাসীদের গায়ের রঙ্ হয় বালির মত তাই শত্রুর চোখে ধূলো দেবার খুব সুবিধা। কুমীর, গোসাপ এরা যখন ভয় পেয়ে মাটির ওপর দিয়ে ছোটে তখন তাদের হাতে পায়ে লেগে পঙ্কের ইট পাটেকেল সব পেছন দিকে নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে, মনে হয় যেন এরাই ঢিল ছুড়ছে। গিরগীটিরা যখন ভয় পায় তখন তাদের গায়ের রঙ্ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। মাছেরা আত্মরক্ষা করে অনেক সময় তাদের বীভৎস চেহারা দিয়ে। কারোর কারোর অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকে। খড়্গা মাছের মাথায় থাকে খড়্গা, করাত মাছের নীচেকার ঠোঁটটা করাতের মত ; শঙ্করী মাছের ল্যাজ একটা ভীষণ চাবুকের মত ; বজ্রমাছ, স্কেটমাছ, বাইন মাছ ইত্যাদি প্রায় দেড়শ রকম মাছ শরীর থেকে বিদ্যুৎ বের ক'রে আত্মরক্ষা করে। পোকামাকড়রা নিজেদের বাঁচায় অনেক রকম উপায়ে। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, পিঁপড়ে এদের আত্মরক্ষার জন্য হুল আছে। কারোর বা গায়ে বিশ্রী গন্ধ; কেউ বা খেতে অতি তেতো। শুঁয়োপোকাদের গায়ে ভয়ঙ্কর শুঁয়ো থাকে একবার গায়ে ফুটলে হ'য়েছে আর কি ! অনেক পোকা আক্রান্ত হ'লে এমন এক দুর্গন্ধময় রস গা থেকে বের ক'রে দেয় যে আক্রান্তকারী আর পালাবার পথ পায় না। অনেক

পোকামাকড়ের রঙ্ আর আকার গাছের ডালপালা ফুলপাতা এই সবের মত হয়, যখন তারা গাছে ব'সে থাকে তখন তাদের চেনাই দায়, গাছেরই অংশ ব'লে মনে হয়।

কোন পশুপাখী কতদিন বাঁচে,—

কচ্ছপ—১৫০-৩০০ বছর
হাতী—১০০-২০০ বছর
শকুনী—১০০-১৫০ বছর
হাঁস—২৫-৫০ বছর
টিয়াপাখী—২০-৫০ বছর
ভালুক—২০-৩৫ বছর
ঘোড়া—১৫-৩৫ বছর
সিংহ—১৫-২৫ বছর
বিড়াল—১০-২৫ বছর
মুরগী—১৫-২০ বছর
বাঘ—১৫-২০ বছর
কুকুর—১২-১৫ বছর
ছাগল—১২-১৫ বছর
নেকড়ে—১০-১৫ বছর
খরগোস—৭-১২ বছর
ব্যাঙ—৫-১০ বছর
পেঁচা—৬-৮ বছর
গিনিপিগ—৫-৭ বছর
ইঁদুর—৩-৪ বছর

কোন পশুপাখী কত জোরে দৌড়োতে বা উড়তে পারে,—

ল্যামার্জিয়ার্স পাখী—ঘণ্টায় ১১০ মাইল
সোয়ালো—ঘণ্টায় ১০৬ মাইল
ল্যাপউইঙ্গস্—ঘণ্টায় ৮০ মাইল
গ্রেহাউণ্ড কুকুর—ঘণ্টায় ৬০ মাইল
চিতা—ঘণ্টায় ৬০ মাইল
হাঁস—ঘণ্টায় ৫৮ মাইল
গ্যাজেল হরিণ—ঘণ্টায় ৫০ মাইল
পেলিকেন পাখী—ঘণ্টায় ৫০ মাইল
সারস—ঘণ্টায় ৪৮ মাইল
কাক—ঘণ্টায় ৪০ মাইল
পায়রা—ঘণ্টায় ৩৬ মাইল
হাঙর—ঘণ্টায় ৩৫ মাইল
জিরাফ, মহিষ, উটপাখী—ঘণ্টায় ৩০ মাইল
হাতী—ঘণ্টায় ২০ মাইল
কচ্ছপ—পাঁচ ঘণ্টায় ১ মাইল

বুদ্ধি অনুসারে সাজান কয়েকটী প্রাণী

(১) শিম্পাঞ্জী (২) ওরাং ওটাং (২) হাতী (৪) গরিলা (৫) কুকুর (৬) ভোঁদড় (৭) ঘোড়া (৮) সিংহ (৯) ভাল্লুক (১০) বিড়াল।

শরীর বিজ্ঞান

কি ক'রে দুর্গা প্রতিমা তৈরী করা হয় দেখেছো? প্রথমে ঠাকুর পাটের ওপর কয়েকটা বাঁশ খাড়া ক'রে বাধে, তারপর ঐ বাঁশের ওপর খড় জড়ায়, জড়িয়ে একটা কাঠামোর মত তৈরী করে; এর ওপর আবার দেয় মাটি, তখনই ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলো ফুটে ওঠে। সব শেষে প্রতিমার গায়ে রঙ্ দেওয়া হয়; এইবারেই এত চমৎকার দেখায়। আমাদের শরীরও ঠিক তেমনি ভাবে তৈরী; একেবারে ভেতরে আছে মেরুদণ্ড, তার ওপর অনেক হাড়গোড় জড়িয়ে একটা কাঠামো তৈরী করা হ'য়েছে, এই কাঠামোটা ঢাকা মাংস দিয়ে, সকলের ওপরে আছে চামড়ার আবরণ। আমাদের শরীর ২০৬ খানা হাড়ের টুক্‌রো দিয়ে তৈরী, সব চেয়ে বড় হাড়খানা হচ্ছে উরুর, এর নাম "ফেমুর" আর সব চেয়ে ছোট হাড় আছে কাণে, তার নাম "আল্‌না।" রেলের ইঞ্জিনে যেমন কলকব্জা থাকে তেমনি আমাদের শরীরেরও কত কলকব্জা, এও একটা ইঞ্জিন, কত যন্ত্র-পাতি, যেমন পেশীযন্ত্র, স্নায়ুযন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র আর সঞ্চালনযন্ত্র। যখন পাঠার গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয় তখন লক্ষ্য ক'রলে দেখবে মাংসের ওপর লালচে রঙের দড়ি দড়ি একরকম জিনিষ র'য়েছে; একেই বলে পেশী। আমাদেরও অনেক রকম পেশী আছে, এই পেশীর সাহায্যে চলাফেরা, নড়াচড়া করি। প্রত্যেক কাজ ক'রতে পেশীর প্রয়োজন, এমন কি হাসতে কাঁদতেও; হাসতে গেলে তেরটি পেশীর

দরকার কিন্তু কাঁদতে গেলে পঞ্চাশটিরও বেশীর দরকার হয়। আমাদের শরীরে প্রায় ৫০০ মাংসপেশী আছে। স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ অতি চমৎকার। মনে কর কোন জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'ল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তখুনি টেলিগ্রাম গেল, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা ক'রলেন শান্তিরক্ষার জন্য ; কোন জায়গায় বন্যা হ'ল, তার কাছে খবর গেল, তিনিও সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব ক'রলেন না। মগজটা হ'চ্ছে আমাদের জেলা ম্যাজিষ্টেট ; হয়ত আঙ্গুল খানিকটা কেটে গেল অমনি স্নায়ুর তার দিয়ে মগজ মশাই-এর কাছে টেলিগ্রাম গেল, মগজমশাই তখুনি আঙ্গুলের ব্যথা বুঝলেন, যথারীতি ব্যবস্থা ক'রতেও দেরী ক'রলেন না ; পেশীদের সঞ্চালিত হ'তে আদেশ দিলেন ঐখানের রক্ত জমিয়ে দিতে যাতে বেশী রক্ত নষ্ট না হয়, একটা হাতকে আদেশ দিলেন ঐখানে হাত বুলাতে, মুখকে ব'ললেন ফুঁ দিতে। স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ টেলিগ্রামের তারের মত পলকের মধ্যে আমাদের শরীরের খবর নিয়ে যাওয়াআসা করা গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা। যেখানে স্নায়ু নেই সেখানে আমাদের অনুভব করার শক্তিও নেই, তাই নখ চুল এই সব কাটলে একটুও লাগে না। আমাদের মাথার চুলের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার, এক মাসে চুল বাড়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি ক'রে। মনে ভয় হ'লে এক শ্রেণীর স্নায়ু শরীরের সর্ব্বাঙ্গে সতর্ক হ'তে খবর পাঠায়, এতে লোমকুপের তলাকার পেশীগুলো খাড়া হ'য়ে ওঠে ফলে সব লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। একজন সাধারণ মানুষের মগজের ওজন প্রায় দু'সের আর মেয়েদের প্রায় দেড় সের। মগজের ওজনের ওপর কিন্তু বুদ্ধি বেশী কম নির্ভর ক'রে না। পরিপাক যন্ত্রের কাজ হ'চ্ছে আমরা যা খাই তা হজম করা। এ বেচারার ওপর যদি বেশী চাপ দেওয়া হয় তা হ'লে ভারী মুস্কিল, কাজের ভারে হাঁপিয়ে উঠবে। নিষ্কাশন যন্ত্রের কাজ হ'চ্ছে যে জিনিষটা হজম করা গেল না তা শরীর থেকে বের ক'রে দেওয়া।

আমাদের রক্ত সব সময়েই দূষিত হ'য়ে উঠছে, ফুসফুস দিনরাত এই খারাপ রক্তকে পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে; এই কাজে অক্সিজেনের দরকার আর খানিকটা কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইড্ ব'ল একটা দূষিত গ্যাস কেবলই তৈরী হ'চ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের কাজ বাতাস থেকে অক্সিজেন নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া আর প্রশ্বাসের সঙ্গে দূষিত গ্যাসটা বের ক'রে দেওয়া। প্রত্যেক-বারে আমরা প্রায় পনের আউন্স অক্সিজেন টেনে নিচ্ছি। হৃদপিণ্ডের কাজটা হ'চ্ছে পাম্পের মত একবার শিরার নল দিয়ে দূষিত রক্ত টেনে ফুসফুসে পাঠানো, আর ফুসফুস থেকে ভাল রক্ত সারা অঙ্গে ফেরত পাঠানো; বুকে কাণ দাও শুনবে পাম্পের কাজ দপদপ ক'রে চলেছে। পূর্ণবয়স্কদের হৃদপিণ্ড সাধারণতঃ মিনিটে ৭২ থেকে ৮০ বার দপদপ করে, শিশুদের কিছু বেশীবার; উত্তেজনা বা ভয় জ্বর ও অন্য কারণে অসুস্থ হ'লে স্পন্দন দ্রুততর হয়। হৃদপিণ্ডের ওজন এক বা দেড় পোয়া, ২৪ ঘণ্টায় এ প্রায় সাড়ে বারশো মণ রক্ত পাম্প করে। পূর্ণবয়স্কদের মিনিটে আঠার বার শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। অনেক সময় আমাদের রক্তে অনেক ময়লা জ'মে যায় তখন বেশী অক্সিজেনের দরকার; এই খবর স্নায়ুযোগে মগজে পৌছায়, তখনি হাই উঠে একেবারে অনেকটা অক্সিজেন টেনে নেওয়া হয়। আমাদের শরীরে প্রায় সাড়ে তিন সের রক্ত আছে। শিরার মধ্যেদিয়ে রক্ত চ'লে ঘণ্টায় সাত মাইল হিসাবে, এক বছরে সমস্ত রক্ত পাঁচ হাজার মাইল ঘুরে আসে। আমাদের সর্ব্বাঙ্গের চামড়ার ওপর প্রত্যেক লোমের তলে একটী ক'রে ফুটো আছে, এদের বলা হয় লোমকূপ, এই সব ফুটো দিয়ে শরীরের দূষিত জল ঘাম হ'য়ে বেরিয়ে যায়। আমাদের সবশুদ্ধ ২১,৫০০,০০০,০০,০০,০০০টা লোমকূপ আছে। বেঁচে থাকতে হ'লে খাবার আর ঘুমের দরকার। একটা লোক না খেয়ে ৭৫দিন, না জল খেয়ে ১৫ দিন আর না ঘুমিয়ে ১০ দিন বাঁচতে পারে। আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণের জন্য চাই ছানা জাতীয় খাবার, তাপ রক্ষা ও কর্ম্ম-

শক্তির জন্য চাই ঘি জাতীয় আর চিনি জাতীয় খাবার আর দেহের ময়লা নিষ্কাশন আর রোগ প্রতিরোধের জন্য চাই ছিবড়াযুক্ত ও ভাইটামিনওলা, শাকশব্জী ফলমূল। ভাইটামিনকে বলা হয় খাদ্যপ্রাণ এর মানে—ভাইটা অর্থাৎ লাইফ; আমিন অর্থাৎ নাইট্রোজেন। প্রায় পাঁচ রকমের ভাইটামিন আছে, এদের অভাবে নানারকম রোগ হয়। ডিম, দুধ ও কাঁচা শাকশব্জী এই সবে আছে ভাইটামিন এ, এর অভাবে হয় গলার ও ফুসফুসের রোগ। ভাইটামিন বি আছে, আলু, গাজর, ফল, ডিম আর মেটেতে; এর অভাব হ'লে হয় পেটের আর মাথার গোলমাল। ভাইটামিন সি আছে কাঁচা শাকশব্জীতে, টম্যাটোতে, টক ফলে; এর অভাবে হয় রক্ত খারাপ। ভাইটামিন ডি আছে রোদে, কডলিভার অয়েল; এতে হাড় মোটা হয়। ভাইটামিন জি আছে দুধ, কমলা, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে; এর অভাবে হয় স্কার্ভি ব'লে এক রকম রোগ। চা, কফি, সাদা ময়দা, কলে ছাটা চাল, টিনের মাংস, চকলেট, জলপাই এ সবে একটুও ভাইটামিন নেই। খাবার বেশী রান্না ক'রলে ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের খাবার হজম ক'রতে হ'লে প্রচুর পরিমাণে জল দরকার। একজন সাধারণ লোকের দিনে তিন্ সের জলের প্রয়োজন। আমাদের ভাত হজম ক'রতে লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা, সাগু ২ ঘণ্টা, দুধ ২ ঘণ্টা, আলু ২॥০ ঘণ্টা, পাউরুটি ২॥০ ঘণ্টা, মাংস ৩ ঘণ্টা, মাছ ৩ ঘণ্টা, ডিম ৩॥০ ঘণ্টা, মাখম ৩॥০ ঘণ্টা আর এই তালিকার উপর দৃষ্টি রেখে খাওয়া দাওয়া করা উচিৎ।

—❋ নৃতত্ত্ব ❋—

যেমন পশুপাখী গাছপালা ইত্যাদি সব জীবদের নানা ভাগে ভাগ করা হয় তেমনি সারা পৃথিবীতে যত রকম লোক আছে তাদেরও মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন—ককেশীয়ান, মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো, মালয়ান ও আমেরিকান।

ককেশীয়ান বা ইন্দোইয়ুরোপীয়ান (শ্বেতাঙ্গ),—অধিকাংশ ইয়ুরোপীয়ান, পারসী, ইহুদি, হিন্দু, আফগান ও আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ইয়ুরোপীয়দের বংশধর (৭২,৭০,০০,০০০); এদের নাক উঁচু, চোখ বড়, চুল ঢেউখেলান। মঙ্গোলিয়ান (পীতাঙ্গ),—চীনা, জাপানী, বর্ম্মী, শ্যাম, তিব্বতীয়, কোরিয়ান, ল্যাপলাণ্ডার, ফিন, হাঙ্গেরিয়ান, তাতার, টার্ক ও কিছু রাশিয়ান (৬৮,০০,০০,০০০); এদের নাক ভোঁতা, চোখ ছোট, চুল সোজা। নিগ্রো (কৃষ্ণাঙ্গ),—আফ্রিকান, আদিম অষ্ট্রেলিয়ান, টাচ্‌মেনিয়ান। (১০,০০,০০,০০০); এদের নাক ও ঠোঁট মোটা, চুল ছোট ও কোঁকড়ান। মালয়ান (কৃষ্ণাঙ্গ),—মালয়ান, সিংহলী, ওসেনীয়া দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসি (১০,০৫,০০,০০০)। আমেরিকান (রক্তাঙ্গ),—আদি রেড ইণ্ডিয়ান (৩০,০০০,০০০)।

এদের মধ্যেও অনেক ভাগ আছে এবং পরস্পরের সংমিশ্রণেও অনেক নূতন জাত তৈরী হ'চ্ছে। নীচে বর্ণানুক্রমে কতকগুলো জাতির কথা দেওয়া যাচ্ছে।

অষ্টিয়্যাকস্‌—এরা মঙ্গোলীয়ান, উত্তর সাইবেরিয়াতে এদের বাস, শিকার প্রধান উপজীবিকা।

আফ্রিদি—এরা মিশ্র ককেশিয়ান আর মঙ্গোলিয়ান, ভারতের উত্তর

পশ্চিম সীমান্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে এদের বাড়ি; শিকার আর লুটপাটই একমাত্র ব্যবসা।

এজেটেক—এরা আমেরিকান, মেক্সিকোর আদিম অধিবাসী, এরা প্রাচীনকালে খুব সভ্য ছিল. তার নিদর্শন এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এস্কিমো—এরা মঙ্গোলিয়ান তবে গায়ের রঙ্ তত ফরসা নয়, উত্তর মেরুপ্রদেশে এদের বাস; স্মিথসাউণ্ডের এস্কিমোরা পৃথিবীর সব চেয়ে উত্তর দেশের অধিবাসী।

জিপ্সী—এদের নিজস্ব কোন দেশ নেই, সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় পূর্ব্বভারতে এদের আদিম নিবাস ছিল, এদের ভাষা "রোম্যানী" অনেকটা ভারতীয় ভাষার মত। এদের ককেশো-মঙ্গোলিয়ান ব'লে মনে হয়।

পলীনেশীয়ান—এরা পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, মালয়ান জাত, কিছু মঙ্গোলিয়ানের মিশ্রণ ঘ'টেছে।

ফেলাহিন—মিশরে এদের বাস কৃষিকার্য্যেই একমাত্র উপজীবিকা।

বামন—এদের বলে পিগমী, বাস মধ্য আফ্রিকায় এরাও উঞ্ছবৃত্তিধারী, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেঁটে জাত।

বুসমেন—এরাও নিগ্রো, দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী, অত্যন্ত অসভ্য, উঞ্ছবৃত্তিধারী।

বেদুইন—এরা ককেশিয়ো নিগ্রো। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়ায় বাস।

যাযাবর প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত, দস্যুতা প্রধান বৃত্তি।

লাপ্স—ল্যপলাণ্ডে এদের বাড়ি, এরাও যাযাবর, মাছধরাই একমাত্র ব্যবসা।

সেমিটক্স্—ককেসিয়ার পশ্চিম এসিয়া ও পূর্ব্ব ইয়ুরোপের অধিবাসী—

জীবিকা বৃত্তি অনুসারেও মানবজাতিকে নানা ভাগে ভাগ করা হয় যেমন—

১। স্থায়ী অধিবাসী—

(ক) প্রধানতঃ কৃষিজীবি—ভারতীয়, রাশিয়ান, চৈনিক ফেলাহিন ইত্যাদি।

(খ) প্রধানতঃ শিল্পজীবি—ইংরাজ, জার্ম্মান, বেলজিয়ান প্রভৃতি।

(গ) কৃষি ও শিল্পজীবি—ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি।

২। যাযাবর—

(ক) পশু শিকারী—এস্কিমো, ল্যাপ্স প্রভৃতি।

(খ) পশুপালক—কিরঘীজ, মঙ্গোলীয়ান ইত্যাদি।

(গ) দস্যুবৃত্তি—বেদুইন ইতাদি।

নানা দেশের মানুষের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়ানরা: আর বেঁটে লোক মধ্য আফ্রিকার পিগমীরা।

চীনারা তুটো কাঠি দিয়ে ভাত খায়।

জাপানীদের আত্মহত্যার প্রথা হ'চ্ছে পেট ছুরী দিয়ে ফাঁসিয়ে ফেলা, একে বলে "হারাকিরি"।

ইহুদি পরিবারে সন্তানসন্ততি সবচেয়ে বেশী এবং এদের নিজস্ব কোন দেশ নেই।

মিশরের লোকেরা নীল নদের মাটি আগুনে পুড়িয়ে খায়।

কে কি খায় :—(ক) পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা পিঁপড়ে আর রাঙা আলু দিয়ে তৈরী কেক খেতে বড় ভালবাসে (খ) মধ্য অষ্ট্রেলিয়ানরা পিঁপড়ে, কেঁচো আর গাছের ছাল দিয়ে বিস্কুট তৈরী ক'রে

খায় (গ) হটেনটট্‌স্‌রা ডিমভরা পঙ্গপালগুলো চিংড়িমাছের মত তৃপ্তি ক'রে খায় (ঘ) আফ্রিকার বুশম্যানদের কাছে কাঁচা কেন্নো আর শুঁয়ো পোকা খুব প্রিয় খাদ্য (ঙ) টক্কীরা পিঁপড়ের ডিমের ঝোল পেলে আর কিছুই চায় না (চ) এস্কিমোরা বন্যা হরিণের পেট চিরে তার মধ্যেকার অর্দ্ধ ভুক্ত দুর্গন্ধময় ঘাসপাতাগুলো খায় (ছ) টেরীডীলফিউসোর অধিবাসীরা তিন মাসের পচা তিমি মাছ খেতে বড় ভালবাসে। এই সবগুলো তোমাদের খেতে কেমন লাগে?

কোন্ দেশের লোক কতদিন বাঁচে—অষ্ট্রেলিয়া ৫৫ ; ইউ, এস, এ ৪৯ ; ইটালী ৪৪ ; ইংলণ্ড ৪৮ ; জাপান ৪২ ; জার্ম্মানী ৪৪ ; ডেনমার্ক ৫৪ ; নরওয়ে ৫৪ ; ফ্রান্স ৪৫ ; ভারতবর্ষ ২২ ; সুইজারল্যাণ্ড ৪৯ ; সুইডেন ৫৪ ; আর হল্যাণ্ড ৫১ বছর।

ইতিহাস

—※ প্রাগৈতিহাসিক ও বৈদিক যুগের ভারতবর্ষ ※—

"—হেথায় আর্য্য, হেথায় অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক-হুণ দল, মোগল-পাঠান,
এক দেহে হ'ল লীন—।"

জানিনা কবে কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ভারতবর্ষের সৃষ্টি হ'ল, জানি না কবে প্রথম মানুষের পদধুলি লাভে এদেশ সৌভাগ্যান্বিত হ'ল!

পণ্ডিতেরা বলেন অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বনে, পাহাড়ে, গুহাকন্দরে এক অত্যন্ত আদিম জাতির লোক বাস ক'রতো। তারা খুব সম্ভব সবেমাত্র পশু শ্রেণী থেকে মানুষের ধাপে উঠেছিল; তারা হিংস্র পশুর চেয়ে বড় বেশী উন্নত ছিল না; ধাতু আর আগুণের ব্যবহার জানতো না, পাথরের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পশু-পাখী শীকার ক'রে কাঁচা মাংস খেত। এই যুগকে "প্রাচীন প্রস্তর যুগ" বলা হয়।

এই যুগের শেষদিকে উত্তর-পূর্ব্ব গিরিপথ দিয়ে একদল লোক ভারতে আসে; এরা আগুণের ব্যবহার জানতো, মাটি চাষ করে ফসলও ফলাতো, কিন্তু ধাতুর ব্যবহার এদেরও জানা ছিল না। এরা খানিকটা সভ্য ছিল ব'লে এদের "নব্য প্রস্তর যুগের" অধিবাসী বলা হয়। এদের দুভাগে

ভাগ করা হয়—তিব্বতীয়-ব্রহ্ম আর কোলার্য্য। প্রথম শ্রেণীকে মঙ্গোলিও ব'লে মনে হয় ; নেপালী, ভুটিয়া এরা এদেরই বংশধর। কোলার্য্যদের বংশধররা এখনও বর্ত্তমান ; তারা কোল, ভীল, সাঁওতাল নামে পরিচিত।

এর পরে এলো "ব্রোঞ্জ যুগ"। এ যুগের লোকেরাও খুব সম্ভব বাইরে থেকে এসেছিলেন। এঁরা লোহার ব্যবহার না জানলেও অত্যন্ত সভ্য ছিলেন। দশ পনেরো বছর আগে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল বর্ত্তমান সভ্যতার জন্মভূমি বুঝিবা ব্যবীলন, চীন ও মিশর দেশ। কিন্তু কিছুদিন আগে সিন্ধু দেশের মোহেন্-জো-দড়ো ও কোলদেজাতে আর পঞ্জাবের হরপ্পা নামে জায়গায় ব্রোঞ্জ যুগের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভারতের এক অতি প্রাচীন সভ্য জাতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই ক' জায়গার পাতালপুরী ভারত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন ক'রেছে, জগতের চোখে ভারতকে অনেক উঁচুতে তুলে ধ'রেছে। ভারতের সভ্যতার অনেক চিহ্ন কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত মিশর, ক্রীট, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ থেকে ধার করা বলা হ'তো। কিন্তু আজ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অধমর্ণের পদ থেকে উত্তমর্ণের পদে উন্নীত হ'তে চলেছি। এর জন্য প্রশংসার দাবী ক'রতে পারেন একমাত্র আমাদেরই একজন বাঙালী, তাঁর নাম শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই এ দুটি জায়গা আবিষ্কার ক'রেছেন। এ দু' জায়গায় পাওয়া জিনিষ পত্র থেকে প্রমাণ হয় যে যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় পনের হাজার বছর* আগে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে মিশর, চীন, ব্যবীলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম সভ্যতার কোন তুলনাই হয় না। এ আমাদের কম গৌরবের কথা নয় ; কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্য্যামির অহঙ্কার ছাড়তে হবে, কারণ অনার্য্যরাই এই সভ্যতার জন্মদাতা।

* ষ্টেটস্‌ম্যান।

এর অনেক পরে পশ্চিম এসিয়া থেকে দ্রবিড় জাতি ভারতে আসে, এরা লোহার ব্যবহার জানতো, সেইজন্য এদের যুগকে বলা হয় "লৌহ যুগ"। দ্রবিড়রা প্রথমে উত্তর ভারতে বাস ক'রত, কিন্তু পরে আর্য্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এরা দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নেয়। এখন যারা তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে তারা এই দ্রবিড়দেরই বংশধর। দ্রবিড়দের কৃষিশিল্প, বাণিজ্য, রাজ্যশাসন সাহিত্য সবই উঁচু ধরণের ছিল। তারা সাপ, বুনো জন্তু এই সবের পূজা ক'রতো, সোণা রূপার গহণা প'রতে ভালবাসতো। এদের অনেক পরে আর্য্যরা ভারতে আসেন।

আর্য্যদের আদি নিবাস যে কোথায় ছিল তা আজও ঠিক প্রমাণ হয় নি। কেউ মধ্য এসিয়াকে, কেউ সাইবেরিয়াকে, কেউ উত্তরমেরুকে আর কেউ বা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীকে আর্য্যদের আদিম জন্মস্থান বলেন। যেখানেই তাঁদের বাসভূমি হোক না কেন, সভ্যতার প্রথম যুগে তাঁরা যে এক জায়গায় একত্রে বাস ক'রতেন, একই ভাষায় কথা ব'লতেন, তাঁদের ধর্ম্মও যে ছিল এক তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তারপরে কোন কারণে এঁরা দুদলে ভাগ হ'য়ে একদল পশ্চিমদিকে আর একদল পূর্ব্বদিকে চ'লে গেলেন। পশ্চিম শাখাটি ক্রমে য়ুরোপে এসে পৌছুলো; এঁদের থেকেই গ্রীক, রোমান, জার্ম্মাণ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি। পূর্ব্ব শাখাটিকে বলা হয় "ইন্দো-ঈরানীয়ান" শাখা। এঁরা ভারতে এসে পঞ্জাব প্রদেশে বসবাস সুরু করেন। কিছুদিন পরে নিজেদের মধ্যে কোন গোলমাল হওয়ায় এঁদেরই একটি শাখা আবার পশ্চিম দিকে গিয়ে পারস্যদেশে বসতি ক'রলেন। এঁরা "ঈরাণীয়ান" নামে খ্যাত। পরে পারস্যদেশে যখন মুসলমানরা অত্যাচার আরম্ভ ক'রল তখন অনেক ঈরাণী ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হ'লেন। এই নবাগত ঈরাণী শাখাই এখন "পার্শী" নামে পরিচিত। পঞ্জাবে যাঁরা র'য়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরই

বলা হয় "হিন্দু"। "হিন্দু" একটা ধর্ম্ম নয়, এ একটা জাতি। এই সব হিন্দুরাই এখনকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের আদি পুরুষ। আর্য্যগ্রন্থ "বেদ" পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাণো বই। বেদের তিন ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে) আর বেদাঙ্গ; যখন আর্য্যরা পঞ্চনদীর তীরে বাস ক'রতেন তখনই "ঋকসংহিতা" গ'ড়ে ওঠে। পরে অন্যান্য সংহিতা আর ব্রাহ্মণ রচিত হ'য়েছিল। এইবার আর্য্যরা দক্ষিণ আর পূর্ব্বদিকে আগিয়ে আসতে লাগলেন। তখন তাঁরা কুরু (দিল্লী প্রদেশ), পাঞ্চাল (দিল্লার উত্তরপূর্ব্বে গঙ্গার উপত্যকা ভূমি), মৎস্য (জয়পুর রাজ্য), কোশাম্বী (এলাহাবাদ জেলা), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার), বিদর্ভ (বেরার) ইত্যাদি রাজ্যের স্থাপনা করেন।

প্রাচীন আর্য্যরা পরিবারবদ্ধ অবস্থায় বাস ক'রতেন; কতকগুলো পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম হ'তো, কতকগুলো গ্রাম মিলে হ'তো এক একটা বংশ; একটি বা কতকগুলো বংশ সমষ্টির নেতার নাম ছিল রাজা। প্রাচীন আর্য্যরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বাতাস, আকাশ, সূর্য্য, আগুণ, জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ভগবান না মনে ক'রে, এদের ভগবানেরই লীলা মাত্র জ্ঞানে পূজা ক'রতেন। বৈদিক যুগের আর্য্যদের মধ্যে জাতিভেদ দেখা না দিলেও তার সূত্রপাত হ'য়েছিল এই সময়েই। পরে লোক সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ ক্রমে ক্রমে জটিল হ'য়ে উঠলো। একজন লোকের পক্ষে সমস্ত কাজ করা আর সম্ভবপর হ'ল না। সুতরাং শ্রমবিভাগের প্রয়োজন এলো। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে শ্রমবিভাগ থেকেই জাতিবিভাগ এসেছিল। যাঁরা পূজা-পার্ব্বন পঠন-পাঠন ক'রতেন তাঁদের নাম হ'ল "ব্রাহ্মণ", যাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ ক'রতে পারতেন, রাজ্যশাসন ক'রতে পারতেন তাঁরা হ'লেন "ক্ষত্রিয়", আর যাঁরা চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের

বলা হ'লো "বৈশ্য"। যাঁরা সেবাব্রতই বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে ক'রলেন তাঁরা হ'লেন "শূদ্র"। পরে অবশ্য অনার্য্য আর দাসদের শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা হ'ত। এখনকার মত তখন জাতিভেদ জন্মগত ছিল না, এত কঠোরও ছিল না; ব্রাহ্মণের ছেলে ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হ'লে ক্ষত্রিয় ব'লেই গণ্য হ'তেন। কখন যে এই শ্রেণী বিভাগ বৃত্তিগত থেকে জন্মগত হ'য়ে উঠল তা বলা শক্ত। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী ভাগে মনুসংহিতার সৃষ্টি কিন্তু তখনও জাতি বিভাগ এত কঠোর ছিল না। প্রথমে জাতির উচ্চনীচ সম্মান ছিল না; ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় দুজনাই সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক'রতেন; অনেক দিন ঝগড়া বিবাদের পর ব্রাহ্মণেরাই অবশেষে সমাজে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে সমর্থ হ'লেন।

—পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের ভারতবর্ষ—

আমরা আগেই দেখেছি ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে সমাজে অপ্রতিহত হ'য়ে উঠলেন এবং তাঁদের ক্ষমতার আধিক্য অনেক সময়ই অত্যাচার আর অনাচারে পরিণত হ'য়ে উঠলো। সমাজের মধ্যে একদল লোক বরাবরই এই নতুন সামাজিক ও ধর্ম্ম ব্যবস্থার প্রতিবাদ ক'রে এসেছিলেন। এই সময় রক্ষণশীল আর প্রগতিবাদীদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং নতুন ধর্ম্ম সম্প্রদায় একের পরে একে জন্মাতে থাকে; এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দুটি খুব প্রসিদ্ধিলাভ করে একটি বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর একটি জৈন ধর্ম্ম।

নেপালের তরাইএর কাছে কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোধন নামে এক রাজা ছিলেন, সিদ্ধার্থ ছিলেন তাঁর একমাত্র ছেলে; ইনি সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হ'য়েও সংসারের ওপর উদাসীন হ'য়ে উঠছিলেন। পাছে ছেলে সন্ন্যাসী

হ'য়ে যায় তাই শুদ্ধোধন তাড়াতাড়ি গোপা নামে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে দেন, কিছুদিন পরে সিদ্ধার্থের একটি ছেলে হয়; কিন্তু যাঁর মন নিয়েছে পথ তাঁকে কি আর সুখ-ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র সংসারে বাঁধতে পারে? তাই তিনি একদিন মানুষের চিরন্তনী দুঃখ কষ্ট দূর ক'রবার জন্য সংসার ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। ছ' বছর ধ'রে অনেক জায়গা ঘুরে অনেক কিছুই শিখলেন কিন্তু মনের শান্তি কিছুতেই পেলেন না! তখন তিনি হতাশ হ'য়ে গয়ায় বোধিদ্রুম নামে এক বটগাছের তলায় ব'সে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। সহসা তাঁর চোখের সামনে জ্ঞানের দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো, তিনি দুঃখময় জীবনের সমাধান খুঁজে পেলেন! তখন থেকেই তিনি 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে পরিচিত। এই সময় থেকে ৪৫ বছর তিনি তাঁর নব লব্ধ জ্ঞান প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। ৮০ বছর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৪৮৭ সালে) তিনি কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন। উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সঙ্গে এর প্রভেদ ছিল অনেক; বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানেন না এবং বেদোক্ত যাগযজ্ঞে মুক্তিলাভ বা নির্ব্বাণ হয় না মনে করেন। বুদ্ধদেব ব'লতেন মানুষ নিজের কায দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে, এর ওপর দেবদেবীর কোনই হাত নেই, এজন্মে যদি কেউ ভাল কাজ করে তা হ'লে সে পরজন্মে উন্নততর জীবন লাভ ক'রবে; ক্রমাগত ভাল কাজ ক'রে গেলে তার মুক্তিলাভ হবেই হবে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই ধর্ম্মের মূল নীতি।

বর্দ্ধমান মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক; তিনিও রাজপুত্র ছিলেন ও নিখিল মানবের মুক্তি কামনায় রাজ্য, স্ত্রীকন্যা ত্যাগ ক'রে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। অনেক সাধনার পর তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন ও "জিন" নামে পরিচিত হন। জৈনরা এরই মতাবলম্বী। জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই মত তবে জৈনেরা সব বিষয়েই চরমপন্থী। বৌদ্ধ

সন্ধানী :—

হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন: ভুবনেশ্বরের মন্দির

লক্ষাশী :—
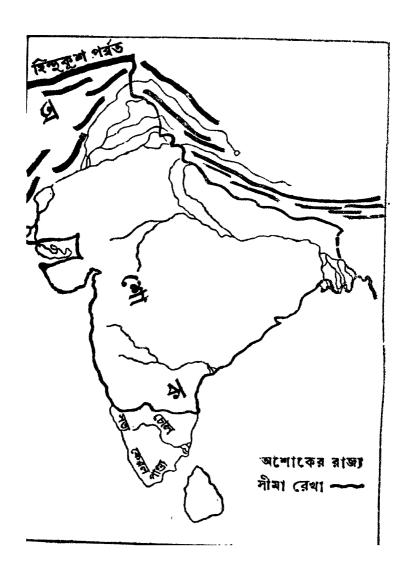
ধর্ম্ম ভারতের সীমা ত্যাগ ক'রে সারা এসিয়া এমন কি ইয়ুরোপ ও আফ্রিকায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো, কিন্তু জৈন ধর্ম্মের গণ্ডী চিরকালই ভারতের মধ্যে আটকে থাকে।

শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্ম বলে গণ্য হ'লো। অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন এঁরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন। এইচ, জী, ওয়েল্‌সের মতে অশোক সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। সারনাথে বুদ্ধ প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন; তারই স্মরণার্থে পরবর্ত্তী যুগে অশোক এখানে একটি চৈত্যবিহার ও মৃগদাব প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট্ অশোক পৃথিবীতে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন; তাঁর রাজত্ব কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হিন্দু সভ্যতার একাভিমুখী ধারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাবে অনেক বদলে গিয়েছিল। প্রায় পাঁচশো বছর ধ'রে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হ'য়ে রইলো রাজকীয় ধর্ম্ম, তখন এই ধর্ম্মের গৌরব ও মহিমা চরমোৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল। তারপর গুপ্ত সম্রাটরা যখন ভারতে একাধিপত্য স্থাপন ক'রলেন তখন থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে সুরু ক'রল। এই নতুন ক'রে গড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভেদ ছিল কিন্তু অনেক। বৈদিক যুগে যে সব দেবতারা পূজা পেতেন তাঁরা ক্রমশঃই আসনচ্যুত হ'য়ে প'ড়লেন, তাঁদের স্থান অধিকার ক'রলেন নতুন নতুন দেবতারা; একমাত্র সূর্য্যদেবই নিজের সম্মান কোন গতিকে কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ক্রমে ক্রমে প্রধানতম দেবতা হয়ে উঠলেন; পরে ব্রহ্মাও অপ্রচলিত হ'য়ে গেলেন; তারপর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সমেত শিব ও বিষ্ণু এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরাই শুধু স্থায়ী আসন পেতে ব'সলেন। বৈদিক যুগে মূর্ত্তি পূজা ছিল না ব'ললেই হয় কিন্তু এই পরবর্ত্তী যুগে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন হ'ল খুব ব্যাপক ভাবে, তাই তখন সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আর মন্দির গড়া হতে লাগলো,

এখনো তার অনেক চিহ্নই বর্ত্তমান। পণ্ডিতরা বলেন যে মূর্ত্তি পূজা নাকি বৌদ্ধদের কাছ থেকে হিন্দুরা নিয়েছেন। আগে বেদই ছিল একমাত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ কিন্তু পরে বেদের স্থান অধিকার ক'রল মনুসংহিতা আর পুরাণ। মনুসংহিতাকে হিন্দুরা এখনো দৈনিক জীবনের কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশক ব'লে মনে করেন। মনুসংহিতা খুব সম্ভব খৃষ্টের জন্মের দেড়হাজার বছর আগে রচিত হ'য়েছিল কিন্তু খৃষ্ট জন্মের দ্বিতীয় শতক' আগে একে আবার নতুন ক'রে লেখা হয়। পৌরাণিক যুগের ধর্ম্ম গ্রন্থদের মধ্যে রামায়ণ আর মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণ মহাভারতের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই বই দু'খানার আদর্শ চরিত্রগুলো যুগ যুগ ধ'রে হিন্দুদের অনুপ্রেরিত ক'রে আসছে। রামায়ণ মহাভারতের ছোট ছোট উপাখ্যানগুলো অবলম্বন ক'রে ছোট বড় কত যে সংস্কৃত আর দেশীয় ভাষায় কাব্য নাটক ইত্যাদি রচনা হ'য়েছে তার আর ইয়ত্ত্বা নেই।

তখনকার সমাজ ছিল অত্যন্ত উদার, ভিন্নধর্ম্মালম্বী ও বিদেশীয়দের সমাজে গ্রহণ ক'রতে কারোর কোন আপত্তি ছিল না। শক, হুন, গ্রীক ইত্যাদি বিদেশীয় জাতিরা বেমালুমভাবে হিন্দু সমাজে মিশে গিয়েছিল ; পরমবিরোধী বৌদ্ধধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে প্রায় একাঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব পর্যন্ত পরে বিষ্ণুর অবতার ব'লে গণ্য হ'য়েছিলেন ; এই থেকেই বোঝা যায় তখনকার হিন্দুধর্ম্ম কত উদার ছিল, এখনো হিন্দুদের অনেক ক্রিয়া কলাপে বৌদ্ধদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই উদারতাই হিন্দুধর্ম্মকে এত মহান ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এই উদারতা বেশী দিন রইলো না ; ক্রমে ক্রমে সমাজে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ ক'রল, জাতিভেদ কঠোরতা রূপ নিল, নীচ জাতিদের ওপর ঘৃণা আর অবজ্ঞা প্রকট হ'য়ে উঠলো, তাদের পশুরও অধম মনে করা হতে লাগলো। এই সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আর সঙ্কীর্ণতাই যে হিন্দু ক্ষমতা পতনের একমাত্র কারণ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তখনও স্ত্রী স্বাধীনতা

ছিল ; স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা প্রচলিত হয় পরবর্ত্তী যুগে মুসলমানদের অত্যাচারের জন্য।

পৌরাণিকযুগে পুরাণ, স্মৃতি, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস ও নানারকম বিজ্ঞান-সম্মত বইতে সংস্কৃত ভাষা ক্রমে ক্রমেই সমৃদ্ধশালী হ'য়ে উঠতে লাগলো। সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকবি বাল্মীকি, পরের যুগের মহাকবি কালিদাস আর ভবভূতির কথা কে না জানে, এঁদের কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাট্যকার ভাস আর কবি অশ্বঘোষ কালিদাসের আগেকার যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। সে যুগের রাজারা ছিলেন পরম বিদ্যোৎসাহী ; এঁদের মধ্যে এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী স্মরণীয় বিক্রমাদিত্য। ইনিই ছিলেন মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক বিজেতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। এঁর সভা বারো জন বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানী লোক অলঙ্কৃত ক'রতেন, এঁদের নাম ছিল নবরত্ন। কালিদাস, বররুচী, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বরাহমিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ আর ধন্বন্তরী এঁরাই ছিলেন নবরত্ন। অবশ্য অনেক পণ্ডিত বলেন যে নবরত্নের সব রত্নের একই সময়ে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর নয়। কালিদাসের পরের যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীহর্ষ, ভারবী, নাগানন্দ, মাঘ, দণ্ডী, সুবন্ধ আর বানভট্ট চিরদিন অমর হ'য়ে রইবেন। দর্শনশাস্ত্রে ভারতীয়দের দান অসাম। কপিল, কণাদ, গোতম, ব্যাস, পাতঞ্জল, জৈমিনী, শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ও রামানুজম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব'লে গণ্য হ'তে পারেন। অর্থনীতি ও রাজনীতির আলোচনাও তখন কিছু কম হয়নি ; চাণক্যের "কৌটিল্য শাস্ত্র" তার জ্বলন্ত প্রমাণ, রাজনীতি সম্বন্ধে এর চেয়ে ভাল বই কোন ভাষায় আজ অবধি লেখা হয় নি। একমাত্র প্রামাণিক ঐতিহাসিক বইএর সংখ্যা ছিল বড় কম। কয়েকজন লেখক দু একজন বড় বড় রাজাদের চরিতোপাখ্যান লিখে গেছেন মাত্র ; এদের ব্যতিক্রম কেবল কহ্লণ পণ্ডিতের কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী'।

রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, এসবের আলোচনাও তখন ভারতে হ'তো খুবই ব্যাপক ভাবে। সংখ্যাগণিত ও দশমিক ভগ্নাংশের উৎপত্তি ভারতবর্ষেই। জ্যামিতি এবং বীজগণিতেরও জন্মস্থান ভারত; লীলাবতী ও শ্রীধরাচার্য্য অসাধারণ বীজগণিতজ্ঞ ছিলেন। যজুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গে জ্যামিতির অনেক প্রতীজ্ঞার প্রয়োগ যজ্ঞভূমি ও বেদী নির্ম্মাণের নির্দ্দেশে দেখা যায়। আর্য্যভট প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী গোল ও সূর্য্যের চারধারে ঘোরে। নিউটনের পাঁচশো বছর আগে ভাস্করাচার্য্য তাঁর গোলাধ্যায় বইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ভারতীয়রা অভূতপর উন্নতি লাভ ক'রেছিলেন; অস্ত্র চিকিৎসা বা শল্য চিকিৎসাতেও তাঁদের পারদর্শীতা ছিল অসীম। চরক আর সুশ্রুত এ বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সে যুগে ভারতে রসায়নচর্চ্চাও যথেষ্ঠ হ'তো; নাগার্জ্জুন নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর রসায়নাগারের ধ্বংসাবশেষ নাগপুর সহরের কাছাকাছি এক পাহাড়ের ওপর এখনো দেখা যায়।

এই যুগে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল খুব সুষ্ঠু আর ব্যাপক। দেশের নানা জায়গায় পাঠশালা, বিদ্যালয় ছিল; উচ্চশিক্ষার জন্য মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সবেরও অভাব ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় রাজাই বহন ক'রতেন তবে সাধারণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই যুগের তক্ষশীলা, নালান্দা প্রভৃতি জায়গার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগদ্বিখ্যাত; পাটনার কাছে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ হাজার ছাত্রের পঠন-পাঠনের, খাবার ও থাকবার চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল। সারা এসিয়ার ছাত্র এখানে প'ড়তে আসত। এক সময়ে এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বাঙালী শীলভদ্র। এই সময়ে চীন পর্য্যটক হিএন্ সাঙ্ ভারতীয় উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার্থে নালান্দায় আসেন। তিনি এখানে ছাত্র ছিলেন তিন বৎসর; তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেছেন। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর নামে আর একজন বাঙালী এখানে পরে অধ্যক্ষ হন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারে আহুত হ'য়ে তিব্বত যান। পরবর্ত্তী যুগে নবদ্বীপ হয়ে উঠেছিল বাঙলার অক্সফোর্ড।

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয়রা বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁরা স্থলপথে পশ্চিমদিকে এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ সব জায়গাতেই বাণিজ্য চালাতেন ; রোমে ভারতীয় বিলাস দ্রব্যের আদর ছিল অত্যধিক। পূর্ব্বদিকে তাঁরা জলপথে আনাম, কাম্বোজ, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্ম, শ্যাম, মলয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রতেন এবং সেই ব্যপদেশে সেই সব জায়গায় ধীরে ধীরে তাঁদের উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। সেই যুগে ভারতীয় সভ্যতার যে কি প্রসার লাভ ঘটেছিল তা যবদ্বীপের "বরবদুর", কাম্বোজের "অঙ্কোরভট" প্রভৃতি বিশাল কারুকার্য্যখচিত মন্দিরগুলো দেখলে বেশ বোঝা যায়। বাঙলার রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয় সিংহ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে জলপথে লঙ্কাদ্বীপে গিয়েছিলেন, ও সেই দেশ জয় ক'রে সেখানে রাজ্য স্থাপনা ক'রেছিলেন, তারই স্মারকে লঙ্কা আজ সিংহল।

একে স্বাভাবিক সম্পদ তার ওপর বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত বিপুল ধনদৌলত, এই সবে ভারতবর্ষ অলৌকিক ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে উঠেছিল। এককালে ভারতের ধনসম্পত্তি বিদেশে উপকথার সামিল ছিল। শিল্প ও স্থাপত্যে এদেশ কোনকালেই পশ্চাদ্পদ ছিল না। সম্রাট অশোকের উৎসাহে ভারতের শিল্পকলা চরম উৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল। এখনো অশোক-স্তম্ভগুলি জগতের বিস্ময়োৎপাদক। সাঁচীর স্তূপ অশোকের সময়কার স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর কনিষ্ক পেশোয়ারে যে স্তূপ তৈরী ক'রেছিলেন তা সে যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গুপ্ত রাজাদের সময় শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। সে সময় সুন্দর সুন্দর মন্দিরে সারা দেশ ভরে যায়।

তখনকার খোদাই বুদ্ধ মূর্ত্তির সঙ্গে কোন দেশের কোন যুগের খোদাই মূর্ত্তির তুলনা হয় না। নিজাম রাজ্যের অজন্তা গুহা আজকাল পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের তীর্থস্থান স্বরূপ। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণদেব রাও এক সমগ্র পাহাড় খোদাই ক'রে এলোরার মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন, এর জোড়া আর পৃথিবীতে মেলে না। রাজপুতানার আবু পাহাড়ের শ্বেতপাথরের জৈন মন্দির শিল্প জগতে অতুলনীয়। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বিদেশীয়দের আক্রমণ থেকে এই সমস্ত স্থাপত্যের অলৌকিক সৌন্দর্য্য নিজেদের রক্ষা ক'রতে পারে নি। ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্বর্ণযুগের শিল্পের নিদর্শন প্রায়ই একে একে ধ্বংশ হয়ে গেছে, শুধু যে কয়টি আত্মগোপন ক'রে অক্ষত ছিল তাদেরই দেখে আজ আমাদের মাথা বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অবনমিত হ'য়ে যায়।

—* পৃথিবীর ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান ঘটনা *—

(ভারতবর্ষের ওপর জোর দেওয়া হ'য়েছে)

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫,০০০—কোলদেজাতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ।
" ১৪,০০০—মোহেন্-জো-দড়োর সভ্যতা।
" ১২,০০০—হরপ্পায় এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়।
" ৩,০০০—ঋক্‌বেদ রচনার সুরু হয়।
" ১,২৭৩—আসীরীয়ন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।
" ১,০০০—হোমার প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
" ৮০০—উপনিষদ রচনা সুরু হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৫৩—রোমের প্রতিষ্ঠা হয়।
" ৭৫৩—ইথোপিয়ানরা মিশর জয় করে।
" ৬৪৪—মিশর স্বাধীন হয়।
" ৬০৫—পারস্যে জরথস্থ্রুর আবির্ভাব।
" ৬০০—শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা।
" ৫৫০—বুদ্ধদেবের জন্ম।
" ৫৫১—দারায়ুসের পঞ্জাব জয়।
" ৫৩৩—বুদ্ধের বৌদ্ধত্ব লাভ।
" ৪৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ।
" ৪৭৭—বুদ্ধদেবের মৃত্যু।
" ৩০০—গথেদের রোম ধ্বংশ।
" ৩২৭—আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ।
" ৩২৩—আলেকজান্দারের মৃত্যু।
" ৩২২—মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা।
" ২৭২—অশোকের সাম্রাজ্য লাভ।
২৩১—অশোকের মৃত্যু।
" ২১৪—চীনের মহাপ্রাচীরের স্থাপনা।
" ১৫৬—চীনদেশে কাগজ তৈয়ারী সুরু।
" ১০২—জুলিয়াস সীজারের জন্ম।
" ৫৫—সীজারের ইংল্যাণ্ড জয়।
" ২৭—রোম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।
" ৪—যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।
খৃষ্টাব্দ ৩০—যিশুখৃষ্টকে ক্রুস বিদ্ধ করা হয়।
" ৬৪—নীরো রোমে আগুন লাগান।
" ১১০—কণিষ্ক সম্রাট হন।

খৃষ্টাব্দ ২৪৭—গথেরা ইয়ুরোপ আক্রমণ করে।

" ৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত বা ভারতের নেপোলিয়েনের মৃত্যু হয়।

" ৩৭৫—হুনেদের বিশ্ববিজয়।

" ৪৭৭—স্যাক্সনদের বৃটেন আক্রমণ।

" ৫৩০—বিক্রমাদিত্য সম্রাট হন।

" ৫৬৯—মহম্মদের জন্ম।

" ৬০৬—হর্ষবর্দ্ধন সম্রাট হন।

" ৬২৯—চৈনীক পরিব্রাজক হিএন্ সাঙ্ ভারতে আসেন।

" ৬৩২—মহম্মদের মৃত্যু হয়।

" ৭১১—মুসলমানরা স্পেন আক্রমণ করে।

" ৭১২—মুসলমানরা সিন্ধু আক্রমণ করে এবং সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে।

" ১০০১—ভারতে মুসলমান আক্রমণ।

" ১০১৬—ক্যানিয়ুট ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে ও দেনমার্কের রাজা হন।

" ১০২৪—সুলতান মামুদ সোমনাথ ধ্বংস করে।

" ১০৬৬—নর্ম্মাণরা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

" ১১৯৯—ঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাজিত ও হত্যা করে।

" ১২০৬—ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা।

" ১২১৫—ম্যাগ্নাচার্টা স্বাক্ষরিত হয়।

" ১৪৬৯—গুরু নানকের জন্ম।

" ১৪৯২—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।

" ১৪৯৮—ভাস্কো-ডি-গামার ভারতে আসার জলপথ অবিষ্কার।

" ১৫২৬—বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

" ১৫৫৬—আকবর ভারত সম্রাট হন।

" ১৫৫৮—ইংরাজের দ্বারা স্প্যানিস আর্ম্মাডার ধ্বংশ।

খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪—সেক্সপীয়ারের জন্ম।
,, ১৫৬৫—আকবর জিজিয়া কর তুলে দেন।
,, ১৫৭৬—হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপ পরাজিত হন।
,, ১৬০০—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।
,, ১৬০৬—আকবরের মৃত্যু।
,, ১৬২২—ইংরাজরা ভারতের বাণিজ্যের অনুমতি পায়।
,, ১৬৫৮—ঔরংজেব সম্রাট হন।
,, ১৬৯০—জবচার্নক কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করেন।
,, ১৬৯৪—ব্যাঙ্ক অব ইংল্যণ্ডের প্রতিষ্ঠা।
,, ১৭০৭—ঔরংজেবের মৃত্যু ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়।
,, ১৭৩৯—নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ।
,, ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ।
,, ১৭৭৬—আমেরিকা স্বাধীন হয়।
,, ১৭৮০—ভারতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।
,, ১৭৯২—ফ্রান্সে বিপ্লব ও সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
,, ১৮০৪—নেপোলিয়ন সম্রাট হন।
,, ১৮০৫—ট্রাফাল্গারের যুদ্ধে নেলসনের মৃত্যু।
,, ১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।
,, ১৮৩৭—সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তি।
,, ১৮৫৭—ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ হয়।
,, ১৮৬৫—আমেরিকায় দাসত্ব প্রথার লোপ।
,, ১৮৬৯—সুয়েজ খালের প্রথম ব্যবহার সুরু হয়।
,, ১৮৮৫—ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
,, ১৯০১—সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু।
,, ১৯০৩—দিল্লীর দরবার।

খৃষ্টাব্দ ১৯১২—চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়।

" ১৯১৪—মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

" ১৯১৭—রাশিয়ায় বলশেভিক শাসন স্থাপিত হয়।

" ১৯২১—ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত।

" ১৯৩১—বিহারের ভীষণ ভূমিকম্প।

" ১৯৩৬—ইংল্যণ্ডেশ্বর ৫ম জর্জ্জের মৃত্যু হয় ও ৮ম এডোয়ার্ড সিংহাসন লাভকরেন কিন্তু পরে পারিবারিক কারণে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন ও ৬ষ্ঠ জর্জ্জ সম্রাট হন।

" ১৯৩৭—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মারা যান। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও জাপানের চীন বিজয় আরম্ভ হয়। ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে।

" ১৯৩৮—জার্ম্মাণী বিনা যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও খানিকটা চেকো-শ্লোভাকিয়া দখল করে। কথা-শিল্পীসম্রাট শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

—*গত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*—

(১৯১৪-১৮)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইয়ুরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে এমন রেষারেষি আর মন কষাকষি চলছিল যে যুদ্ধ যে কোন দিন বেঁধে উঠতে পারতো। উঠলোও তাই। ইংরাজ আর ফরাসীরা সারা জগতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভ ক'রেছে ব'লে জার্ম্মাণীর বরাবরই অত্যন্ত হিংসে ছিল, তার উপর ইয়ূরোপে অনেক দেশে গণতন্ত্র দেখা দেবার উপক্রম ক'রছিল তাই রাজতন্ত্রবাদী জার্ম্মাণী এই সব শিশু প্রতিষ্ঠানদের গলা

টিপে মেরে নিজের রাজত্ব কায়েমী ক'রতে চেয়েছিল। অত্যন্ত সামান্য কারণেই যুদ্ধ বেঁধে উঠলো। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে একজন লোক নিজের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ অষ্ট্রিয়ার যুবরাজকে সার্ব্বিয়াতে খুন করে। এতে অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়ার উপর হুমকী দিয়ে কতকগুলো অন্যায় দাবী দাওয়া করে। সার্ব্বিয়া অষ্ট্রিয়ার তুলনায় ছোট আর দুর্ব্বল হ'লেও আত্মসম্মানের জন্য এসব দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তাতেই অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়ার বিরুদ্ধে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসে। রাশিয়া ছিল সার্ব্বিয়ার বন্ধু তাই সে বন্ধুকে রক্ষা করতে যুদ্ধে নাবে। ইতিমধ্যে জর্ম্মাণী আর ফ্রান্সের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাঁধে এবং জার্ম্মাণী বেলজিয়াম অধিকার ক'রে প্রকাশ্যে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। ফলে ১৯১৬ সালের ৩রা আগষ্ট ফরাসী আর তার বন্ধু ইংরাজ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আস্তে আস্তে রুমানিয়া, জাপান, গ্রীস, মণ্টেনিগ্র ও অবশেষে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। তুরস্ক আর বুলগেরিয়া জার্ম্মাণের পক্ষ নেয়। জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার ২য় উইলহেল্ম্ ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত ফন্ হিন্ডেনবুর্গ্ প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। পূর্ব্ব ফরাসী, পোলাণ্ড, ট্রান্সসিলভিয়ান, বল্কান আর উত্তর ইটালীর ভূমিতে যুদ্ধ হ'য়েছিল। প্রথম দিকে জার্ম্মাণরা সমস্ত জাতিদের পিছু হঠিয়ে দিচ্ছিল; তাদের বিক্রম ছিল অপ্রতিহত, বিজ্ঞানের সাহায্য ছিল অফুরন্ত। কিন্তু অবশেষে তাদের রসদ ফুরিয়ে আসতে লাগলো তাই তারা দমে যেতে সুরু ক'রলো; মিত্রপক্ষরা আমেরিকার যোগদানে খুব বলশালী হ'য়ে এই সুযোগের অপব্যবহার ক'রলো না। জার্ম্মাণী পর পর অনেকগুলো যুদ্ধতে একেবারে হেরে গিয়ে অবশেষে কতকগুলো অত্যন্ত অন্যায় দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর সন্ধি ক'রতে বাধ্য হল। কাইজার দেশে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'লেন ও জার্ম্মাণীতে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হ'লো। এত বড় যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনো হয় নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এর কাছে ম্লান হয়। এ যুদ্ধে

সবশুদ্ধ ৭৪,৫০,২০০ লোকের মৃত্যু হ'য়েছে, আহত যে কত হ'য়েছে তার সংখ্যা নেই। ফরাসী জনসংখ্যার প্রতি ২৮ জনে একজন, জার্ম্মাণীর প্রতি ৩৫ জনের মধ্যে একজন আর ইংল্যণ্ডের প্রতি ৬৫ জনে একজন নিহত হ'য়েছিল। খরচ হ'য়েছিল সর্ব্বসাকুল্যে ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা। সবশুদ্ধ সাতাশটা জাতি এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রের সমূহ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। অনেক দেশে রাজতন্ত্রের ধ্বংস হ'য়ে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। রাশিয়ার জারের পতন হ'লো, চীনে সাধারণ তন্ত্রের স্বষ্টি হ'লো। মহাযুদ্ধে ইয়ুরোপে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া, পোল্যাণ্ড আর চেকো-শ্লোভাকিয়া নামে ছটি রাজ্য নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণীকে তার খনিজ সম্পত্তিতে পূর্ণ ইয়ুরোপে নিজের দেশের অংশ ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলো ছেড়ে দিতে হয়। জার্ম্মাণী এই যুদ্ধের ফলে যে রকম দমে গিয়েছিল তাতে মনে হ'য়েছিল আর কখনই এ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই যুদ্ধের অবশ্য উপকারীতা যে ছিল না তা নয়। বিজ্ঞানের তুদিনে এত বেশী উন্নতি কখনই হয় নি বোধ হয় হবেও না। এই সময় অজস্র নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এর জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রে জার্ম্মাণরাই দায়ী। এরোপ্লেন, বেতার, মেসিন গান, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, এই সমস্ত এই যুদ্ধের অবদান। এই যুদ্ধের ফলে যে শ্রমিক আর গণ-আন্দোলনের স্বষ্টি হয়েছে তার ও দাম কম নয়।

—※ ইতিহাসের খুচরো খবর ※—

কনিষ্কের রাজত্বকাল থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়।

প্রাচীন ভারতে বৈশালী, কপিলাবস্তু ও কুশীনগরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চীন পর্য্যটক ফা হিএন ভারতে আসেন মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে আর হিএন সাঙ্ আসেন হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সময়।

বল্লালসেন বাঙলায় কৌলিন্য প্রথার প্রচার করেন।

লক্ষ্মণসেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা।

হজ্জাজ ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণকারী।

অহল্যাবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদবিবি ও রাজিয়া স্বহস্তে রাজ্য পরিচালনা ক'রতেন।

রাজিয়া ছাড়া অন্য কোন মহিলা দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নি।

মহম্মদ তুগলক তামার নোট প্রচার ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন।

মাহ্মুদ শাহ প্রথম আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ শেষ ভারতের মুসলমান সম্রাট।

ওলন্দাজ বণিকেরা ১৫৯৪ সালে, ইংরাজেরা ১৬০০ সালে আর ফরাসীরা ১৬০৪ সালে প্রথম ভারতে আসেন।

প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে ভারতে প্রথম কামানের ব্যবহার হয়।

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান গোলাপ ফুলের আতর তৈরী করার প্রণালী আবিষ্কার করেন।

সম্রাট শাজাহান ময়ুর সিংহাসন ও তাজমহল তৈরী করান। ময়ুর সিংহাসন তৈরী করেন শিল্পী ব্যবদলখাঁ, এতে পনের হাজার মুক্তা আর ত্রিশ হাজার মণিমাণিক্য বসান আছে। নাদীর শাহ্ দিল্লী লুণ্ঠন করে

এই সিংহাসনটি পারশ্যে নিয়ে যান। এখন এটা তেহ্‌রাণের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাজমহলের পরিকল্পনা কনষ্ট্যান্টিনোপলের শিল্পী ঈশা খাঁর।

মোগল যুগে আকবরের সময় বাঙলাদেশ বারোজন শাসন কর্ত্তার অধীনে ছিল। এঁদের বলা হতো বারভূঁয়া। এঁরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব মানলেও মাঝে মাঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ব'সতেন। এঁদের নাম—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, বিষ্ণুপুরের হাম্বীর মল্ল, তাহির-পুরের কংশনারায়ণ, পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর, চাঁদ প্রতাপের চাঁদগাজী, দিনাজপুরের গণেশ রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি আর খিজিরপুরের ঈশা খাঁ।

মোগল সম্রাট আকবর আর ইংল্যণ্ডেরশ্বরী এলিজাবেথ সমসাময়িক ছিলেন।

শিবাজীর পতাকার নাম ছিল ভাগেয়াজিন্দ।

বাঙলাদেশের শেষ স্বাধীন রাজা সিরাজদ্দৌল্লা।

ইংরাজ ভারতবর্ষে প্রথম মাদ্রাজে কুঠি বাঁধে (১৩১৬)।

ইংরাজরাজ ভারতে শাসন ভার গ্রহণ করেন ১৭৫৮ সালে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনালের।

লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতে প্রথম রেল চলে।

কোহীনুর হীরাটা নাকি ছিল শ্রীকৃষ্ণের, অনেক হাতবদলের পরে এটা আসে গোয়ালীয়রে। গোয়ালীয়রের মহারাণী এটা হুমায়ুনকে উপহার দেন; তার পর এই হীরা ক্রমান্বয় নাদীরশাহ্‌ ও রঞ্জিৎ সিংহের সম্পত্তি হয়। ১৮৯৬ সালে পঞ্জাব জয়ের পর এই হীরা ইংরাজেরা হস্তগত করে ও ইংল্যণ্ডে পাঠায়। সেখানে হীরাটা কয়েক টুকরো ক'রে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজমুকুট ও রাজদণ্ডে বসান হয়।

—বিদেশ—

আদিম কাল থেকে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে বলা হয় পুরাযুগ; তারপর থেকে ষোলশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মধ্যযুগ ও ষোলশ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আধুনিক যুগ।

মুরেরা (মুসলমান) স্পেন জয় ক'রে সেখানে পাঁচশো বছরের বেশী রাজত্ব করে।

মিশরের রাজবংশে ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল।

জাপানের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরোণো। এই বংশের প্রথম রাজা জিম্মু খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ সালে সিংহাসন লাভ করেন। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বংশ ধারাবাহিক ভাবে চ'লে আসছে। এখনকার সম্রাট এই বংশের ১২২তম উত্তরাধিকারী।

এগবার্ট ছিলেন সমগ্র ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজা।

জার্ম্মাণীর রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ ইংল্যাণ্ডের অধীশ্বর হ'য়েছিলেন।

"রেণেসাঁ" হ'চ্ছে ১৫শ আর ১৬শ শতাব্দীতে ইয়ুরোপের সুকুমার বিদ্যার পুনরুত্থান, ঠিক এর আগের যুগকে বলা হ'তো "ডার্ক-এজ"; ইয়ুরোপের ১৬শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের নাম "রিফর্ম্মেশন"।

ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বার বার ছ'বার বিয়ে করেন।

নেদারল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্‌স সমগ্র জাতিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছিলেন আর সমগ্র জাতি ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসকে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছিল।

ইংল্যাণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্বকালকে বলা হয় "স্বর্ণ যুগ"। এই যুগের ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনী ও সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। এই সময় স্প্যানীশ আর্ম্মাডা ইংল্যাণ্ডের হাতে বিনষ্ট হয়। গিলবার্ট, লর্ড ব্যালে, ওয়াল্টার র‍্যালে, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মণীষিরা এই যুগেরই লোক।

প্রথম উপনিবেশকারীদের দল আমেরিকায় পদার্পন করে ১৬২০ সালে।

ফরাসী মেষপালিকা বালিকা জোয়ান অব আর্কের নেতৃত্বে ফরাসীরা ইংরাজদের সমূলে পরাজিত করে। এঁকে কিন্তু পরে ডাইনী ব'লে পুড়িয়ে মারা হয়।

ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে দাসত্ব প্রথা উঠে যায় ১৮৩৪ সালে, আমেরিকা থেকে ওঠে ১৮৬৫ সালে।

আলেকজান্দার দি গ্রেট, জুলিয়াস সীজার আর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন কখনো কোন যুদ্ধে প্রতিহত হন নি।

ফরাসী দেশের নেপোলিয়ান বোনাপার্টি আর রাশিয়ার প্রথম আলেকজান্দার সারা পৃথিবীটা জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদের টিপু সুলতান নেপোলিয়ানকে ভারতে আমন্ত্রণ ক'রে পত্রবিনিময় ক'রতেন। নেপোলিয়ানকে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছিল সেণ্টহেলেনা দ্বীপে আর তাঁর জন্ম কর্সিকাতে।

সাম্রাজ্ঞীর স্বামী হয়েও প্রিন্স এলবার্ট সম্রাট ছিলেন না, ইনি ছিলেন শুধু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী।

১৯১৭ সালের ১২ই মার্চ্চ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সুরু হয়, ফরাসী বিপ্লব হয় ১৭৮৯ সালে।

ভূতপূর্ব্ব ইংল্যাণ্ডেশ্বর অষ্টম এডোয়ার্ডের বর্ত্তমান পদবী "ডিউক অব্ উইণ্ডসর"।

সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব

—❋ বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাস ❋—

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাঙ্‌লা ভাষা"—

আমরা বাঙালী, বাঙ্‌লা আমাদের মাতৃভাষা, তাই এ আমাদের বড় আদরের জিনিষ। আমাদের মাতৃভাষা যে বাঙ্‌লা এজন্য আমরা গর্ব্ব ক'রতে পারি। ভারতের মধ্যে আমাদের ভাষাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের সাহিত্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান নি, রবীন্দ্রনাথ জন্মান নি, শরৎচন্দ্র জন্মান নি। প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাঙ্‌লা ভাষা বলে। বাঙ্‌লা দেশ ছাড়াও আসামের শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ার, বিহারের পূর্ণিয়া, মালভূম, সাঁওতাল পরগণার লোকেরাও বাঙ্‌লা ভাষাতেই কথা বলে। বাঙ্‌লা পৃথিবীর আটটা প্রধান ভাষার মধ্যে একটা ভাষা বলে গণ্য করা হয়। হিন্দুস্থানীর প্রসার বেশী হ'লেও হিন্দুস্থানী যারা ঘরে মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে তাদের সংখ্যা বঙ্গভাষীদের চেয়ে কম।

ভারতে অতি প্রাচীনকালে অনার্য্য জাতি বাস ক'রতো এ খবর তোমরা আগেই পেয়েছো। পরে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বাইরের আর্য্য জাতীরা ভারতে আসেন। এই আর্য্যদের আদিম ভাষা ভারতে এসে কি রূপ ধ'রলো তার পরিচয় পাওয়া যায় বেদে। এই ভাষাকে বলে বৈদিক সংস্কৃত। আদিম আর্য্যজাতীদের ভাষা তাঁদের অন্যান্য শাখারা ইয়ুরোপেও নিয়ে যান, তাই থেকেই গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, ইংরাজী, আইরীশ প্রভৃতি

ভাষার স্থষ্টি হয়। সামনের পাতায় একটা বিভিন্ন আর্য্য ভাষার উৎপত্তির তালিকা দিলাম।

আর্য্য জাতীর সংস্কৃত ভাষা আস্তে আস্তে ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়লো। অনেক বিজিত অনার্য্যদের এই ভাষা বাধ্য হ'য়ে গ্রহণ ক'রতে হ'লো। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার হাজার বছর আগেই সমস্ত উত্তর ভারতে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। অনার্য্যদের ভাষাও এই সমস্ত আর্য্যজাতির সঙ্গে মিশতে আরম্ভ ক'রলো যেমন করে আজকাল বাঙ্‌লা ভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষা মিশছে। যে শব্দগুলো উচ্চারণ করা শক্ত সেগুলো সহজ ক'রে নেওয়া হ'তে লাগলো; যেমন "কলিকাতা" উচ্চারণ করা একটু শক্ত ব'লে আমরা বলি "কলিকাতা"। এমনি ক'রেই আস্তে আস্তে সংস্কৃত ভাষা বদলে প্রাকৃততে এসে দাঁড়ালো। এক এক জায়গার প্রাকৃত আবার এক একরকম হ'লো। কলিকাতার লোকেরা বলে "দেশ", পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকেরা বলে "ত্যাশ্" ইত্যাদি সেই রকম। পালি প্রাকৃত ভাষারই একটা রকমফের। কিছুই চিরদিনের জন্য নয়। আস্তে আস্তে প্রাকৃতও বদলাতে আরম্ভ ক'রলো, তখন সেই ভাষার নাম দেওয়া হ'লো অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকেই বাঙ্‌লা, উড়িয়া, হিন্দি, মৈথিলী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার স্থষ্টি হ'য়েছিল। নীচে কতকগুলি কথার ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন দেওয়া হ'লো। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন কারোর খেয়ালের বশে হয়নি, বিশেষ কতকগুলো নিয়ম ধ'রেই হ'য়েছিল।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্‌লা	আধুনিক বাঙ্‌লা
অস্মে	অম্‌হে	অম্‌হি	আম্হি	আমি
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ	আঠার
অবিধবা	অবিহবা	অইহব	আইঅ	এয়ো
ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইঁদারা

আর্য্য ভাষাদের বংশ-লিপি
মূল আর্য্যভাষা (ইন্দো-ইউরোপীয়)
টিউটোনিক (জার্ম্মাণ)
সেলটিক
ইতালীয়
শ্লাভ্
গ্রীক
আর্ম্মেনীয়
ইন্দো ঈরাণীয়ান
গথিক
ওয়েল্স
আইরীশ্
ল্যাটিন
পোল্, চেখ্
আরমানী
ঈরাণী আর্য্য
ইন্দো আর্য্য
বৈদিক সংস্কৃত
প্রাচীন গ্রীক
প্রাচীন পারসীক
জার্ম্মাণ, ইংরাজী, ড্যানীস
ওলন্দাজীয়, সুইডীস্
নরওয়েজীয়ান ইত্যাদি
ইতালীয়, ফরাসী
স্প্যানীস, পর্ত্তুগীজ
রুমানীয় ইত্যাদি
পল্হবী
পালি, প্রাকৃত
আধুনিক গ্রীক
ফার্সী
বাঙলা, হিন্দি, পঞ্জাবী
প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা
বেলুচী
পস্তু
সন্ধানী

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার হার।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্‌লা	আধুনিক বাঙ্‌লা
গোরূপ	গোরূব	গোরূঅ	গোরূ	গরু
দীপবর্ত্তিকা	দীপবট্টিআ	দীঅঅট্টিয়া	দীঅটি	দেউটি
নবনীত	নবনীআ	নবনীঅ	নঅনী	ননী
শৃণোতি	সুণদি, সুনই	সুনই	শুনই	শুনে
হস্ত	হত্থ	হত্থ	হাথ	হাত

নেপালের রাজকীয় পুস্তকাগারে "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়" নামে একখানা অতি প্রাচীন পুঁথি আছে। এই খানাই নাকি সবচেয়ে পুরোণো বাঙ্‌লা বই, এটা লেখা এগারো শো খৃষ্টাব্দে। এর দু একটা ছত্র তুলে দিচ্ছি; তোমরা প'ড়ে হয়তো কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু এটা বাঙলা ভাষা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

"ভবনই গহনে গভীর বেঁগে বাহী। ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥ পারগামী লোঅ নীভর তরই॥"

এর মানে কিছু বুঝতে পারলে? এর মানে হচ্ছে "ভবনদী গহন ও গম্ভীর বেগে বহিতেছে, উপরে কর্দ্দম, মধ্যে স্থান নাই। ধর্ম্মের জন্য চাটিল গুরু সাঁকো তৈরী করিল, পারগামী লোক ইহার উপর নির্ভর করে।" এরপরে আন্দাজ পঞ্চাদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা ভাষার উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন থেকে দিচ্ছি—

"ব্রহ্মা সব দেব লঁআ গেলন্তী সাগরে। তোহ্মে নানারূপে কইলেঁ অসুরে খএ।
স্তুতিঁয়ে তুষিল হরি জলের ভিতরে॥ তোহ্মার এ লীলা এ কংশের বধ হএ॥

এর মানে তোমরা একটু চেষ্টা ক'রলেই বুঝতে পারবে।

যদিও বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকেই এসেছে তবুও বাঙ্‌লায় এমন কতকগুলো শব্দ আর পদবিন্যাস আছে যার খোঁজ সংস্কৃতে মেলে না। এ সবগুলো আদিম অনার্য্য ভাষা থেকেই এসেছে। আমরা "এ ধার

ও ধার" "ঘুরিয়া ফিরিয়া" অবশেষে "বাড়িটাড়ি" "ঘরটর" "তুলিয়া ফেলিয়া" "বসিয়া পড়ি"। এ সব "—" মধ্যের পদবিন্যাসগুলো অনার্য্য ভাষারই দান। কতকগুলো কথা সাক্ষাৎ অনার্য্য ভাষা থেকে এসেছে যেমন "চাউল, গাড়ি, ডাগর, মেয়ে, ঘোড়া, কুকুর" ইত্যাদি। পূরাকালে পারসীক ও গ্রীকরা ভারতে এসেছিল, তাদের ভাষা থেকে কিছু কথা সংস্কৃত ভাষা নিয়েছিল, উত্তরাধিকারী সূত্রে বাঙ্‌লাও এর কিছু পেয়েছে ; একটা উদাহরণ দিচ্ছি ; গ্রীক "দ্রাখ্‌মে" (Drachme) কথার মানে এক রকম টাকা, এইটে প্রাচীন সংস্কৃত "দ্রহ্ম" রূপে আত্মসাৎ করলো পরে "দ্রহ্ম" থেকে "দহ্ম" আর তাই থেকে বাঙ্‌লার "দাম" কথাটা এসেছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তুর্কীরা বাঙ্‌লা জয় করে, তাদের ভাষা ফার্সী, আরবী আর তুর্কী ভাষার মিশেল। এই থেকে বাঙ্‌লাতেও অনেক ঐ সব ভাষার শব্দ এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা বাঙ্‌লা অধিকার করে ও সেই সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, দিনেমার এরাও বাঙ্‌লা দেশে কিছুদিনের জন্য বসতি করে ; এদের ভাষাও আমাদের বাঙ্‌লা ভাষায় কিছুটা ঢুকে আমাদের ধনী ক'রে তুলেছে। উদাহরণ ; বাঙ্‌লা ভাষায় ফার্সী শব্দ—মালী, হুজুর, শিকার, আবাদ, খাজনা, সরকার, আল্লা, ইজ্জত, কাঁচী, ফিরিঙ্গী, ইংরাজ, মজবুত ইত্যাদি ; ইংরাজী শব্দ—লাট, ইস্কুল, টেবিল, চেয়ার, গেলাস, সমন, জাঁদরেল (general), হাঁসপাতাল ইত্যাদি ; পর্ত্তুগীজ শব্দ—আনারস, তামাক, চাবি, নিলাম, কপি, বোতাম ইত্যাদি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে খৃষ্টাব্দ ১২০০ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা ভাষার আদিম বা প্রথম যুগ তখনো বাঙ্‌লা ভাষা সম্পূর্ণরূপে গ'ড়ে ওঠেনি, প্রাকৃতের প্রভাব তখন ছিল খুব বেশী। মধ্যযুগ হ'চ্ছে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; এর প্রথম ভাগকে (১২০০-১৩০০) যুগান্তরের যুগ বলা যেতে পারে, এই যুগে

বাঙ্‌লা ভাষার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হয়, এই সময়কার ভাষায় এখনকার সাধু ভাষায় অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। তারপর ১৩০০-১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "আদিমধ্য যুগ" বা "প্রাক্‌চৈতন্য যুগ"। তারপরে ১৫০০-১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "চৈতন্যযুগ বা বৈষ্ণবযুগ"; ১৬০০ আর ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হ'চ্ছে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির যুগ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আধুনিক যুগের আরম্ভ হয়। এই একশো বৎসরের মধ্য বাঙ্‌লা ভাষা আর সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হ'য়েছে। নানা লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাঙ্‌লা ভাষা আজ পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ ভাষা ব'লে গণ্য হ'তে চ'লেছে এ আমাদের গৌরবের কথা, গর্ব্বের কথা।

—॥ বাঙ্‌লা বর্ণমালার ইতিহাস ॥—

আজকাল দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত লেখা হয় বলে মনে ক'রো না যে দেবনাগরীই প্রাচীন ভারতের বর্ণমালা। অশোকের অনুশাসনে ভারতের সব চেয়ে পুরাণো অক্ষরের সন্ধান পাওয়া যায়, এই বর্ণমালার নাম হ'চ্ছে "ব্রাহ্মী লিপি"। অবশ্য মোহেন-জো-দড়োতে একরকম অক্ষরের সন্ধান মেলে কিন্তু কেউ আজ পর্য্যন্ত সেটা পড়ে উঠতে পারেনি, যদি সেটা পড়া যায় তা'হলে সেটাকেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পুরানো বর্ণমালা বলা হবে। যাক্‌, ব্রাহ্মী লিপি হ'চ্ছে খুব সোজা; এদের অক্ষরের মাত্রার বালাই নেই। কয়েকটা অক্ষর তোমাদের দিচ্ছি— + ক, Λ গ, ⁚॰ ই, C ট, O ঠ, I ন, [ ] ব, L উ, ⊥ র, ইত্যাদি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ব্রাহ্মী অক্ষরগুলো দক্ষিণ ভারতে অন্যরূপ ধারণ ক'রলো। তাই থেকে তামিল, মলয়ালম, তেলেগু প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতে কুষাণ আর গুপ্ত সম্রাটদের সময় থেকেই ব্রাহ্মী লিপি বদলাতে সুরু করে। রাজা হর্ষ-

বর্দ্ধনের পরে এ দেশে পৃথক রূপ ধারণ ক'রলো। কাশ্মীর আর পঞ্জাবের রূপের নাম দেওয়া হয় "শারদা"। রাজপুতনা, গুজরাটে, বেহার এই সব দেশের রূপের নাম হ'লো "নাগর" আর পূর্ব্ব ভারতের রূপের নাম হ'লো "কুটিল"। মূল ব্রাহ্মীর কুটিল রূপভেদ থেকে বাঙ্‌লা অক্ষরের উৎপত্তি হয়েছে। নাগর দেবনাগরী আর শারদা পঞ্জাবের গুরুমুখী বর্ণমালার জন্মদাতা ; বাঙ্‌লা ও দেবনাগরীর মধ্যে খুড়্‌তুতো জেঠ্‌তুতো ভাই ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ নেই। বাঙ্‌লা ভাষা জন্মকাল থেকেই নিজের এক বর্ণমালার সমৃদ্ধ ; এজন্য আমরা গর্ব্ব ক'রতে পারি ।

—✻ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস ✻—

বাঙ্‌লা সাহিত্যের পত্তন হয় তুর্কীদের বঙ্গবিজয়ের আগেই।

বাঙ্‌লা ভাষার মত বাঙ্‌লা সাহিত্যকেও যুগ অনুসারে ভাগ করা হয়।

১। প্রাচীন বা মুসলমান্ পূর্ব্ব যুগ, ১২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

২। তুর্কী বিজয়ের যুগ, ১২০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

৩। আদি মধ্যযুগ বা প্রাক্ চৈতন্য যুগ, ১৩০০-১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

৪। অন্ত-মধ্যযুগ, ১৫৯০-১৮০০ পর্য্যন্ত।

(ক) চৈতন্যযুগ বা বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধান যুগ, ১৫০০-১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

(খ) প্রাক্-আধুনিক যুগ (নবাবী আমল), ১৭০০-১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

৫। আধুনিক যুগ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত।

প্রথম দু যুগের কথা বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রবার সময় বলা হ'য়েছে। তৃতীয় যুগের প্রথম একশো বছরের কথা আমরা

সম্ভাশী ঃ-

Medicine for opening the bowels

Milk — *1/3 tenc*

NeKaut(?) Pulverized — *1/4 drachma*

Honey — *1/4 drachma*

Cook pour out eat for four days.

" পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো ব্যবস্থাপত্র"

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৫২ সালে মিশরে লেখা "হার্ম্মেস্ ট্রিস্‌মেজিষ্টাসের" বইএ এই ঔষধের ব্যবস্থা পত্রখানির সন্ধান পাওয়া যায়। বাঁ ধারে আসল আদিম মিশরীয় ভাষায় লেখা ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি আর ডান ধারে তারই পাঠোদ্ধার।

বিশেষ কিছুই জানি নে। খুব সম্ভব এই সময় প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির পুনরোভ্যুদয়ের ফলে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির গল্প নিয়ে বাঙ্‌লায় কাব্য রচনা আরম্ভ হয়। তুর্কীদের আসার আগেই সংস্কৃত আর বাঙ্‌লায় মিশিয়ে জয়দেব "গীতগোবিন্দ" কাব্য লেখেন। এর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। চণ্ডীদাসই হ'চ্ছেন খাঁটী বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ আদি কবি। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের (খুব সম্ভব বীরভূম জেলার) ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ গান ক'রতে খুব ভালবাসতেন, এই সময় তাঁর জনপ্রিয়তা এত বাড়ে যে অনেক অন্য লেখকও নিজের লেখা চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" কাব্যখানি বোধ হয় চণ্ডীদাসের নিজের লেখা। চণ্ডীদাসের জন্মের কিছু পরেই বিখ্যাত রামায়ণ লেখক কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম হয়। এঁর বাড়ী নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। ইনি ১৪০০ শতকের প্রথম ভাগের কবি। শ্রীচৈতন্যের আগেকার কবিদের মধ্যে পদ্মপুরাণ রচয়িতা বিজয়গুপ্ত আর শ্রীকৃষ্ণলীলা রচয়িতা মালাধর বসুই প্রাচীন। বাঙ্‌লার মুসলমান সুলতান হোসেন সাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) বাঙ্‌লা সাহিত্যের একজন খুব উৎসাহ-দাতা ছিলেন, তাঁর অনুরোধে ছুটিখাঁ বাঙ্‌লায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। চৈতন্যদেবের আগে ও তাঁর সময়ে প্রায় সব কিছুই রাধা-কৃষ্ণের বিষয় নিয়ে লেখা হ'তো। এখনকার ছেলেরা যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রতে বিলাত যায় তেমনি তখন বাঙালী ছেলেরা ন্যায় আর স্মৃতির উচ্চশিক্ষা পাবার জন্য মিথিলাতে যেত। বিদ্যাপতি ছিলেন চণ্ডীদাসের যুগের মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ কবি, বাঙালী ছাত্রেরা এই মৈথিলী কবির গান শিখে এসে বাঙ্‌লায় গাইতো। কিন্তু তাদের মুখে গানগুলো আর বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষায় রইলো না, ভেঙেচুরে অনেকটা বাঙ্‌লার মত হ'য়ে গেল ; এই নোতুন ভাষার নাম দেওয়া হ'লো ব্রজবুলী। ব্রজবুলীতে বিকৃত বিদ্যাপতির পদগুলো বাঙ্‌লায় এতদূর লোকপ্রিয় হয়েছিল

যে বিদ্যাপতি আসলে যে মৈথিলি কবি, বাঙ্‌লার নন, একথা বাঙালী প্রায় ভুলেই গেছে। এখনো অনেক বাঙালী কবি ব্রজবুলিতে কবিতা লেখেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নামে একখানা গীতিকাব্য এই ভাষায় লিখেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৫৮-১৫৩৩) বাঙ্‌লার জনসাধারণের মনে এবং সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, এঁরই সময়ে বাঙ্‌লায় এক বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হ'লো। শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁর শিষ্যদের পবিত্র জীবনচরিত লিখে বাঙালী কবিরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের গৌরব আর উপযোগীতা বাড়িয়ে দিলেন। এই সমস্ত লেখার মধ্যে গোবিন্দদাসের "কড়চা", বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" (১৫৭৩), লোচন দাসের (১৫২৩-১৫৮০) "চৈতন্যমঙ্গল", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" (১৫১৫), যতুনন্দন দাসের "কনানন্দ", ঈশান নাগরের "অদ্বৈত প্রকাশ" (১৫৬০) প্রভৃতি বইগুলো বাঙ্‌লা ভাষার অমূল্য সম্পদ। বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের অনুকরণে অনেক বাঙালী কবি রাধাকৃষ্ণ আর শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে বাঙ্‌লা ভাষায় আর ব্রজবুলীতে পদ রচনা ক'রতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ দাস কবিরাজ (১৫০৭-১৬১১) জ্ঞানদাস, বলরাম দাস আর নরোত্তম দাসই সর্ব্বপ্রধান। তারপর ১৬শ আর ১৭শ সপ্তকে বাঙ্‌লা সাহিত্য খুব দ্রুত উন্নতি লাভ ক'রতে সুরু করে। শ্রীচৈতন্যের কালে নবদ্বীপ বাঙ্‌লার সাহিত্যের ও কৃষ্টির কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়। এর জন্যই নবদ্বীপকে বলা হয় বাঙ্‌লার অক্সফোর্ড। ১৭শ:শতকের মধ্যভাগে কাশীরাম দাস বাঙ্‌লায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই সময় বাঙ্‌লার লোক সাহিত্য খুব উঁচু ধরণের হ'য়ে ওঠে; পূর্ব্ব বঙ্গের গীতিকাব্য এর শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। অষ্টাদশ শতক বাঙ্‌লা দেশের পক্ষে খুব অমঙ্গলকর হ'য়ে উঠেছিল। এই সময়ে বর্গীর পলাসীর যুদ্ধ হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এই সমস্ত দুর্ঘটনা ও দুর্য্যোগ ঘটে। এই যুগে নাম করার মত মাত্র তিনজন কবির দেখা পাওয়া

যায় ভক্ত রামপ্রসাদ সেন, ভারত চন্দ্র রায় কবি গুণাকর আর রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। রাম প্রসাদের রামপ্রসাদী সুরের গান কে না জানে। বাঙ্লা গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ এই সময়েই। বাঙ্লা গদ্যের উন্নতিতে পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ মিশনারীদের যথেষ্ঠ হাত ছিল। ১৮শ শতকের শেষে ইংরাজরা বাঙ্লা ছাপাখানা স্থাপনা করে। হ্যালহেডের ব্যাকরণ বাঙ্লা ভাষায় প্রথম ছাপা বই। ১৯শ শতকের প্রথম ভাগে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা যেমন বাঙ্লা বই প্রকাশ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন তেমনি অন্য দিকে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাঙ্লা গদ্য দ্রুত উন্নতি লাভ ক'রতে লাগলো। ১৯শ শতকে বাঙ্লা ভাষায় নব যুগের আরম্ভ হ'ল। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্লা ভাষার উন্নতির জন্য যথেষ্ঠ চেষ্টা করেন। এর পর অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) হাতে বাঙ্লা গদ্য সাহিত্য অপরূপ রূপ ধ'রলো। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে প্রাক-আধুনিক যুগের শেষ কবি বলা যেতে পারে। নবযুগের স্রষ্টাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দু'জন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ের স্বামী বিবেকানন্দ, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, রমেশ চন্দ্র দত্ত, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ আর অমৃতলাল বসুর নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এর পরে বর্ত্তমান যুগ বা রাবীন্দ্রিক যুগের আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অক্ষয় কুমার বড়াল (কবি), দেবেন্দ্র নাথ সেন (কবি), স্বর্ণকুমারী দেবী (উপন্যাসিকা), সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত (ছন্দকবি) দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (জাতীয় কবি ও নাট্যকার) আর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (উপন্যাসিক) তুলনা পৃথিবীর খুব কম ভাষাতেই মেলে। এই সমস্ত গুণিজন বাঙ্লা ভাষাকে যে সম্মান আহরণ ক'রে দিয়েছেন আমাদের কর্ত্তব্য সব সময়েই সেই সম্মান অক্ষুন্ন রাখা।

—❋ সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যিকদের খবর ❋—

বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি—

সংস্কৃত—কালিদাস ; বাঙ্‌লা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; হিন্দি—তুলসীদাস ; পার্শী—সাদী ; ফরাসী—শালি প্রধন্নুণ্ ; গ্রীক—হোমার ; জার্ম্মাণ—গ্যেটে ; ইতালিয়ান—দান্তে।

বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ—

হিন্দুদের—বেদ ; চীনাদের—পঞ্চ্ কিং ; বৌদ্ধদের—ত্রিপিটক ; শিখদের—গ্রন্থসাহেব ; খৃষ্টানদের—বাইবেল ; মুসলমানদের—কোরাণ ; পার্শীকদের—জেন্দাভেস্তা।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র—

আনন্দবাজার পত্রিকা (বাঙ্‌লা), সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কলিকাতা ; অমৃতবাজার পত্রিকা (ইংরাজী), সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, কলিকাতা ; ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ (ইংরাজী), সম্পাদক আর্থার মূর, কলিকাতা ; বোম্বে ক্রণিকল্ (ইংরাজী) সম্পাদক ফ্রান্সিসলো, বোম্বাই ; হিন্দু (ইংরাজী), সম্পাদক শ্রীনিবাস, মাদ্রাজ ; ট্রিবিউন (ইংরাজী), সম্পাদক শ্রীকালীনাথ রায়, পঞ্জাব।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র—

ইংল্যাণ্ড—টাইম্‌স্, মর্ণিং পোষ্ট, দি ডেলী মেল, নিউজ ক্রণিকল, ডেলী হেরাল্ড।

যুক্তরাষ্ট্র—দি ওয়ার্ল্ড, দি নিউইয়র্ক টাইম্স্, গ্লোব, দি এক্সামিনার।

জার্ম্মাণী—হুর অ্যান্‌গ্রীভ্।

ফরাসী—লে টেম্পস্, এক্সেলসিয়ার।

ইটালী—গায়ান্ রেল ডি ইটালিয়া।

ক্যানেডা—দি গেজেট।

সুইডেন—নায়াডাগ্‌লাইট্ আলেহাণ্ডা।

আফগানিস্থান—ইস্‌লা

রাশিয়া—ইজ্‌ভেস্‌টিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা—দি ট্যাঙ্গানিকা টাইম্স্।

নিউজীল্যাণ্ড—ঈভনিং পোষ্ট।

অষ্ট্রেলিয়া—মর্ণিং হেরাল্ড।

জাপান—নিচিনিচি, ওসাকা মাইনিচি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রের সংখ্যা—

বোম্বাই—৪১৫, মাদ্রাজ—৩৩০, পঞ্জাব—২৮৪, বাঙ্‌লা—২১০, বিহার উড়িষ্যা—৫৩, দিল্লী—৩৫, আসাম—২৪।

ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র—

দেশীয় ভাষায়—সমাচার দর্পণ, (বাঙ্‌লা); ইংরাজীতে—(হরকরা)

"শুভ নববৎসর" এই কথাটি সতেরোটা ভাষায় লেখা—

Happy New Year (ইংরাজী), *Frohes neues Yahr* (জার্ম্মান্), *Godt Nytaar* (ড্যানিস্), *Godt nytt ar* (সুইডীন্), *Glukkig Nieuwjaar* (ডাচ্), *Hyvaa Nuttavuotta* (ফ্লেমিস্), *Grehua noba roguna* (সার্ব্বিয়ান্), *Yumuma noba roguna* (বুলগেরিয়ান), *Blodog Njé ret* (হাঙ্গারীয়ান্), *Priectgu jaunu gadu* (লেটিশ্), *Bonne année* (ফ্রেন্স্), *Bonne anna*

(ইতালিয়ান্), *Felix ano* (স্প্যানীম্), *Bons Annos* (পর্ত্তুগীজ্), *La multi ani* (রুমানিয়ান্), *Westego Nourgo roku* (পোলিস্), *Laningu nauju mety* (লিথুনিয়ান্)।

কারোর সঙ্গে দেখা হলে আমরা যেমন বলি "কেমন আছ" তেমনি পৃথিবীর আরো আটটি ভাষায় কি বলে তার ইংরাজী অনুবাদ—

How do you do ? (ইংরাজী আর আমেরিকান), **How do you stand ?** (ফরাসী), **How do you find yourself ?** (ইটালীয়ান), **How do you fare ?** (জার্ম্মান), **May thy shadow be never less !** (রাশিয়ান), **Have you taken your rice ?** (চীনা), **How do you perspire ?** (মিশরী), **How are you ?** (বাঙ্লা)।

আমাদের দেশে যেমন শ্রী, শ্রীমতি এই সব লেখে নামের আগে তেমনি অন্যান্য দেশে কি লেখে—

জার্ম্মান—**Herr** (হের্), ইতালিয়ান—**Signor** (সিনর্), ফরাসী ভদ্রলোক—**Monsier** (মঁসিয়ে), অবিবাহিতা মেয়ে—**Mademoisella** (ম্যাদামোয়াজেল), ইংরাজ পুরুষ—**Mister** (মিষ্টার), বিবাহিতা মেয়ে —**Misses** (মিসেস), অবিবাহিতা মেয়ে—**Miss** (মিস)।

কে কি ছদ্মনামে পরিচিত—

"এলায়া"—চার্লস্ ল্যাম্ব্; "ওয়াস্প্ রেড্বান"—জর্জ্জ বার্নাড'শ; "কিউ"—আর্থার্ কুইলার্ কোচ্; "জেডিয়া ক্লাইস্ বুথাম্"—ওয়াল্টার্ স্কট্; "জেওফ্রি ক্রেয়ন্"—ওয়াশিংটন আর্ভিং; "জর্জ্জ ইলিয়ট্"—মিসেস জে ডব্লু ক্রস্ বা মেরি ঈভান্স্; "টেকচাঁদ ঠাকুর"—প্যারী চাঁদ মিত্র; "দিবাকর শর্ম্মা"—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র; "পঞ্চানন্দ"—ইন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী;

"পরশুরাম"—রাজশেখর বসু ; "বীরবল"—প্রমথনাথ চৌধুরী ; "বনফুল" —বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ; "ভানুসিংহ"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; "মার্লিন্"—লর্ড টেনিসন্ ; "লিটল্"—টমাস্ মুর ; "স্পার্ক্ টিমোথি"—চার্লস্ ডিকেন্স ; "আঁটো ফ্রাঁ"—জেক্স্ আনাটোল্ থিবো ; "গর্কী"—আলেক্সী:ম্যাক্সিমোভিক পায়েস্কভ্।

জেলের মধ্যে রচিত বিখ্যাত বই—

অস্কার ওয়াইল্ডের "ডি প্রোফাণ্ডিস্" ; ওয়াল্টার স্কটের "হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড" ; জন বেনিয়ানের "পিলগ্রিম্‌জ্ প্রগ্রেস্"।

সাহিত্যিকদের খবর—

সারাদিন দাঁড়িয়ে না থাকলে ভিক্টর্ হিউগো আর কলিন্স্ লিখতেই পারতেন না ; রুশোর লিখতে হ'লে গাছতলায় যেতে হ'তো ; পরচুলো পড়লে তবে বাফন্ লিখতে পারতেন, বিঠোফেন্ রচনা ক'রতেন মাথার ওপর বরফ রেখে ; হুইট্‌মানের লেখা কাঠগুদামে না ঢুকলে বেরুতো না ; লেমনেড ছিল আলেকজান্দার্ ডুমাসের সব চেয়ে প্রিয় ; লেখার সময় এড্‌গার্ ওয়ালেসের মুখে সর্ব্বদাই বর্ম্মা চুরুট থাকে ; ভল্‌টেয়ার বড্ড পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন, তিনি এক সঙ্গে তিনখানা ক'রে বই লিখতেন, কোলরীজ্ আর ডি'কোয়েন্সী খুব আফিংখোর ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ছিলেন চেষ্টার্‌টন্, তিনি যখন রাস্তায় বেরুতেন তখন একেবারে সুসজ্জিত হ'য়ে যেতেন, তাঁর গায়ে থাকতো একটা হাতাবিহীন গলাবন্ধ কোট আর হাতে থাকতো একটা ছড়ির মধ্যে লুকানো একখানা—খুব সরু ধারাল তরোয়াল, এ সবের কারণ জিগ্যেস ক'রলে তিনি বলতেন "রাস্তায় দেখি কোন কুমারী মেয়ে গুণ্ডার হাতে প'ড়েছে তা'হলে তখনই আমি তার সাহায্যে লেগে প'ড়তে পারবো।"

বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার সেক্সপীয়ারের সব নাটক-গুলো-তে মিলে মোট ১,০৬,০০৭১টা লাইন আর ৮,১৪,১৩০টা কথা আছে। "হ্যামলেট" নাটকটা সব চেয়ে বড়, আর "কমেডি অব এররস" সব চেয়ে ছোট; এই দুখান বইতে যথাক্রমে ৩,৯৩০ আর ১,৭৭৭টা লাইন আছে। সমস্ত বইগুলোর মোট চরিত্রের সংখ্যা ১,২৭৭-এর মধ্যে মেয়েদের ১৫৭টা। ব্যক্তিগত ভাবে হ্যামলেটের চরিত্র সব চেয়ে বড়, এঁকে বলতে হয় মোট ১১,৬১০টা কথা। "টেমপেষ্ট্" সেক্সপীয়ারের সব চেয়ে শেষে লেখা নাটক।

লেখকদের উচ্চতা—ওয়াল্টার স্কট আর ডারউইন ছিলেন ৬ ফিট লম্বা, শেলী আর কার্লাইল ৫ ফিট ১১ ইঞ্চি, থ্যাকারী ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি, বার্ণেস ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি, বাইরন ৫ ফিট ৮৷৷০ ইঞ্চি, সুইফ্‌ট ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি আর ডিকেন্স ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি!

সাহিত্যিক ভাইবোন—এলায়া ও চার্লস ল্যাম্ব; স্বামী-স্ত্রী—মিঃ ও মিসেস ব্রাউনীং; দুই বোন—অরু ও তরু দত্ত।

জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ষ্ট্রাস্‌বার্গের ডাঃ জিয়নিয়ার বলেন, ইয়ুরোপে সব শুদ্ধ ১২০টা কথ্য ভাষা আছে, তার মধ্যে জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলে ৮ কোটি লোক, রাশিয়ান ভাষায় ৭ কোটি, ইংরাজী ভাষায় ৪৷৷০ কোটি আর ফরাসী ভাষায় মোট ৪ কোটি লোক কথা বলে।

ইংরাজীতে E অক্ষরের সব চেয়ে বেশী দরকার হয়; যদি সবশুদ্ধ E লাগে হাজারটা তাহ'লে D লাগবে ৮৯২, T ৭৭০, A ৭২৮, I ৭০৪, S ৬৮০, O ৬৭২, N ৬৭০, H ৫৪০, R ৫২৮, B ৩০০, U ২৯৬, C ২৮০, M ২৭২, F ২৩৪, W ১৯০, P ১৬৮, L ১৫৮, V ১২৯, K ৮৮, J ৫৪, Q ৫০, X ৪৬ আর Z ২২। শব্দের আদ্যক্ষর হিসাবে S এর ব্যবহার সব চেয়ে বেশী।

"এসপারেন্টো" হ'চ্ছে এক রকম প্রস্তাবিত আন্তর্জ্জাতিক ভাষা; ডাঃ লাড্‌উইগ্‌ এর সৃষ্টিকর্ত্তা; এতে সাহিত্য সম্বন্ধে মোট কথা আছে ২৫০০টা আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ২০০০টা। একজন শিক্ষিত লোকের এই ভাষাটা শিখ্‌তে লাগে ঠিক তিনটি মাস।

সুইজারল্যাণ্ডের কোন নিজস্ব ভাষা নেই; সুইস্‌রা জার্ম্মাণ ভাষায় অফিসে, ফ্রেঞ্চ ভাষায় বাড়ীতে আর ইতালিয়ান ভাষায় পথে ঘাটে কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম চালায়।

পর্ত্তুগীজ "বাইমেরি" কথা থেকে বাঙ্‌লা **"মাইরী"** কথার উৎপত্তি।

মিঃ বয়কট নামে আয়র্লণ্ডে একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, কোন কারণে প্রজারা তাঁকে ব্যাপকভাবে সামাজিক বর্জ্জন করে; সেই থেকে এই রকম বর্জ্জন করার নাম হ'য়েছে **"বয়কট"**।

খৃষ্টানদের ধর্ম্ম গ্রন্থ **বাইবেল** ১৪৫২—৫৬ সালে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম ছাপা হয়, এযাবৎ এই বইখানা ৮৩৫টি ভাষায় অনুদিত হ'য়েছে।

—*বাঙ্‌লা ভাষায় কয়েকখানি বিখ্যাত বই*—

অক্ষয় কুমার দত্ত—এষা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—বেদে; অমাবস্যা; উর্ণনাভ

অতুলচন্দ্র সেন—গীতিগুঞ্জ

অনুরূপা দেবী—মা

অন্নদাশঙ্কর রায়—পথে প্রবাসে; সত্যাসত্য

অরবিন্দ ঘোষ—গীতার ভূমিকা

অশ্বিনীকুমার ঘোষ—ভক্তিযোগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস

উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—অন্তরাগ

করুণা নিধান বন্দোপাধ্যায়—ধান-দূর্ব্বা

কাজী নজরুল ইসলাম—সর্ব্বহারা
কামিনী কুমার রায়—দীপ ও ধূপ
কালিদাস রায়—বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ
কাশীরাম দাস—মহাভারত
কিরণ শঙ্কর রায়—সন্তর্পন
কৃত্তিবাস ওঝা—রামায়ণ
কুমুদ রঞ্জন মল্লিক—রজনীগন্ধা
কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়—আমরা কি ও কে ; কোষ্ঠীর ফলাফল
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ—প্রফুল্ল ; বুদ্ধদেব
গোবিন্দ চন্দ্র দাস—প্রেম ও ফুল
জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—বঙ্গের বাহিরে বাঙালী
চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদভ্রান্ত প্রেম
চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—পঞ্চদশী
চিত্তরঞ্জন দাস—সাগর সঙ্গীত
জগদানন্দ রায়—বাঙ্‌লার পাখী
জগদীশচন্দ্র বসু—অব্যক্ত
জলধর সেন—হিমালয়
জসীমউদ্দীন—নক্সী কাঁথার মাঠ
তারক নাথ গাঙ্গুলী—স্বর্ণলতা
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়—রাইকমল
দিলীপ কুমার রায়—ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা
দ্বিজেন্দ্র লাল রায়—হাসির গান ; সাজাহান ; দুর্গাদাস ; বিরহ
দীনেশ চন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আমরা ও তাঁহারা
নগেন্দ্র নাথ বিদ্যার্ণব—বিশ্বকোষ
নবীন চন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ
নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন মাষ্টার
পরশুরাম—কজ্জলী ; হনুমানের স্বপ্ন
প্রফুল্ল কুমার সরকার—লোকারণ্য
প্রবোধ কুমার সান্যাল—মহাপ্রস্থানের পথে ; প্রিয়বান্ধবী
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—গল্পাঞ্জলী
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—মাটির দেবতা
প্রেমেন মিত্র—পুতুল ও প্রতিমা ; কুয়াসা
বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর ; কৃষ্ণকান্তের উইল ;

সন্ধানী :—

রাজা রামমোহন রায়

সন্ধানী :—

"বন্দেমাতরম" মন্ত্রের পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র

কৃষ্ণ চরিত্র ; আনন্দমঠ
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—
সর্বহারাদের গান
বিনয় কুমার সরকার—
নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়—
মেঘমল্লার ; অপরাজিতা
বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ
বীরবল—বীরবলের হালখাতা
বুদ্ধদেব বসু—সাড়া ; বন্দীর বন্দনা ;
যেদিন ফুটলো কমল
মনীন্দ্রলাল বসু—সোণার হরিণ
মনোজ বসু—দেবী কিশোরী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—
মেঘনাদ বধ কাব্য
মাণিক বন্দোপাধ্যায়-
পুতুল নাচের ইতিকথা
যতীন্দ্র নাথ বাগচী—নাগকেশর
যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত—মরুশিখা
রজনী কান্ত সেন—বাণী
রজনী কান্ত গুপ্ত—সিপাহি যুদ্ধের
ইতিহাস

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—গোরা ;
ঘরে বাইরে ; মুক্তধারা ;
শেষের কবিতা ; রাশিয়ার
চিঠি ; চয়নিকা ; গীতাঞ্জলী ;
মহুয়া ; বিশ্বপরিচয়
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—মানময়ী গার্লস স্কুল
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পল্লীসমাজ ;
নিষ্কৃতি ; দত্তা ; শ্রীকান্ত (১ম-৪র্থ
পর্ব্ব); শেষপ্রশ্ন ; চরিত্রহীন; বিপ্রদাস
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—অতসী
সীতাদেবী—পরভৃতিকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—অভ্র আবীর ;
কুহু ও কেকা
সরোজকুমার রায় চৌধুরী—
ক্ষণবসন্ত
সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়—
মুক্ত পাখী
হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—
বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা

—* পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানি বিখ্যাত বই *—

অল্ কোয়াইট্ অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট্—এরিয়া রিমার্ক (জার্ম্মাণ)।
অয়েল্—আপ্টন্ সিনক্লেয়ার্ (আমেরিকান)।
আইভানহো—স্কট (ইংরাজ)।
আউট্ লাইন্ অব্ দি ওয়ার্লড্স্ হিষ্টরী—এইচ, জী, ওয়েল্স্ (ঐ)।
আঙ্কল্ টম্স্ ক্যাবিন্—বীচার্ ষ্টো (ঐ)।
আন্ টু দি লাষ্ট—রাস্কিন (ঐ)।
ইমেজেস্ ইন্ এ মিরার—সিগ্রিড্ আণ্ড্সেট্ (নরওয়েজীয়ান)।
ঈনীড্—ভার্জ্জিল্ (ল্যাটিন)।
ঈলিয়াড্—হোমার (ঐ)।
উত্তর রামচরিত—ভবভূতি (সংস্কৃত)।
এ্সে—ইমার্সন্ (আমেরিকান)।
ওডিসি—হোমার (ল্যাটিন)।
কাদম্বরী—বানভট্ট (সংস্কৃত)
কাউণ্ট্ অব্ মণ্টেক্রিষ্টো—আলেক্জন্দার্ ডুমা (ফরাসী)।
কারেক্টার্স্ ইন্ ডিষ্ট্রেস্—লুই পিরান্দেলা (ইতালিয়ান)।
কো ভেডিস্—সিয়েঙ্কুইজ (পোলিস্)।
ক্রাইম এণ্ড পানিশ্মেণ্ট—ডষ্টয়ভস্কি (রাশিয়ান)।
ক্রিয়েটিভ্ এভ্যুনিউশন—হেন্‌রী বার্গসন (ফরাসী)।
গালিভার্স্ ট্রাভল্—জোনাথন্ সুঈফ্ট (ইংরাজ)।
গ্রেট্ হাঙ্গার্—জোয়ান্ বোয়ার (ড্যানিশ)।

গ্রোথ্ অব্ দি সয়েল্—নুট্ হ্যাম্‌সন্ (নরওয়েজীয়ান্)।

জঁা ক্রিঁস্তঁফা—রেঁামা রোঁলা (ফরাসী)।

ডন্ কুইক্সো—সার্ভেন্টিজ্ (স্প্যানিস)।

ডল্‌স্ হাউস্—ইব্‌সেন্ (নরওয়েজীয়ান)।

ডি প্রোফাণ্ডিস্—অস্কার ওয়াইল্ড্ (ইংরাজ)।

ডিভাইনা কমেডিয়া—দান্তে (ইতালিয়ান্)।

ডেথ্ ইন্ ভেনিস্—টমাস্ মান্ (জার্ম্মাণ)।

ডেভিড্ কপারফিল্ড্—ডিকেন্স্ (ইংরাজ)।

ড্রিম্ শপ্—এমিল্ জোলা (ইতালিয়ান্)।

থিবোল্ট্—মার্টিন্ ডুগার্ড (ফরাসী)।

পিল্‌গ্রীম্‌জ প্রগ্রেস্—জন্ বেনিয়ান (ইংরাজ)।

দি আউট্‌কাষ্ট্—সেল্‌মা লেগারলফ্ (সুইডীস্)।

দি গুড্ আর্থ্—পার্ল্ বাক্ (আমেরিকান্)।

দি জেণ্টেল্‌ম্যান্ ফ্রম্ সানফ্রাসিস্কো—আইভান্ বুনিন্ (রাশিয়ান)।

থ্রি মেন্ ইন্ এ বোট্—জেরোম্ কে জেরোম্ (ফরাসী)।

পেঙ্গুইন্ আইল্যাণ্ড্—আঁটো ফ্রঁা (ফরাসী)।

প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ অ্যাণ্ড্ রিগেণ্ড্—মিণ্টন্ (ইংরাজ)।

ফাউষ্ট্—গ্যেটে (জার্ম্মাণ)।

ফার্ ফ্রম্ দি ম্যাডেনিং ক্রাউড্—টমাস হার্ডি (ইংরাজ)।

ফোর্‌সাইট্ সাগা—গলস্‌ওয়ার্দ্দী (ঐ)।

ভার্জ্জিন্ সয়েল্—আইভান টুর্গানিভ্ (রাশিয়ান্)।

মাদার্—গর্কী (রাশিয়ান)।

মার্চ্চেণ্ট্ অব্ ভেনিস্—সেক্ষপীয়ার (ইংরাজ)।

মার্টিন্‌স্ সামার্—ভিকি বাউম (ইতালিয়ান)

মেঘদূতম্—কালিদাস (সংস্কৃত)।

মেন অ্যাণ্ড উইমেন—ব্রাউনিং (ইংরাজ)।

মোনা লিসা—জেসিস্তো বেনাভিস্তো (স্প্যানীস্)।

ম্যাকবেথ্—সেক্ষপীয়ার (ইংরাজ)।

রিভোল্ট্ অফ্ এসিয়া—আপ্টন্ ক্লোজ্ (আমেরিকান)।

রবিন্‌সন্ ক্রুশো—ডানিয়েল ডিফো (ইংরাজ)।

রুবায়েৎ—ওমর খৈয়াম (পারসীক্)।

রেসারেক্‌সান্—টলষ্টয় (রাশিয়ান)।

রোডস টু ফ্রিডম—বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ (ইংরাজ)।

লাইট অব্ এসিয়া—এডুয়েন্ আর্নল্ড্ (ঐ)।

লাফিংট্রুথ্—স্পিটেলার (সুইডীস্)।

লে মিজারেব্‌ল্—ভিক্টর হিউগো (ফরাসী)।

বিয়ণ্ড্ দি হরাইজন্—ইউজেন ও'নীল (আমেরিকান)।

ব্যাক্ টু মেথুশীলা—বার্নার্ড্ শ (আইরীশ)।

ব্যাবিট—লুই সিন্‌ক্লেয়ার (আমেরিকান)।

ব্রেভ্ নিউ ওয়ার্ল্ড্—আলডুস হাক্সলি (ইংরাজ)।

ব্লুবার্ড—মেটারলিঙ্ক্ (বেল্‌জিয়ান্)।

শকুন্তলা—কালিদাস (সংস্কৃত)।

সিভিলিজেশান্ অব্ ইণ্ডিয়া—রমেশ দত্ত (বাঙালী)।

হোয়াট্ ইজ্ আর্ট্—টলষ্টয় (রাশিয়ান)।

অর্থনীতি

—✵ পৃথিবীর প্রধান প্রধান কাঁচামাল উৎপাদনকারী ✵—

(পরিমাণ অনুযায়ী)

অভ্র—ভারতবর্ষ, রাশিয়া

আখ—কিউবা, ভারতবর্ষ, জাভা

অ্যালুমিনিয়াম—জার্ম্মাণী, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ

ওটমিল—যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা

কফি—গুয়াটেমালা, ব্রাজিল

কয়লা—যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, জার্ম্মাণী, রাশিয়া, ভারতবর্ষ

কাঠ—ক্যানাডা, বর্ম্মা

কাঠের মণ্ড—যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানেডা, সুইডেন

কোকো—গোল্ডকোষ্ট, ব্রাজিল

কুইনাইন—ভারতবর্ষ

গন্ধক—ইটালী, নরওয়ে

গম—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ক্যানেডা ভারতবর্ষ

চাল—ভারতবর্ষ, চীন, জাপান

চা—ভারতবর্ষ, চীন, সিংহল

জাফ্রান—ভারতবর্ষ

টাংষ্টান—চীন, বর্ম্মা, মালয়

টিন—মালয়, বলিভিয়া

তূলা—যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, মিশর

তামাক—যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ

তামা—চিলি, যুক্তরাষ্ট্র

দস্তা—যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানেডা

নিকেল—ক্যানেডা, কালিডোনিয়া

পশম—অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

পাট—ভারতবর্ষ

পারদ—যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী

প্লাটিনাম—ক্যানেডা

পেট্রোল—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভেঞ্জুলা, রুমানিয়া

ফ্লাক্স্‌—রাশিয়া, পোলাণ্ড
বীটচিনি—জার্ম্মাণী, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া
বার্লি—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্ম্মাণী
ভুট্টা—যুক্তরাষ্ট্র, আর্জ্জেনটাইন্‌
মদ—ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল
ম্যাঙ্গানীজ—ভারতবর্ষ, রাশিয়া
রবার—মালয়, ডাচ্‌ ঈষ্টইণ্ডিয়া
রাই—রাশিয়া, জার্ম্মাণী
রেডীয়াম—বেলজিয়ান্‌ কঙ্গো
রেশম (আসল)—চীন, জাপান, ভারতবর্ষ
রেশম (নকল)—যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী
রূপা—মেক্সিকো
লোহা—যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণী, রাশিয়া
সোনা—দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া
সাবু—মালয়, সারাওয়াক
সীসা—যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া
হীরা—গোল্ডকোষ্ট, বেলজীয়ান্‌-কঙ্গো

✽ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ি ও আমাদের টাকায় তাদের মোটামুটি দাম ✽

[illegible]য়া—১০০ গ্রস্চেন=১ সিলিং (৯·৬ আনা)
অষ্ট্রেলিয়া—ইংল্যাণ্ডের মত।
আইসল্যাণ্ড—১০০ অরর=১ ক্রোনার (১৩·৩ আনা)
আলবেনিয়া—৫ লেক=১ ফ্রাঙ্ক (৯·৬ আনা)
আবিসিনিয়া—৩২ বেসা=১৬ পিয়াস্ত্রে=১ টালারী (১টা ৮ আনা)
ইতালী—১০০ সেন্টিম্‌=১ লীরা (·২·৫ আনা)
ইরাক—১০০০ ফিল্‌=১ দিনার (১৫ টাকা)

ইরাণ—১০০ সেণ্ট=২০ দিনার=১ রায়াল (৩ আনা)

ইংল্যাণ্ড,—৪ ফার্দ্দিং=১ পেনি,১২ পেনী=১ শিলিং, ২০ শি,
=১ পাউণ্ড (১৫ টাকা)

এডেন—ভারতবর্ষের মত

এস্থোনিয়া—১০০ সেণ্ট=১ ক্রুন (১৩·৩ আনা)

কলোম্বিয়া—১০০ সেণ্টভো=১ পেসো (৫ টাকা)

ক্যানেডা—১০০ সেণ্ট=১ ডলার (৩ টা ১৫ আনা)

চীন—১০০০ ক্যাস=১০০ সেণ্ট=১ ডলার (১ টা ৩ আনা)

জাপান—১০০০ রিন=১০০ সেন=১ ইয়েন (১ টা ৮ আনা)

জার্ম্মাণী—১০০ ফেনিগ্=১ মার্ক (১২ আনা)

ডেনমার্ক—১০০ ওর=১ ক্রোন (১৩·৫ আনা)

তুরস্ক—১০০০ পারাস্=১০০ পিয়াস্ত্রে=১ লিরা (১টা ৯ আনা)

নেদারল্যাণ্ড—১০০ সেণ্ট=১ ফ্লোরিও (১ টা ৪ আনা)

পর্ত্তুগাল—১০০ সেণ্টাভো=১ এস্কুডো (৩ আনা)

পোল্যাণ্ড—১০০ গ্রাস্=১ জ্লোটি (৫·৫ আনা)

ফিজি—ইংল্যাণ্ডের মত

ফিলিপাইন—৫০ সেণ্ট=১ পেসো (১ টা আ)

ফ্রান্স—১০০ সেণ্ট=১ ফ্রাঁ (৯ আনা)

বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকা—১০০ সেণ্ট=১ শিলিং (১২ আনা)

বৃটিশ নর্থ বোর্ণিও—১০০ সেণ্ট=১ শিলিং (১টা ১২ আ)

বেলজিয়াম—৫০০ সেন্টিম=৫ ফ্রাঙ্ক=১ বেল্গা (৮ আনা)

ব্রাজিল—১০০ রেইজ্=১ সিলি রেইজ (৩ টা ১২ আ)

মিশর—১০০০ মিলিম্=১০০ পিয়াস্ত্রে=৬ টালরী=১ পাউণ্ড
(১ টাকা)

মেক্সিকো—১০০ সেন্টিভো=১ পেসো (১ টা ২ আ)

জান্‌জিবার—ভারতবর্ষের মত

যুক্তরাষ্ট্র—১০০ সেণ্ট=১ ডলার (৩ টা ৩ আ)

ল্যাটভিয়া—১০০ স্যান্টিম=১ ল্যাট (৯·৬ আনা)

ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট—১০০ সেণ্ট=১ এস এম ডলার (১টা ১২ আ)

সারওয়াক্—১০০ সেণ্ট=১ এস ডলার (১ টা ১২ আ)

সুইজারল্যাণ্ড—১০০ সেণ্টম=১ সুইসফ্রাঁ (৯·৬ আনা)

সুইডেন—১০০ওর্=১ ক্রোনা (১০ আনা)

সোভিয়েট রাশিয়া—১০০ কোপেক=১০ রুবল=১ চারভেনেট্‌স্
(৬ টা ১ আনা)

স্পেন—৫০০ সেন্টিম=৫ পেষ্টা=১ ডিউরো (৩টা ১ আ)

হল্যাণ্ড—১০০০ সেণ্ট=১ গিল্‌ডার (১ টা ৪ আ)

হাঙ্গারী—১০০ ফিশার=১ পেঙ্গো (১৩ আনা)

বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে প্রতি ভারতবাসীর বাৎসরিক গড় আয়

মিঃ নৌরজী (১৮৭০)	২০ টাকা
স্যার ডেভিড বারবার (১৮৮২)	১৭ টাকা
লর্ড কার্জ্জন (১৯০১)	৩০ টাকা
অনারেবল ই, এম, কুক (১৯১১)	৫০ টাকা
প্রোফেসর ওয়াডিয়া ও যোশী (১৯১৩-১৪)	৪৫ টাকা
প্রোফেসর শ্লেটার (১৯২৫)	১০০ টাকা
সাইমন কমিশন (১৯২৯)	১০৮ টাকা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের

এডেসল্ ফোর্ড্ (যুক্তরাজ্য)
এডমার্ডডি রথচাইল্ড (ফরাসী)
হেনরী ফোর্ড্ (যুক্তরাজ্য)
ডিউক্ অব্ ওয়েষ্টমিনিষ্টার্ (ইংল্যণ্ড)
হোহেন্ জোলার্ন্ (জার্ম্মাণী)
গাইকোয়ার অব বরোদা (ভারতবর্ষ)
স্যার বেশীল জহরফ (গ্রীস)
সাইমন্ পেটিলো (বলিভিয়া)
লর্ড ঈভিগ্ (ইংলণ্ড)
ডি, ওয়াল্ডেল্ (ফরাসী)
নিজাম অব হায়দ্রাবাদ (ভারতবর্ষ)
জন্ ডি রক্‌ফেলার (যুক্তরাজ)
লুই ড্রেফাস্ (ফরাসী)
ডব্লু মেল্‌ন (যুক্তরাজ্য)
ফ্রিজ্ হাইজেল (জার্ম্মাণী)
ফেডারিক্ ক্লিক্ (জার্ম্মাণী)
ফ্রাঙ্ক্ ষ্টেনলার্ট্ (কিউবা)
এন এয়াং স্যাঙ (চীন)
আগা খাঁ (ভারতবর্ষ)

ব্যাঙ্ক

ভারতবর্ষে প্রতি দশলক্ষ লোকের জন্য একটি ব্যাঙ্ক আছে, গ্রেটবৃটেনের আছে প্রতি ২৮৫ জনের জন্য একটি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ২৫৬০ জনের জন্য একটি, ক্যানেডার প্রতি ৪৪৮ জনের জন্য একটি আর জাপানের প্রতি ৯২ জনের জন্য একটি ব্যাঙ্ক। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতি-জনের হিসাবে গড়ে ৪৬৵ জমা আছে, গ্রেটবৃটেনের ৭২০০ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রের ১০৪৪ টাকা, কানাডার ৭০০ টাকা আর জাপানের ১৬৮ টাকা জমা আছে।

আমাদের দেশ

—✱ আমাদের বাঙ্‌লা দেশ ✱—

আমাদের বাঙ্‌লা দেশ গঙ্গা মায়ের আদুরে মেয়ে। মা গঙ্গা যুগ যুগ ধরে হিমালয় পাহাড়কে গুঁড়িয়ে এনে সাগরের তীরে এমন একটি সুজলা সুফলা দেশ গ'ড়ে তুলেছেন ; অবশ্য একাজে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর দানও খুব কম নয়। বাঙ্‌লার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে বিরাটকায় হিমালয় আর পায়ের তলায় বঙ্গোপসাগরের গাঢ়নীল জল। এদেশের উত্তর, পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিক পাহাড়ে আর বনজঙ্গলে ঘেরা ; সে দিকের জমি উঁচুনীচু, শক্ত, পাথুরে আর কাঁকরে ভর্ত্তি ; দক্ষিণে সমুদ্র আর তার তীরে সুন্দরবন। এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে মাঝখানের জমি সমতল আর উর্ব্বর। বাঙ্‌লার প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা ; এছাড়াও অসংখ্য, ছোটনদী, উপনদী শাখানদী, পাহাড়েনদী ইত্যাদি আছে। এখানে মোটামুটি দুটো ঋতু বর্ষা আর শীত। গ্রীষ্ম ঋতু প্রায় বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। এখানে যথেষ্ঠ বৃষ্টি হয় আর অসংখ্য নদী থাকাতে প্রচুর পলি পড়ে তাই এদেশের মাটি এত সরস আর উর্ব্বর। বাঙলার আবহাওয়া ভিজে, গরম আর ঠাণ্ডার মাঝামাঝি। এখানকার শতকরা ৮৫ জন লোকের কৃষিকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা। বাঙ্‌লার প্রধান ফসল ধান, পাট, তামাক আর চা। তা ছাড়া আরও দু'চার রকমের ফসল, রবিশস্য আর আম কাঁঠাল ইত্যাদি ফলও জন্মায় প্রচুর। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লোহা, তামা আর অভ্রই প্রধান। বহু পুরাকাল থেকে বাঙ্‌লাদেশ রেশম আর সুতার কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বাঙ্‌লার ঢাকার মসলিনের কথা সারা জগত জানে। সমস্ত ভারতের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ধান হয় বাঙ্‌লায়।

বাঙ্‌লাদেশের আয়তন ৮২,৯৫৫ বর্গ মাইল; লোক সংখ্যা মোট ৫,০৯,৯৩,৮৬০; তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২,৪৫,৩৩,৩৩৯; আর পুরুষের সংখ্যা ২,৬৪,৬০,৪২৭। জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ জন হিন্দু, ৫৩ জন মুসলমান আর ২ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। এখানকার শতকরা ৯জন লেখাপড়া জানে। বাঙ্‌লার প্রতিবর্গ মাইলে ৫৭৯ জন লোকের বাস। এখানে ৫টি বিভাগ আর ২৮টি জেলা আছে। রাজসাহী বিভাগ সবচেয়ে বড়; সব চেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহ আর সব চেয়ে ছোট জেলা হাওড়া। বাঙ্‌লায় দুটি করদ বা মিত্ররাজ্য আছে কুচবিহার আর পার্ব্বত্য ত্রিপুরা। কলিকাতার কাছে চন্দননগর ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বাঙ্‌লাদেশের প্রধান নগর কলিকাতা। সহর হিসাবে কলিকাতার স্থান ভারবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে প্রথম আর সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয়। বাঙ্‌লায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্‌লা দেশের রেলপথ—ই, আই, আর—হাওড়া থেকে পশ্চিমে গিয়েছে; বি, এন, আর—হাওড়া থেকে দক্ষিণে গিয়েছে; ই, বি, আর—শিয়ালদহ থেকে পূর্ব্বে গিয়েছে; এ, বি, আর—গৌহাটি থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছে; ডি, এইচ, আর—শিলিগুড়ী থেকে পাহাড়ের দিকে গিয়েছে; আর মার্টিন, বি, পি, ইত্যাদি কয়েকটা ছোট ছোট লাইন কলিকাতার আশে পাশের গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। বাঙলার প্রসিদ্ধ রেলওয়ে সেতু হ'চ্ছে ই, বি, আরের সারার কাছে পদ্মার ওপর "হার্ডিঞ্জ ব্রীজ"; মেঘনার ওপর "কীং জর্জ্জ ব্রীজ" আর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ওপর "ওয়েলিংডন ব্রীজ"ও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা আর হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার ওপর ভাসমান "হাওড়া ব্রীজ" পৃথিবীর মধ্যে এই জাতীয় সব চেয়ে বড় সেতু। বাঙ্‌লার প্রসিদ্ধ বন্দর দুটি—কলিকাতা আর চট্টগ্রাম। কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে

পাটের সব চেয়ে বড় কেন্দ্র। পূর্ব্ব বঙ্গ নদীবহুল হওয়ায় নৌকা আর ষ্টীমারযোগে অধিকাংশ বাণিজ্য চলে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্‌লাদেশ সর্ব্বপ্রথম: উন্নতি করে, আর এখনো বাঙালীরা সব চেয়ে বুদ্ধিমান আর উন্নত জাতি।

—* আমাদের ভারতবর্ষ *—

ভারতের পশ্চিমে যে বিশাল সিন্ধু নদ আছে, তার নামের উচ্চারণ পারসীকরা ক'রতেন "হিন্দ্", তাই থেকেই জাতিবাচক "হিন্দু" আর দেশবাচক "ইণ্ডিয়ার" উৎপত্তি। ভরত মুনির নামে এদেশের নামকরণ করা হইয়াছে "ভারতবর্ষ"। আগে আফগানিস্থান, তিব্বত, বর্ম্মা এসব দেশ ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল।

রাশিয়াকে বাদ দিলে ইয়ুরোপের যতখানি বাকী থাকে ভারতবর্ষের আয়তন প্রায় তারই সমান। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমাবেশ যে একে একটি দেশ না ব'লে মহাদেশ বলাই উচিৎ। ভারতবর্ষের বিস্তার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় দুহাজার মাইল আর পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে আড়াই হাজার মাইল।

এই দেশের মাঝখানে সুদীর্ঘ বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণী পূর্ব্ব থেকে ছড়িয়ে প'ড়ে একে উত্তর আর দক্ষিণ দু ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে। উত্তর ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত আর দক্ষিণ ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য। আর্য্যাবর্ত্তকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়—গঙ্গা আর সিন্ধু নদী তীরস্থ দুটো আলাদা আলাদা সমভূমি, তাদের মধ্যেকার রাজপুতনার মরুভূমি আর হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ। ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটি সহজ জীবন যাত্রার পক্ষে খুব উপযোগী হওয়ায় এখানকার অধিবাসিদের অন্যান্য

দেশবাসীদের মত প্রকৃতির সঙ্গে অত যুদ্ধ ক'রতে হয় নি। সেইজন্য প্রাচীন ভারতবাসীরা প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করে কাব্য আর দর্শণে মন দেবার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সুবিধার জন্যই তাঁরা অন্য দেশের লোকেদের মত কষ্টসহিষ্ণু আর কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠেন নি, ফলে ভারতের ধনসম্পত্তির লোভে আকৃষ্ট হ'য়ে বাইরের লোকেরা অল্পায়াসেই ভারতবর্ষ অধিকার ও লুণ্ঠনে সমর্থ হ'য়েছিল।

পিতার মত সস্নেহে হিমালয় পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ভারতের উত্তর দিককে ঘিরে রেখেছে। হিমালয় প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা। ভারতের দিকে হিমালয়ের গা খুব কম খাড়াই। এর বুক প্রায় বিশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত লতাগুল্মে ঢাকা। এখানকার উদ্ভিদেরাই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গার বাসিন্দা ব'লে গর্ব্ব ক'রতে পারে। হিমালয়ের পায়ের কাছে পূর্ব্ব দিকে গভীর বন, একে বলে তরাই ; তার তলাতেই প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল ভূমি। ব্রহ্মপুত্র এই সমতল ভূমির আর একটা প্রধান নদী। সত্যিই হিমালয় ভারতের পিতৃস্বরূপ ! গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর জন্মদাতা হিমালয় ; এই সব নদী না থাকলে উত্তরভারত মরুভূমি হ'য়ে যেত। যদি হিমালয়ের প্রাচীর না থাক্‌তো তা হ'লে সাগর থেকে যত মেঘ তৈরী হ'তো তার সবখানি বাধা না পেয়ে চীন আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে উড়ে চলে যেতো। হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাহাড়। এর সবচেয়ে উঁচু চুড়োর নাম "এভারেষ্ট" (২৯,০০২ ফিট) ; শ্রীরাধানাথ শিকদার নামে এক বাঙালী একে আবিষ্কার করেন।

আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর থেকে জোলো বাতাস মেঘ ঘাড়ে করে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ব'য়ে আসে। এই বাতাসই বর্ষার অগ্রদূত। আরবী ভাষায় "মৌসীম" মানে ঋতু ; তাই এই ঋতুপ্রবর্ত্তক বাতাস্‌কে বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমী বায়ু। এরই একটা ভাগ

আসে বাঙ্‌লা আর আসামের দিকে, এদেশে তাই এত বৃষ্টি। আসামের চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়।

দাক্ষিণাত্য দেশটা আর্য্যাবর্ত্তের মত মোটেই নয়, কেবলই পাহাড়ে ভর্ত্তি।

বাঙ্‌লা দেশের আবহাওয়া ভিজে, ঠাণ্ডাও বেশী নয় গরমও বেশী নয়। যুক্তপ্রদেশে মধ্যভারত প্রভৃতি জায়গায় যেমনি ঠাণ্ডা তেমনি প্রচণ্ড গরম; সিন্ধু, পঞ্জাব, বেলুচীস্থান প্রভৃতি জায়গা তো গরমকালে প্রায় মরুভূমি। কোয়েটার কাছে সিবিতে গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে—প্রায় ১২৮°, শীতকালে এখানে তাপ নামে ২২°। পাহাড়ে জায়গাগুলো শীতপ্রধান। পঞ্জাব সিন্ধু প্রভৃতি জায়গা জলাভাব ব'লে বড় বড় খাল কেটে মাঠে জল নিয়ে যাওয়া হয়। পঞ্জাবের জল সেচনের খাল বিশ্ববিখ্যাত।

ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় একেবারে সরল; একে তিন ভাগ করা হ'য়েছে—গোয়া থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত কঙ্কণ উপকূল; বোম্বাই থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত মালাবার উপকূল আর সমস্ত পূর্ব্বভাগকে বলা করোমণ্ডাল উপকূল। পশ্চিম উপকূলে পাঁচটি প্রধান বন্দর, করাচী, ভবনগর, গোয়া, বোম্বাই আর কোচীন, পূর্ব্ব উপকূলে চারটি বন্দর—মাদ্রাজ, ভিজাগপতম, কলিকাতা আর চট্টগ্রাম। করাচী স্বাভাবিক বন্দর নয়, সমুদ্রের মধ্যে বাঁধ দিয়ে একে সৃষ্টি করা হ'য়েছে; বোম্বাই দ্বীপ, সেতু দিয়ে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত।

ভারতের পর্ব্বতের একটা তালিকা দিচ্ছি—উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বে যথাক্রমে সুলেমান, হিন্দুকুশ, কারাকোরম আর লুসাই, দক্ষিণ ভারতে পশ্চিমঘাট, নীলগিরি আর পূর্ব্বঘাট; মধ্যভারতে বিন্ধ্যগিরি আর আরাবল্লী শ্রেণী। বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে পুরাণে একটা বেশ মজার গল্প আছে—অনেকদিন আগে এই পাহাড়টা ক্রমাগত উঁচুদিকে বেড়ে যাচ্ছিল; এর চুড়ো আকাশে ঠেকে আর কী! চন্দ্র সূর্য্যের যাতায়াতের

পথ বন্ধ, কি ভীষণ মুস্কিল! এখন অগস্ত্য মুনি ছিলেন বিন্ধ্যের গুরু। অবশেষে দেবতারা তাঁর কাছে হাতজোড় ক'রে গিয়ে ব'ল্লেন, "প্রভু! একটা বিহিত করুন।" অগস্ত্য আর কি করেন, আস্তে আস্তে বিন্ধ্য পর্ব্বতের সামনে গিয়ে হাজির হ'লেন। বিন্ধ্য নমস্কার ক'রে মাথা নীচু ক'রে রইলো; অগস্ত্য তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লেন—"বৎস, আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি এমনি ক'রেই থাক।" বিন্ধ্য বল্ল—"আচ্ছা, বেশ।" অগস্ত্য সেই যে গেলেন আজও আর ফেরেন নি; বিন্ধ্য পর্ব্বতও আর মাথা তুলতে পারছে না, তবে অগ্যস্ত মুনি একবার ফিরে এলেই হয়।

বাইরের দিক থেকে ভারতে আসার কয়েকটা গিরিপথ আছে; এদের নাম যথাক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে—বোলান্, খাইবার, টোচী, শিপ্কী, জোজীলা, কারাকোরাম, টুজঙ্গাপ, আউ আর টাউঙ্গাপ।

উত্তর ভারতের নদীদের মধ্যে পঞ্চ উপনদী সমেৎ সিন্ধু; যমুনা, শোন ইত্যাদি উপনদী সমেৎ গঙ্গা; আর মেঘনা, পদ্মা সমেৎ ব্রহ্মপুত্র প্রধান। সিন্ধুর পাঁচটি উপনদী—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা আর শতদ্রু, এই পঞ্চনদী বিধৌত দেশের নাম পঞ্জাব (পঞ্চ+অপ)। দাক্ষিণাত্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, (এরা বঙ্গোপসাগরে পড়েছে), নর্ম্মদা আর তাপ্তি (এরা আরব সাগরে পড়েছে) প্রধান।

ভারতবর্ষে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক বাস করে। আগে চীনই এই গৌরবের ভাগী ছিল। ভারতে পৃথিবীর লোক সংখ্যার পাঁচভাগের এক ভাগ বাস, এখানকার লোকসংখ্যা ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮, (?) এর আয়তন ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষে মোটামুটি ১৪৫ জাতের লোক বাস করে। এদেশ কৃষিপ্রধান তাই সারা ভারতে সহরের সংখ্যা মোটে ২,৩১৩ কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ৩,৮৫,৬৬৫। এখানকার লোকেরা প্রায়ই নিরক্ষর; প্রায় ৪০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ২ কোটি লোক কিছু লেখাপড়া জানে; ভারতবর্ষে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ নিরক্ষর লোকের

বাস। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ভারতে প্রায় ১২৫টি ভাষা চলে তার মধ্যে বাঙ্‌লা, হিন্দি, উর্দ্দু, গুজরাটি, মারাঠি, তেলেগু ও তামিল (দাক্ষিণাত্যে) আর পুস্তই (সীমান্ত প্রদেশে) প্রধান। হিন্দিভাষীদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, প্রায় ৭,৮৪,১৪,০০০ ; তার পরেই বঙ্গভাষীদের স্থান, প্রায় ৭,১৫,৩৪,৬৯৫।

ভারতের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা রাস্তা হ'চ্ছে কলিকাতা থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, এটা প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা ; এই রাস্তাটা সারা এসিয়া আর ইয়ুরোপ পার হ'য়ে সটান ফ্রান্সের ক্যালে অবধি গিয়েছে। ভারতে প্রথম রেল চলে ১৮৫৩ সালে বোম্বাই থেকে থানা পর্য্যন্ত। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, দিল্লী আর কাণপুরের রাস্তায় ট্রাম চলে। কলিকাতাই ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর। এখানকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়াম আর চিড়িয়াখানা এসিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়। আগে এখানেই ভারতের রাজধানী ছিল, এখন রাজধানী নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে দিল্লীতে। ভারত সাম্রাজ্য ইংল্যণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে ; তিনি এখানকার কর্তৃত্বের জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেন, তাঁকে গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় বা বড়লাট বলা হয়। রাজনৈতিক হিসাবে ভারতবর্ষকে চারভাগে ভাগ করা হয়—(১) সাক্ষাৎ ইংরাজশাসিত রাজ্য, (২) ব্রিটিশাধীনে দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্য, (৩) অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতির অধিকৃত রাজ্য আর (৪) স্বাধীন রাজ্য। ইংরাজ শাসিত ভারতকে ১৬টি প্রদেশে ভাগ করা হ'য়েছে, এর মধ্যে ১১টি এক একজন গভর্ণরের অধীনে আর ৫টি এক একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে। প্রত্যেক প্রদেশ আবার বিভাগ ও জেলায় বিভক্ত। দেশীয় রাজ্যগুলিতে এক একজন অধিপতি আছেন ; তাঁরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে রাজ্য শাসন করেন। এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে কাশ্মীর আর জম্মু রাজ্যই সব চেয়ে বড় এখানে মুসলমান জনসংখ্যা বেশী

হ'লেও অধিপতি একজন হিন্দু। ঠিক এর উল্টো নিজাম হায়দ্রাবাদে, সেখানকার অধিবাসী প্রায় সবই হিন্দু কিন্তু অধিপতি হ'চ্ছেন মুসলমান। ভারতবর্ষের মধ্যে গোয়া, দমন ও দিয়উ পর্তুগীজদের অধীনে আর মাহে, কারীকল্, পণ্ডিচেরী, ইয়নন্ ও চন্দননগর ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। হিমালয় পাহাড়ের বুকে নেপাল আর ভূটান, এই দুটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য। নেপালের মহারাজাই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজা।

ভারতে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—কলিকাতা (১৮৫৭), বোম্বাই (১৮৫৭), মাদ্রাজ (১৮৫৭), এলাহাবাদ (১৮৮৭), পঞ্জাব (১৮৮২), বেনারস হিন্দু (১৯১৫), আলিগড় মুসলিম (১৯২০), ঢাকা (১৯২০), দিল্লী (১৯২২), নাগপুর (১৯২৩), লক্ষ্ণৌ (১৯২০), আগ্রা (১৯২৭), পাটনা (১৯২৭), অন্ধ্র (১৯২৬), আন্নামালই (১৯১৬), মহীশূর (১৯১৬), ওসমানিয়া (১৯১৮), বিশ্বভারতী (১৯২১) আর নাথিবাঈ দামোদর থাকার্সে মহিলা (১৯৩৬) বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ছাত্র সংখ্যা এখানে সবচেয়ে বেশী।

খনিজপদার্থের মধ্যে অভ্র, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ্, বক্সাইট্, লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, হীরা ইত্যাদি প্রধান। অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। কয়লা আর লোহা উৎপাদনে ভারতের স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয়।

কলিকাতা আর বোম্বাইতে টাকশাল আছে কিন্তু নোট আর ডাক, টিকিট ছাপা হয় নাসিকে।

প্রধান প্রধান কলকারখানার মধ্যে জামসেদপুরের টাটার লোহার কারখানা, বাঙলায় বাটার জুতার কারখানা, ডানলপ টায়ারের কারখানা, কলিকাতার ইলেট্রিকসাপ্লাই কর্পোরেশনের কারখানা, জুটমিলগুলো ও বেঙ্গলকেমিকেলের কারখানা, বোম্বাই ও বাঙলার সুতার কারখানা, ডালমিয়ার সিমেণ্টের কারখানা ইত্যাদি প্রধান।

—* ভারতের প্রদেশ *—

	প্রদেশ	আয়তন, বর্গ মাইলে	রাজধানী	গ্রীষ্মনিবাস	লোক সংখ্যা
	গবর্ণরের অধীনে				
† *	আসাম	৫৫,০১৪	গৌহাটি	শিলং (৪৯০০ ফিট)	৯২,৪৭,৮৫৭
†	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১৩,৫১৮	পেশোয়ার	নাথিয়াগলী	২৪,২৫,০৭৬
† *	উড়িষ্যা	৩২,০০০	কটক	পুরী	৮৫,০০,০০০
	বাঙ্‌লা	৮২,২৭৭	কলিকাতা	দার্জ্জিলিং (৭০০০ ফিট)	৫,০১,২২,৫৫০
† *	বিহার	৬৯,৩৪৮	পাটনা	রাঁচী (২১০০ ফিট)	৪,২০,০০,০০০
† *	বোম্বাই	৭৭,২২১	বোম্বাই	মহাবালেশ্বর (৪৫০০ ফিট)	২,৬৩,৯৮,৯৯৭
	পঞ্জাব	৯৯,২০০	লাহোর	সিমলা (৭০৭৫ ফিট)	২,০৬,৮৫,৪৭৮
† *	মধ্যপ্রদেশ	৯৯,৯২০	নাগপুর	পাঁচমারী (৩৫০০ ফিট)	১,৭৯,৯০,৯৩৭
† *	মাদ্রাজ	১,৪২,৩০০	মাদ্রাজ	উতোকমন্দ (৭২০০ ফিট)	৪,৭০,০০,০০০
† *	যুক্তপ্রদেশ	১,০৭,০০০	লক্ষ্ণৌ	নৈনীতাল (৬৫০০ ফিট)	৪,৮৪,০৮,৭৬৩
*	সিন্ধুপ্রদেশ	৪৬,৩৭৮	করাচী	—	৩৮,৮৭,০৭০
	চীফ কমিশনারের অধীনে				
*	আজমীর	২,৭১১	আজমীর	মাউণ্টআবু (৩০০০ ফিট)	৫,৬০,২৯২
*	কুর্গ	১,৫৯০	মারকারা	—	১,৬৩,৩২৭
*	দিল্লী	৫৭৩	দিল্লী	সিমলা (৭০৭৬ ফিট)	৪,৪৭,০০৯

ভারতের জনবহুল সহর

কলিকাতা—১৪,৮৫,৫৮২	বাঙ্গালোর—৩,০৬,৭৮৯
বোম্বাই—১১,৬১,৩৮০	লক্ষ্ণৌ—২,৭৪,৬৫৯
মাদ্রাজ—৬,৪৭,২৩০	অমৃতসহর—২,৬৪,৮৬০
দিল্লী—৪,৪৭,৪৪২	করাচী—২,৬৩,৫৬৫
হায়দ্রাবাদ (নিজাম) ৪,৪৬,৮৯৪	পুনা—২,৫০,১৮৭
লাহোর—৪,২৯,৭৪৭	কাণপুর—২,৪৩,৭৫৫
আমেদাবাদ—৩,১৩,৭৮৯	আগ্রা—২,২৯,৭৬৪

ঢাকা—১,৩৮,৫১৮

একলক্ষের বেশী লোক আছে এমন সহরের সংখ্যা ৩৫ টি।

ধর্ম্ম হিসাবে জনসংখ্যা

হিন্দু—২৩,৯১,৯৫,০০০ (৬৩%)	শিখ—৪৩,৩৬,০০০ (১·৩%)
মুসলমান—৭,৭৬,৭৮,০০০ (২২·১৬%)	জৈন—২২,৫২,০০০ (·৩৬%)
বৌদ্ধ—১,২৭,৮৭,০০০ (৩·৬%)	পার্শী—১,১০,০০০ (·৩%)
খৃষ্টান—৬২,৯৭,০০০ (১·৮%)	অন্যান্য—৮২,৮০,০০০ (২·১%)

পোষ্টাফিস

ভারতবর্ষে সর্ব্বসাকুল্যে ২৪,১৭৫টি পোষ্টাফিস আছে, প্রতি পোষ্ট-অফিস গড়ে ১৪,০৩৯ জন লোকের জন্য। প্রত্যেক ৩,৯০২টি লোকের জন্য একটি পোষ্ট-বক্স আছে। ভারতে ১০,০১৫ টি টেলিগ্রাম অফিস আছে। প্রত্যেকে প্রায় দুবছরে একখানা ক'রে টেলিগ্রাম করে।

কারখানা

বোম্বাই—১,৫৫০	মাদ্রাজ—১,৫২৭	বাঙ্‌লা—১,৪৩৪
বর্ম্মা—৯৮০	পঞ্জাব—৫২৬	সবশুদ্ধ—৮,১৪৮

সর্ব্বশুদ্ধ ১৫,২৮,৩০২ জন লোক কারখানায় কাজ করে তার মধ্যে ৩৩,৫৯৭ জন ছোট ছেলে ও ৫,৩৭৫ জন ছোট মেয়ে।

শিক্ষা

সারা ভারতবর্ষে ২,৬২,০৬৮ টি শিক্ষায়তন আছে, সবশুদ্ধ ১২৫০,০০০ জন ছাত্র আছে।

শিক্ষার হার—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ৪০ %; বরোদা ৩০ %; বোম্বাই ২২%; বাঙ্‌লা ২০ %; মাদ্রাজ ১৫ %; পঞ্জাব ১৩ %; যুক্তপ্রদেশ ৯ %; বিহার উড়িষ্যা ৭ %।

স্ত্রী-শিক্ষা—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৭ %; বরোদায় ৬ %; বাঙলায় ৪ %।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা

বাঙ্‌লা ৬৬,০০৬; পঞ্জাব ১৩,৪৫৭; মধ্যপ্রদেশ ৫,৩২১; মাদ্রাজ ৫৬,৯৯৩; বোম্বাই ১৬,০১১; আসাম ৬৫১৩; বিহার ও উড়িষ্যা ২৯,৫৯৩ যুক্তপ্রদেশ ২৩,৬৬২; সীমান্তপ্রদেশ ৯৬৮।

ভারতবাসী

ফেলো অব রয়েল সোসাইটি—জগদীশচন্দ্র বসু, রামানুজ, বীরবল সাহ্‌নী, মেঘনাদ সাহা ও সি, ভি রমন।

প্রিভি কাউন্সীলর—লর্ড সিংহ; বি, সি, মিত্র; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী; ডি, এফ, মোল্লা; সাদীলাল; আগা খাঁ; তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও আকবর হায়দরি।

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য—মুন্‌চারচী ভাওয়ান্‌গ্রী, দাদাভাই নৌরজী আর শাপুরজী শাকলাতওলা।

যুক্তরাজ্যের ব্যারণ—কয়েজী জাহাঙ্গীর, জেমসেদজী জিজিভই, চীনুবাই মধালাল আর হোসেন আলী করিমভাই ইব্রাহিম।

ব্রিটিশ রীমের পিয়ার—লর্ড অরুণকুমার সিংহ।

কিংস কাউন্সিলার—ভগবান দীন দুবে।

নোবেল লরিয়েট—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সি, ভি, রমন।

সর্ব্বপ্রথম—

ভারতীয় প্রাদেশিক লাট—লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

ভারতীয় র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

ভারতীয় আই, সি, এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় আই, সি, এসে প্রথম—অতুল চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় ব্যারিষ্টার—জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় নোবেল লরিয়েট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় এফ, আর, এস—জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতীয় জেলা জজ—দিগম্বর মিত্র।

ভারতীয় কে, সি, এস্, আই—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

প্রিভি কাউন্সীলের ভারতীয় সভ্য—সৈয়দ আমীর আলী।

পার্লামেণ্টের ভারতীয় সভ্য—দাদাভাই নৌরজী।

ভারতীয় বিলাত যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়।

ভারতীয় এরোপ্লেনযুদ্ধে যোগদানকারী—ইন্দ্রলাল রায়।

ভারতীয় ভিক্টোরিয়া-ক্রস ধারী—সুবাদার খোদাদাদ খাঁ।

ভারতীয় অস্ত্রোপচারকারী—মধুসূদন গুপ্ত।

ভারতীয় মিলিটারী-ক্রস ধারী—কল্যাণকুমার গুপ্ত।

অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় অধ্যাপক—সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ।

সামরিক বিভাগের ভারতীয় ডাক্তার—গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী।

হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনকারী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ভারতে হাফটোন ব্লক প্রচারকারী—উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইংরাজ—কর্পোরাল ব্লেক্ (২১।১০।১৮৭৪)।

ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র—সমাচার দর্পণ (বাঙ্লা)।

প্রথম সংবাদপত্র—হরকরা (ইংরাজী)

সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় মহিলা—

কংগ্রেস সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।

চিকিৎসক—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

বিলাত যাত্রী—কুমারী অরু ও তরু দত্ত আর চন্দ্রলেখা বসু।

এরোপ্লেন যাত্রী—মৃণালিনী সেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ—চন্দ্রমুখী বসু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার—বিভা মজুমদার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি—প্রভাবতী দাসগুপ্তা।

অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সীলার—সরোজিনী দে।

বাঙলায় সর্ব্বপ্রথম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—উইলিয়াম কনভাইণ্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলার—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—চিত্তরঞ্জন দাস।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—বার্নেস পিকক্।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভারতীয় বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়।

কলিকাতার ভারতীয় সেরিফ—দিগম্বর মিত্র।

গত মহাযুদ্ধে যোগদানকারী—যোগেন্দ্রনাথ সেন।

এঞ্জিনিয়ার—নীলমণি মিত্র।

নাইট—চন্দ্রমাধব ঘোষ।

ডিরেক্টর জেনারেল, পোষ্টস্ ও টেলিগ্রাফস্—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।

সার্জ্জন জেনারেল—মন্মথনাথ চৌধুরী।

বেলুন যাত্রী—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়া-ক্রশ ধারী—ইন্দ্রলাল রায়।

বাঙ্‌লা ভাষায় ছাপা বই—পর্ত্তুগীজদের ছাপা "কৃপার অর্থশাস্ত্র", এই বইটা রোমান অক্ষরে ছাপা।

বাঙ্‌লা অক্ষরে ছাপা বই—হ্যালহেডের বাঙ্‌লা ব্যাকরণ।

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে—

বড় সহর—কলিকাতা।

বড় প্রদেশ—মাদ্রাজ।

বড় জেলা—ভিজাগপত্তম।

বেশী অন্ধলোক—আজমীরে।

লোক বহুল প্রদেশ—বাঙ্‌লা।

কম লোকবহুল প্রদেশ—বেলুচিস্থান।

লোকবহুল জেলা—ময়মনসিংহ।

বেশী বিধবা—বাঙলায়।

কম মৃত্যুহার—আসামে (২৩·৮%)।

বেশী মৃত্যুহার—মধ্যপ্রদেশে (৩৩·৪%)।

পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—মাদ্রাজে।

পুরুষের তুলনার স্ত্রীলোকের সংখ্যা সবচেয়ে কম—পঞ্জাবে।

বেশী গরম জায়গা—বেলুচিস্থানের সিবি (১৩৬°)।

বড় দেশীয় রাজ্য—কাশ্মীর রাজ্য।

লোকবহুল দেশীয় রাজ্য—নিজাম হায়দ্রাবাদ।

শিক্ষিত লোকবহুল রাজ্য—ত্রিবাঙ্কুর (৪০%)।

*বড় পাহাড়—হিমালয়, দেড় হাজার মাইল লম্বা।

*উঁচু গিরিশৃঙ্গ—এভারেষ্ট; ২৯০০২ ফিট।

লম্বা নদী—সিন্ধু, ১৭০০ মাইল।

বড় জলপ্রপাত—ধোঁয়াধার (জব্বলপুর)।

উঁচু জলপ্রপাত—মোস্‌মাঙ্গ (আসাম), ১৯০০ ফিট।

*বেশী বৃষ্টিপাত হয়—চেরাপুঞ্জীতে (আসাম)।

বড় হ্রদ—উলার (কাশ্মীর)।

লম্বা রাস্তা—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত, ১৫০০ মাইল।

*লম্বা রেলের প্লাটফর্ম্ম—শোনপুর ষ্টেশনের (বি, এণ্ড, এন, ডব্লু আর) ১৪১৫ ফিট।

লম্বা রেল লাইন—এন, ডব্লু, আর।

পুরোণো রেল লাইন—জি, আই, পি, আর।

লম্বা রেলের সেতু—শোন ব্রীজ (ই, আই, আর), ১০,৫৫২ ফিট।

বিখ্যাত সেতু—হার্ডিঞ্জ ব্রীজ (ই, বি, আর)।

*বড় ভাসমান সেতু—হাওড়া ব্রীজ (কলিকাতা)।

লম্বা ও উঁচুতে রেলের সুড়ঙ্গ—খোজাক টানেল (এন, ডব্লু, আর) বেলুচীস্থান ; ২॥০ মাইল লম্বা আর ৬৪০৺ ফিট উঁচুতে।

*উঁচু জায়গায় লোকের বসতি—কাশ্মীরের কাছে লাডাকে।

বড় বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা।

*বড় মন্দির—সেরিঙ্গাপত্তমের।

বড় মসজিদ—তাজ্‌উল মসজিদ (ভূপাল)।

*সুন্দর বাড়ি—তাজমহল (আগ্রা)।

*বড় গম্বুজ—গোল গম্বুজ(বিজাপুর)।

*বড় বারান্দা—রামেশ্বরের দেবমন্দিরের (দাক্ষিণাত্য)।

*বড় চৈত্যবিহার—কাড়্‌লা (বোম্বাই)।

উঁচু স্তম্ভ—কুতুবমিনার (দিল্লী), ২৩৮ ফিট।

*বড় জলের বাঁধ—লয়েড বাঁধ (সিন্ধু)।

উঁচু জলের বাঁধ—বোম্বাইএর কাছে ভাণ্ডার ডায়ার উইলসন ড্যাম ; ২৭৫ ফিট উঁচু।

বড় কারখানা—টাটা আয়রণ ফ্যাক্টরী (জামসেদপুর)।

*বড় জলের ট্যাঙ্ক—টালা (কলিকাতা)।

বড় ম্যুজিয়াম—ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়াম (কলিকাতা)।

বড় চিড়িয়াখানা—কলিকাতার।

বড় মাছের চিড়িয়াখানা—মাদ্রাজ একোয়ারিয়াম।

বড় মেলা—হরিহর ছত্র (শোনপুর)।

* পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে।

ভূগোল

তোমরা শুনেছো যে পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল, আরও জেনেছো যে পৃথিবী যে কল্পিত রেখার ওপর দিনে একবার ক'রে ঘোরে তার নাম পৃথিবীর মেরুদণ্ড ; মেরুদণ্ডটা যে তু' বিন্দু দিয়ে পৃথিবী ফুঁড়ে বেরিয়েছে তাদের বলা হয় মেরু বিন্দু, উত্তর আর দক্ষিণ মেরু বিন্দুর নাম যথাক্রমে
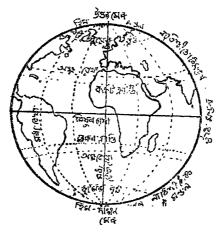
সু-আর কুমেরু বিন্দু। স্থান নির্দ্দেশের সুবিধার জন্য পৃথিবীর গায়ে অনেকগুলো রেখা কল্পনায় টানা হয়। তুই মেরু বিন্দু থেকে সমান দূরে পৃথিবীকে ঠিক মাঝামাঝি ভাগ ক'রে একটা গোল রেখা টানা হয়, তার নাম বিষুবরেখা। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য ঠিক বিষুবরেখার মাথার ওপর আসে, এজায়গায় তাই ভয়ঙ্কর গরম। তুই মেরু বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত অনেকগুলো গোল বৃত্ত পৃথিবীর গায়ে টানার কল্পনা করা হয়, এদের বলা হয় অক্ষরেখা আর ঠিক এদের সঙ্গে সমকোণ ক'রে

দুই মেরু বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আরও একপ্রস্থ বৃত্ত টানা হয়, এদের নাম মধ্যরেখা। তোমরা জান জ্যামিতিতে একটা বৃত্তের পরিধিকে ৩৬০টা সমান ভাগ ক'রে তার এক একটা ভাগকে বলা হয় এক একটা ডিগ্রী ; তেমনি যে কোন একটা মধ্যরেখা আর একটা অক্ষরেখাকে ৩৬০টা সমান ভাগ ক'রে তার প্রত্যেক ভাগের মধ্যে দিয়ে যথাক্রমে যে অক্ষরেখা যে মধ্যরেখা যাবে তাদের তত ডিগ্রির রেখা বলা হয়। বিষুবরেখা ০° ডিগ্রীর অক্ষরেখা বা নিরক্ষরেখা, এর উত্তরের অক্ষরেখাদের যথাক্রমে ০° থেকে ৯০° উঃ অক্ষরেখা বলা হয়, তেমনি এর দক্ষিণের অক্ষরেখাদের ০° থেকে ৯০° দঃ অক্ষরেখা বলা হয। ইংল্যণ্ডের গ্রীনউইচ্ সহরের ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা গিয়েছে তাকে ধরা হয় ০° মধ্যরেখা, এর পূর্ব্বের মধ্যরেখাগুলোকে যথাক্রমে ০° থেকে ১৮০° পূঃ মধ্যরেখা ও পশ্চিমের মধ্যরেখাগুলোকে ০° থেকে ১৮০° পঃ মধ্যরেখা বলা হয়। মেরুবিন্দু থেকে ১৬৩১ মাইল দূরের অক্ষরেখা দুটোর নাম সু ও কুমেরুবৃত্ত ; মেরুবৃত্ত দিয়ে ঘেরা জায়গার নাম মেরু প্রদেশ বা হিমমণ্ডল, এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বিষুবরেখা থেকে ১৬১৪ মাইল উত্তরে আর দক্ষিণের অক্ষরেখার নাম যথাক্রমে কর্কট ও মকর ক্রান্তি। সূর্য্যের গতিবিধি দুই ক্রান্তি পর্য্যন্ত ; এই দুই ক্রান্তির মধ্যেকার জায়গার নাম উষ্ণমণ্ডল, এখানে ভয়ঙ্কর গরম। মেরুবৃত্ত ও ক্রান্তি দিয়ে ঘেরা জায়গার নাম নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এখানে ঠাণ্ডাও বেশী নয় গরমও কম। কোন জায়গার স্থান নির্দ্দেশ ক'রতে হ'লে সেখান দিয়ে কোন অক্ষরেখা ও মধ্যরেখা গিয়েছে তাই বল্লেই হ'বে। কলিকাতার অবস্থান ২২·৩° উঃ (অক্ষরেখা) ও ৮৮·২° পূঃ (মধ্যরেখা)। মধ্যরেখার এক ডিগ্রী দেশান্তরে চার মিনিটের সময়ের প্রভেদ হয়, পূর্ব্বদিকে বাড়ে আর পশ্চিমদিকে কমে।

যখন কলিকাতায় বেলা বারোটা তখন অন্যান্য জায়গায় কটা বাজে—

এথেন্সে (গ্রীস) সকাল ৮-৬ ; কাইরোতে (মিশর) সকাল ৮-৬ ; টোকিওতে (জাপান) বেলা ৩-৬ ; নিউইয়র্কে (আমেরিকা) রাত ১-৬ ; বার্লিনে (জার্ম্মাণী) সকাল ৭-৬ ; লণ্ডনে (ইংল্যাণ্ড) সকাল ৬-৬ ; সীডনীতে (অষ্ট্রেলিয়া) বেলা ৪-৬ ; হংকংএ (চীন) বেলা ২-৬ ।

তোমরা যেখানে বাস কর সেখানে চারধারেই ডাঙ্গা, জলভাগ খুবই কম, দুএকটা পুকুর আছে, খালবিল আছে, বড় জোর দু' একটা নদী নালা আছে। এ সব জায়গায় স্থলভাগের তুলনায় জলভাগের আয়তন অনেক কম ; কিন্তু গোটা পৃথিবীটা একসঙ্গে ধ'রলে দেখা যায় স্থল-ভাগের তুলনায় জলভাগ অনেক বেশী, প্রায় দু' গুণ। পৃথিবীটা প্রায় জলে ঢাকা তার মাঝে কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ মাথা তুলে আছে, এদের বলা হয় মহাদেশ। সারা পৃথিবীর আয়তন ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গ মাইল ; এর মধ্যে জল ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গ মাইল আর মোট ৫৭,৫১০,০০০ বর্গ মাইল হ'চ্ছে স্থল। এই বিরাট জলরাশিকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়—প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আতলান্তিক মহাসাগর আর সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর। এদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সব চেয়ে বড় আর গভীর ; কুমেরু মহাসাগর সব চেয়ে ছোট। দুই মেরু-মহাসাগরের অনেকখানিই সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। সমুদ্রের তলদেশ অত্যন্ত অসমান, এখানেও অনেক ডুবো পাহাড় পর্ব্বত আছে। যতদূর জানা গেছে জাপান আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে মিণ্ডিয়ানা নামে এক জায়গায় প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা সবচেয়ে বেশী (৩৪,৪৬১ ফিট), এখানে হিমালয়ের এভারেষ্টের চূড়োটাকে ডুবিয়ে দিলেও ওপর দিকে যে জায়গা থাকে সেখানে পরেশনাথের

পাহাড়টা স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন ক'রে থাকৃতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সাগরের জল নোনা; কিন্তু অনেকদিন আগে সাগরের জলে নুন ছিল না যত নুন ছিল মাটিতে মিশে, নদনদীরা এই সব নুন ধুয়ে যুগযুগ ধ'রে সাগরে এনে ফেলছে, তাই সাগরের জল দিন দিন নোনা হ'য়ে উঠছে।

তোমরা জানো গ্রহ উপগ্রহ সকলে সকলকে টানছে। চাঁদও পৃথিবীকে টানে, এই টানের চোটে সাগরের বুকের জল ফেঁপে ফুলে ওঠে তখন মনে হয় জল বেড়েছে, জল বাড়ার নাম জোয়ার আর যখন টান ক'মে জল সমান হ'য়ে আসে তখন বলা হয় ভাঁটা হ'য়েছে। সাগরের সঙ্গে সঙ্গে নদনদীতেও জোয়ার ভাঁটা হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই নদী দেখেছো। কুল কুল ক'রে জল দিন রাত ব'য়ে চ'লেছে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। নদীর উৎপত্তি কোন পাহাড়ের বুকের ঝরণা থেকে না হয় অন্য কোন নদনদী বা হ্রদ থেকে। উৎপত্তিস্থান থেকে যাত্রা ক'রে নদী ক্রমাগতই নীচু দিকে গড়িয়ে চলে। কত দেশ বিদেশ, পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গল, সহর গ্রাম পার হ'য়ে অবশেষে কোন সাগর কিম্বা হ্রদে গিয়ে মেশে। যেখানে নদী শেষ হয় সেখানকে বলা হয় নদীর মোহনা। নীচে বিভিন্ন মহাদেশের কয়েকটা বিখ্যাত নদীর নাম দেওয়া হ'লো,—

অবস্থান	নদীর নাম	কোথায় এসে প'ড়েছে	কত মাইল লম্বা
আমেরিকা	মিসিসিপিমিশৌরী	মেক্সিকো উপসাগর	৪২২১
”	আমাজোন	আতলান্তিক মহাসাগর	৪০০০
ইয়ুরোপ	ভল্গা	কাস্পিয়ান সাগর	২৪০০
”	দানিয়ুব	কৃষ্ণ সাগর	১৭১৫
এসিয়া	ইয়াংসিকিয়াং	প্রশান্ত মহাসাগর	৩৪০০

অবস্থান	নদীর নাম	কোথায় এসে প'ড়েছে	কত মাইল লম্বা
এসিয়া	সিন্ধু	আরব সাগর	১৭০০
”	ব্রহ্মপুত্র	বঙ্গোপসাগর	১৬৮৮
”	গঙ্গা	”	১৫০০
আফ্রিকা	নীলনদী	ভূমধ্য সাগর	৩৬০০
”	নাইগার	গিনি উপসাগর	৩০০০

আমাজোন নদী যেখানে আতলান্তিক মহাসাগরে এসে প'ড়েছে সেখানে একশো মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল মিষ্টি, লোনা নয়। সুদানের কাছে খার্ত্তুমে একই নীল নদীর বুকের ওপর দিয়ে দুরঙের দুটো নদীর জল প্রবাহ ব'য়ে চ'লেছে, একটার জল শাদা ও আর একটার জল নীল, দুটোর জোড় বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদী চীন ও তিব্বতে ৎসাংপো নামে পরিচিত; আসামে এর নাম ডিহিং।

যেমন সাগরের মাঝে থাকে দ্বীপ তেমনি ডাঙ্গার বুকে থাকে হ্রদ। হ্রদের চারদিকেই স্থল। যে হ্রদে অন্যান্য নদী এসে পড়ে কিন্তু কোন নদীই তার থেকে বেরিয়ে যায় না, সেই সব হ্রদের জল অত্যন্ত লোনা, প্যালেষ্টাইনের ডেডসীর জল এত লোনা ও ভারী যে সেখানে কাঠকুঠো মানুষ ইত্যাদি কিছুই সহজে ডুবতে চায় না; এখানে সাঁতার কাটতে ভারী মজা নয় কী? হিমালয়ের বুকে অনেক ছোট ছোট হ্রদ আছে, এদের মধ্যে মানসসরোবরের নাম বোধহয় তোমরা শুনেছ। ভারতের সমতল ভূমির ওপরকার হ্রদের মধ্যে চিল্কা হ্রদই প্রসিদ্ধ; তবে এর সঙ্গে সমুদ্রের সাক্ষাৎ যোগ আছে তাই একে হ্রদ বলা চলে কিনা বিবেচ্য।

জলে যেমন মহাসাগর স্থলে তেমনি মহাদেশ; জলে সাগর স্থলে দেশ, জলে উপসাগর স্থলে অন্তরীপ, জলে দ্বীপ স্থলে হ্রদ, জলে প্রণালী স্থলে যোজক। সারা পৃথিবীর স্থলভাগকে ছটা মহাদেশে ভাগ করা হ'য়েছে

—এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আর ওসেনিয়া। এদের মধ্যে এসিয়া আর ইয়ুরোপ একেবারে জোড়া লাগানো; দুটো আমেরিকা আর এসিয়া ও আফ্রিকা আগে পানামা আর সুয়েজ এই দুই যোজক দিয়ে জোড়া ছিল কিন্তু জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য এখন এদের কেটে প্রণালী ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। মহাদেশদের মধ্যে এসিয়াই সবচেয়ে বড় (১,৭০,৭৪,০৫০ বর্গ মাইল), পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের বাস এখানে। সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে এসিয়াতেই, সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদের জন্মস্থান এই মহাদেশ। এসিয়ার পরে আয়তনে আফ্রিকার স্থান (১,১৫,২১,৫৩০ বর্গ মাইল), কিন্তু এই মহাদেশ সবচেয়ে অশিক্ষিত ও অনুন্নত, সারা দেশটাই বনজঙ্গল আর মরুভূমিতে ভর্ত্তি, প্রায় সমস্ত আফ্রিকাটাই বিদেশীয়দের হস্তগত। এর পরে উত্তর আমেরিকা (৯২,৯৪,৩৩০ বর্গমাইল) ও দক্ষিণ আমেরিকা (৬৮,১৭,৩৯০ বর্গমাইল); দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাজ্যগুলোতেই সাধারণতন্ত্র প্রচলিত, একে বলা হয় "ল্যাটিন আমেরিকা।" ইয়ুরোপ মহাদেশ আকারে (৫৮,৬৪,৭৪০ বর্গ মাইল) ছোট হ'লেও সভ্যতায় সর্ব্বশীর্ষ, পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গাই ইয়ুরোপীয়ানদের হস্তগত। অষ্ট্রেলিয়া সব চেয়ে ছোট মহাদেশ (৩৪,৫০,২২০ বর্গ মাইল), এটা একটা অদ্ভুত জায়গা, বহুদিন অন্যান্য মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় এখানে এমন সমস্ত গাছপালা, জীবজন্তু দেখা যায় তা অন্যান্য মহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গোটা মহাদেশটাই বৃটিশ-রাজের অধীনে।

এই সমস্ত মহাদেশগুলোকে আবার রাজনৈতিক বিভাগ অনুসারে নানান দেশে ভাগ করা হ'য়েছে। নীচে মহাদেশানুক্রমে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোর পরিচয় দেওয়া হ'লো।

	দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
	ইয়ুরোপ			
	অষ্ট্রিয়া	ভিয়েনা	জার্ম্মাণীর শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত	১,৫,০০,০০০
*	আইসল্যাণ্ড	রাইজ্‌ডাক্	রাজা ১০ম ক্রিশ্চিয়ানা	১,০০,০০০
‡	আইরীশ ফ্রি ষ্টেট	ডাবলিন	প্রেসিডেণ্ট ডি'ভ্যালেরা	২৯,৭১,৯১২
‡	আণ্ডোরা	আণ্ডোরা-ভিসেলা		৫,৫০০
*	আলবেনিয়া	ডুরাজো	রাজা ২য় যুগো	১৫,০০,০০০
*	ইটালী	রোম	রাজা ভিক্টর্ ঈম্যানুয়েল্	৪,৩৩,১৬,০০০
†	এস্থোনিয়া	ট্যালিন্	প্রেসিডেণ্ট কন্‌ষ্টাটিন	১১,২৬,৫০০
*	গ্রীস	এথেন্স	রাজা ২য় জর্জ্জ	৬৩,৯৭,০০০
*	গ্রেটবৃটেন	লণ্ডন	সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জ্জ	৩,৯০,৪৭,৯৩১
†	চেকোশ্লোভাকিয়া	প্রাগ	প্রেসিডেণ্ট মাসারিক্	১,৩৬,০০,০০০(?)
†	জার্ম্মাণী	বার্লিন	প্রেসিডেণ্ট ফয়ার্‌হ্বর্ হিট্‌লার্	৬,৩৭,৫০,০০০
*	ডেনমার্ক	কোপেন্‌হেগেন্	রাজা ১০ম ক্রিশ্চিয়ানা	৩৫,৫০,৬৫৫
†	তুরস্ক	ইস্তাম্বুল	প্রেসিডেণ্ট ইসমেত ইনেনু	১,৬১,৮৮,৫০০
*	নরওয়ে	অসলো	রাজা ৭ম হ্বকন্	২৮,১৪,৯১৪
*	নেদারল্যাণ্ড	হেগ্	সাম্রাজ্ঞী উইল্‌হেল্‌মিনা	৭৯,৩৬,০০০
†	পর্ত্তুগাল	লিস্‌বন্	প্রেসিডেণ্ট কার্‌মোণা	৬৩,৬০,৩৪৭
†	পোল্যাণ্ড	ওয়ার্স	প্রেসিডেণ্ট মস্কী	৩,১৮,২৭,৫৭০
†	ফিন্‌ল্যাণ্ড	হেলিসিঙ্কি	প্রেসিডেণ্ট স্বইন্ হুরুডাট্	৩৬,৫৮,১২৫
†	ফ্রান্স	প্যারী	প্রেসিডেণ্ট লেব্রঁা	৪,১০,০০,০০০
*	বেলজিয়াম	ব্রুসেল্‌স	রাজা ৩য় লিওনার্ড	৮১,৫৯,১৮৫

সন্ধানীঃ—

ভূমণ্ডলে ব্রিঃ সাম্রাজ্য ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য পথ।

আফ্রিকা

প্রশান্ত মহাসাগর

দক্ষিণ আমেরিকা

ভারত মহাসাগর

কর্কট ক্রান্তি

মকর ক্রান্তি

লণ্ডন

কেপটাউন

নিউজীলণ্ড

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
* বুলগেরিয়া	সোফিয়া	জার্ বরিস্	৫৪,৭৮,৭৪২
* ভ্যাটিক্যান্ ষ্টেট্	ভাটিকান	পোপ ১০ম পায়াস্	১,০২৫
o মনাকো	মনাকো	প্রিন্স ২য় লুই	২৪,৯৫০
* যুগোশ্লাভিয়া	বেল্‌গ্রেড	রাজা ২য় পিটার	১,৫০,০০,০০০
† রুমানিয়া	বুখারেষ্ট	প্রিন্স ক্যারল	১,৮০,২৫,২৩৭
† রুশিয়া	মস্কো	প্রেসিডেন্ট ষ্টালিন্	১৬,২০,০০,০০০
* লাক্সেম্‌বার্গ	লাক্সেম্‌বার্গ	গ্রাণ্ড্ ডাচেস্ চ্যারোলেট্	২,৯৯,৯৯৩
o লিচেষ্টাইন্	ভাডুজ	প্রিন্স্ ফ্রান্সিস্	১,০৫,০০০
† লিথুনিয়া	কব্‌লো	প্রেসিডেণ্ট্ স্মীটন	২২,৮৬,০০০
† ল্যাট্‌ভীয়া	রিগা	প্রেসিডেণ্ট্ এলবার্ট ভেসিয়েস্	১৯,০০,০৪৫
† সান্‌মেরিনো	সান্‌মেরিনো		১০,৯৫০
† সুইজারল্যাণ্ড	বার্নে	প্রেসিডেণ্ট্ মোট্টা	৪০,৬৬,৪৪০
* সুইডেন্	ষ্টক্‌হল্‌ম্	রাজা গুস্তাফাঁ	৬১,৬২,৪৪৬
† স্পেন	মাদ্রিদ	ঠিক নাই	২,৪০,২৭,২৭৩(?)
হল্যাণ্ড	নেদারল্যাণ্ড দেখ		
† হাঙ্গারী	বুদাপেস্ত	এড্‌মিরাল হর্ত্তি	৮৬,৮৮,৩১৯

এসিয়া

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
* আফগানীস্থান	কাবুল	রাজা জাহীর শাহ	১২,০০,০০০
* ইরাক্	বাগদাদ্	রাজা গাজী	৩০,০০,০০০
† চীন	নানকিং	প্রেসিডেণ্ট লিং সেং	৪১,৪০,১১,৫১৯
* জাপান	টোকিও	রাজা মিকাডো	৯,০০,০০,০০০
* নেপাল	কাঠমুণ্ড	মহারাজা বীরবিক্রম	৫৬,১০,০০০

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
* পারস্য	তেহরাণ্	রাজা পহ্লবী	১,০০,০০০
‡ প্যালেষ্টাইন্	জেরুজেলাম্	হাইকমিশনার ওয়াচোফ্	১১,৭১,০০০
‡ ভারতবর্ষ	দিল্লী	ভাইসরয় লর্ড লিন্লিথগো	
* ভুটান	লাসা	মহারাজা ওয়াংচু	২,৫০,০০০
* তিব্বত	লাসা	দলাইলামা	২০,০০,০০০
* মাঞ্চুকো	চাংচু	রাজা হেন্রী পুই	১,৬০,০০০
* শ্যাম	ব্যাঙ্কক্	রাজা আনন্দমহীদল	১,০০,০০,০০০
‡ সিংহল	কলম্বো	গবর্ণর স্যর কাল্ডেকট্	৫৪,২৭,০০০

উত্তর আমেরিকা

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
‡ কানাডা	অটোয়া	ভাইস্রয় লর্ড টুইড্স মুইর	১,৩৩,৭৬,৮৭৬
† মেক্সিকো	মেক্সিকো	প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস্	১,৬৫,২৪,৬৩৯
‡ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড্	সেণ্ট্ জন্স্	গভর্ণর ওয়ালউইন	২,৬৪,০৮৯
† যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক	প্রেসিডেণ্ট রুজ্ভেল্ট	১২,৩০,০০,০০০

মধ্য আমেরিকা

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
† কষ্টারিকা	সান্জোস্	প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তেজ্	২৫,০০,০০০
† গুয়াটেমালা	গুয়াটেমালা	প্রেসিডেণ্ট উবিকো	৫,০০,০০০
† নিকারগুয়া	মানাগুরু	প্রেসিডেণ্ট জার্কিন্	৭,০০,০০০
† পানামা	পানামা	প্রেসিডেণ্ট আরেস্মানা	৪,৫০,০০০
† সাল্ভাডর্	সান সাল্ভাডর্	প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্সিমিলার	১৭,০০,০০০
† হণ্ডুরাস্	টেগুল্ সিগার্পা	প্রেসিডেণ্ট অ্যাগুিলো	১৭,৪৩,৪০৮

দক্ষিণ আমেরিকা

দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
† আর্জ্জেণ্টাইন্	বুঁয়ো এঁরো	প্রেসিডেণ্ট জাষ্টো	১,২০,০০,০০০
† উরাগে	মণ্টেভিডিও	প্রেসিডেণ্ট টেরা	১৮,০৮,০০০

	দেশ	রাজধানী	শাসকের নাম ও পদবী	লোকসংখ্যা
†	ইউকাডোর	কুইটো	প্রেসিডেণ্ট ডায়াজ	১,৭০,০০,০০০
†	কলাম্বিয়া	বগোটা	প্রেসিডেণ্ট লোপেজ	৮০,০০,০০০
†	চিলি	সান্টিয়াগো	প্রেসিডেণ্ট আলেজান্দ্রি	৪২,৭৬,৪১১
†	পেরু	লিমা	প্রেসিডেণ্ট বেনাভাইডস্	৫৫,০০,৫০০
†	প্যারাগুয়া	আলাকুন্সাও	প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কো	
†	বলিভিয়া	লাপাজ্	প্রেসিডেণ্ট টরো	৩০,০০,০০০
†	ব্রাজিল	রিওডি-জেনেরিও	প্রেসিডেণ্ট ভার্গো	৪,৩০,০
†	ভেঞ্জুলা	কারাকাস	প্রেসিডেণ্ট কণ্টে্রাস	
	আফ্রিকা			
+	আবিসিনিয়া	আদিস্ আবাব্বা		১,০০,০০,০০০
‡	ইউনিয়ন্ অব সাউথ আফ্রিকা	প্রিটোরিয়া	গভর্ণর ডাঙ্কান্	৭০,০০,০০০
§	মরক্কো	ফেজ	সুলতান মৌলাই মহম্মদ	৫০,০০,০০০
‡	রোডেসিয়া	সালিস্‌বারী	গবর্ণর ষ্টান্‌লী	
*	মিশর	কাইরো	রাজা ফারুক	১,৪১,৬৮,৭৬৫
†	লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া	প্রেসিডেণ্ট কিং	২৫,০০,০০০
	ওসেনিয়া			
‡	অষ্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	গভর্ণর ডিউক্ অব কেণ্ট	৬৬,৭৭,০০০
‡	নিউজীল্যাণ্ড	ওয়েলিংটন্	গভর্ণর গ্যালওয়ে	১,৭৪,০২৬
‡	ফিজি	সুভা		১,৯৪,৪৪৯

[* রাজতন্ত্র ; † সাধারণ তন্ত্র ; o প্রিন্সিপ্যালিটি ; ‡ বৃটিশ রাজ্য ; § ফরাসী রাজ্য ; + ইতালীয় রাজ্য]

সম্প্রতি কতকগুলো দেশের জায়গার নাম বদলে গেছে, তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো এখানে দেওয়া হ'লো।

পুরোণো	নতুন	পুরোণো	নতুন
আঙ্গোরা	আঙ্কারা	মাঞ্চুরিয়া	মাঞ্চুকো
কুইন্‌স্ টাউন	কব্	নিজনিনোভাগোর‍্ড	গর্কী
(আয়র্ল্যণ্ড)		(রাশিয়া)	
কনষ্টান্টিনোপল	ইস্তাম্বুল্	ডুজ্‌দাপ	জাহীদান্
(তুরস্ক)		পারস্য	ইরাণ
ক্রিশ্চিয়ানা	অসলো	পিকিং	পিপিং
(নরওয়ে)		মেসোপটেমিয়া	ইরাক্
মস্কো	লেনিনগ্রেড	সেণ্টপিটার্স্‌বার্গ	পেট্রোগ্রে

রাশিয়া—ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েট সোসিয়ালেষ্ট রিপাবলিক (ইউ, এস, এস, আর)।

লোকে কতকগুলো দেশ ও জায়গাকে তাদের গুণ বা অবস্থান বাচক নাম দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কতকগুলোর কথা এখানে দেওয়া গেল।

আফ্রিকা—"কুসংস্কার পূর্ণ মহাদেশ"; ইংল্যাণ্ড—"দোকানদারের আড়ৎ"; কলিকাতা—"প্রাসাদপুরী"; গিনিকোষ্ট—"শ্বেতাঙ্গের সমাধি"; জাপান—"সূর্য্যোদয়ের দেশ"; তাঞ্জোর—"দাক্ষিণাত্যের উদ্যান"; তুরস্ক—"ইয়ুরোপের রোগশয্যা"; নরওয়ে—"মাঝ-রাতের সূর্য্যের দেশ"; পঞ্জাব—"পঞ্চনদীর দেশ"; পামীর—"পৃথিবীর ছাদ"; বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী—"অশ্রুদ্বার"; বেলজিয়াম—"ইয়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্র"; বোম্বাই—"ভারতের দুয়ার"; মিশর—"নীল নদের দান"; রোম—"সাত দেওয়ালের সহর"; লক্ষ্ণৌ—"বাগানের সহর"; সুইজর‍্ল্যাণ্ড্—"ইয়ুরোপের খেলার মাঠ"।

কতকগুলো দেশের নিজের নিজের ভাষায় তাদের জাতীয় নাম দেওয়া যাচ্ছে—

ইংরাজী নাম	জাতীয় নাম	ইংরাজী নাম	জাতীয় নাম
	অষ্ট্রারাইখ্	পারশ্য	ইরাণ
আয়র্ল্যাণ্ড	আয়ার্	পোল্যাণ্ড্	পোল্স্কা
ইজীপ্ট্	মিশর	ফিনল্যাণ্ড্	সুয়োমী
ইণ্ডিয়া	ভারতবর্ষ	ব্যাভেরিয়া	বেয়ার্ন্
এস্থোনিয়া	ঈষ্টি	বেলজিয়াম	লা বেলজিক
গ্রীস্	হেলাজ	লিথুনিয়া	লাইটুনিয়া
চীন	চুংকুও	সুইজর্‌ল্যাণ্ড্	হেলভেসিয়া
চেকোশ্লাভাকিয়	শ্লেস্কোশ্লেভে	স্পেন্	এস্পানা
জাপান	নিপ্পন্	হল্যাণ্ড্	নেদার্‌ল্যাণ্ড্
জার্ম্মাণী	ডয়েট্‌স্‌ল্যাণ্ড	হাঙ্গারী	ম্যাগ্‌গীয়ার
নরওয়ে	নর্‌জে		অরৎসীয়গ

নানাদেশের নানা রকমের জাতীয় চিহ্ন আছে, তাদের বিবরণ কিছু দিচ্ছি—

অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু, আয়র্ল্যাণ্ডের স্যামারক্ পাতা, ইতালির শ্বেতপদ্ম, ইংল্যাণ্ডের গোলাপ ফুল, ওয়েল্‌সের ডাফোডিল ফুল, ক্যানেডার ম্যাপেল পাতা, গ্রীসের ভায়োলেট ফুল, জার্ম্মাণীর কর্ণ ফুল, জাপানের চন্দ্রমল্লিকা ফুল, পারস্যের গোলাপ ফুল, ভারতের পদ্ম, মেক্সিকোর মনসাগাছ, স্কটল্যাণ্ডের থিস্‌ল্ কাঁটা, স্পেনের ডালিম ফুল।

যে সব দেশে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র প্রচলিত সেই সব দেশে রাজ্য-শাসন পরিচালনা করে এক একটা সভা, এর সভ্যেরা জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়; এক এক দেশে এই সভার এক এক নাম, এদের কতকগুলো নাম দেওয়া গেল—

আইসল্যাণ্ডে—"অল্‌থিং", আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—"কংগ্রেস", আয়র্লণ্ডে—"ডেল্ এরিয়েন্", ইতালিতে—"সেনেট্", ইংল্যাণ্ডে—"পার্লামেণ্ট্",

জাপানে—“ডিয়েট্”, জার্ম্মাণীতে—“রাইখ্ষ্ট্যাগ্”, ডেন্মার্কে—“রিগ্স্‌ডাগ্”, তুরস্কে—“গ্র্যাণ্ড্ন্যাশানাল্ এসেম্ব্লি”, নরওয়েতে—“ষ্টর্টিং”, পারস্যে—“মজলীস্”, পোল্যাণ্ডে—“সেজম্”, ফ্রান্সে—“চেম্বার”, ভারতবর্ষে—“ফেডারেল্ এসেম্ব্লি”, মিশরে—“বার্লামান্”, যুগোশ্লাভিয়ায়—“স্কপ্টচিনা”, স্পেনে—“কোর্টেস্”, সুইজর্‌ল্যাণ্ডে—“ফেডারেল্ এসেম্ব্লি”, হল্যাণ্ডে—“ষ্টেট্স্ জেনারেল”।

পৃথিবীর মধ্যে ষোলটি সবচেয়ে লোকবহুল সহরের নাম এইখানে দিলাম—

লণ্ডন্ (ইংল্যাণ্ড্)—৮২,০২,৮১৮
নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)—৭০,৭৫ ০০০
বার্লিন (জার্ম্মাণী)—৫৩,১২,০০০
টোকিও (জাপান)—৪০,২৫,০০০
শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)—৩৩,৮০,০০০
প্যারী (ফ্রান্স)—২৮,৯১,০২০
লেলিনগ্রেড (রাশিয়া)—২৭,৮৩,৬০০
ওসাকা (জাপান)—২৫,৮৬,৩০০
মস্কো (রাশিয়া)—২৪,২০,০০০
বুঁয়ো এঁরো (আর্জেণ্টাইন্)—২১,০০,০০০
সাংহাই (চীন)—২০,০০,০০০
ফিলাডেলফিয়া (যুক্তরাষ্ট্র)—১৯,৬৫,০০০
ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া)—১৮,৭৪,৬০০
রিও-ডি-জেনেরিও (ব্রাজিল)—১৭,২৯,৮০০
কলিকাতা (ভারতবর্ষ)—১৪,৮৫,৮৫২
বুদাপেষ্ট্ (হাঙ্গারী)—১৪,২১,৩৯৭

এইতো গেল পৃথিবীর রাজ্য, দেশ ইত্যাদির একটা মোটামুটি বিবরণ; এইবার স্থল ভাগের অন্যান্য বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করা যাক। পাহাড় পর্ব্বত কাকে বলে তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত হ'চ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাহাড়। আগ্নেয়গিরির কথা তোমরা আগেই শুনেছো। নীচে কতকগুলো সর্ব্বোচ্চ পাহাড় পর্ব্বতের নাম দিচ্ছি—

নাম	অবস্থান	ফিটে উচ্চতা
এভারেষ্ট	হিমালয়	২৯,০০২
গড্উইন্ অষ্টেন্ (K2)	”	২৮,২৫০
কাঞ্চনজঙ্ঘা	”	২৮,১৪৬
মাকালু	”	২৭,২৯০
টেংরী খাঁ	পূর্ব্বতুর্কীস্থান	২৪,০০০
চুমালহরী	হিমালয়	২৩,৯৪৪
আকানগুয়া	আণ্ডিজ্ (আমেরিকা)	২৩,৩৯০
ইলম্পা	”	২১,৪৯০
* সাগামা	বলিভিয়া (আমেরিকা)	২১,০৪৭
লুলিয়ালুকো	আণ্ডিজ্ ”	২০,২৪১
* কটোপ্যাক্সী	” ”	১৯,৬১২
এলব্রুজ	ককেশাস্	১৮,৪৬৪
ডেমাভেন্দ্	পারশ্য	১৮,৪৫৪

* আগ্নেয়গিরি।

এ ছাড়াও আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি—

ইয়ুরোপে—বিসুবিয়স্, এট্‌না, ষ্ট্রম্বলী। দক্ষিণ মেরুদেশে—ইরেবাস, টেরর্। আইস্‌ল্যাণ্ডে—হেক্লা। হাওয়াইতে—হুললাই।

সর্ব্বোচ্চ পাহাড়—পৃথিবীতে—এভারেষ্ট্; বৃটিশ সাম্রাজ্যে—নন্দাদেবী (২৫,৬০০); বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে—বেন্‌নেভিস্ (৪,৪০৩); আমেরিকায় —আকান্‌গুয়া; আফ্রিকায়—কিলামেঞ্জারো (১৯,৭০০); অষ্ট্রেলিয়ায়— মাউনাকী (১৩,৯৫৩); ইয়ুরোপে—মঁব্লাঁ (১৫,৭৮১)।

এবার দ্বীপের কথা শোন। দ্বীপ নানান রকমের; কতকগুলো দ্বীপ আগে মহাদেশের সঙ্গে যোড়া লাগান ছিল পরে কোন কারণে সংযোগটুকু ভেঙে গিয়েছে; আগে লঙ্কা দ্বীপটা আমাদের ভারতবর্ষেরই একটা অংশ

ছিল কিন্তু মাঝের যোজকটুকু ভেঙে গিয়ে সেখানে আজ পকপ্রণালী সৃষ্টি হ'য়েছে, আর লঙ্কাটা হ'য়ে গেছে দ্বীপ। সাগরের তলায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পাথর, ছাই এই সব জ'মে দ্বীপের সৃষ্টি করে, এদের আগ্নেয়দ্বীপ বলা যেতে পারে; লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ এরা সব এই ধরণের। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলাটা উঁচু হ'য়ে জলের উপর জেগে ওঠে তাতেও দ্বীপের সৃষ্টি হয়; এর উদাহরণ তাহিটী দ্বীপ। প্রবাল দ্বীপের কথাতো তোমরা আগেই শুনেছো। কতকগুলো প্রধান প্রধান দ্বীপের তালিকা দিচ্ছি—

নাম	অবস্থান	আয়তন বর্গমাইল
গ্রীণল্যাণ্ড	উত্তর মহাসাগর	৮,৪৬,৭৪০
নিউগিনী	প্রশান্ত মহাসাগর	৩,৩০,০০০
বোর্ণিও	ঐ	২,৮০,৬৬০
বাফিনল্যাণ্ড্	উত্তর মহাসাগর	২,৩৬,০০০
মাডাগাস্কার	ভারতমহাসাগর	২,২৪,৭২১
সুমাত্রা	ঐ	১,৬৩,৫৩৪
গ্রেটবৃটেন	আতলান্তিক মহাসাগর	৮৮,৭৪৫
জাপান	প্রশান্তমহাসাগর	৮৭,৫০০

এইবার একটা ভয়ঙ্কর জিনিষের কথা বলছি। তোমরা মরুভূমির কথা নিশ্চয়ই শুনেছো। এ এক ভীষণ জায়গা, এখানে জল নেই; গাছ পালা নেই কেবলই বালি; যে দিকে তাকাও সেই দিকে শুধু বালি রোদে জ্বল জ্বল ক'রছে; এসব জায়গায় বৃষ্টি হয় না ব'ললেও চলে। উট আর উটপাখী ছাড়া কোন জীবজন্তু এর কাছেপিঠেও বাস ক'রতে পারে না। মরুভূমির মাঝে মাঝে অবশ্য দু এক জায়গায় খেজুর জাতীয় কয়েক রকমের গাছপালা হয়, এই সব জায়গাকে মরূদ্যান বা "ওয়েসিস্" বলে। মরুভূমিতে

দিনে যেমন প্রচণ্ড গরম রাতেও তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। ভারতের প্রসিদ্ধ মরুভূমি হ'চ্ছে রাজপুতানার থর। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা এর আয়তন ২০,০০,০০০ বর্গমাইল। এর পরেই স্থান আমেরিকার মাটোগ্রসো (১০,৫০,০০০ বর্গ মাইল) আর মধ্য এসিয়ার গোবী মরুভূমিতে (৩,০০,০০০ বর্গ মাইল)। ডাঙ্গার ওপরে যেমন হিমালয়ের মত উঁচু জায়গা আছে তেমনি এখানে অস্বাভাবিক নীচু জায়গারও অভাব নেই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নীচু জায়গা লিবিয়ার মরুভূমি, সাগর পৃষ্ঠ থেকে ৪৫০ ফিট নীচে; সাহারার মরুভূমি সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৫০ ফিট নীচে আর ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ্ ভ্যালী ৬৫ ফিট নীচে।

মরুভূমিতে যেমন প্রচণ্ড গরম মেরুপ্রদেশে তেমনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তোমরা জানো মেরুবৃত্ত দিয়ে ঘেরা জায়গাকেই বলা হয় মেরুপ্রদেশ। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ বছরের বেশীর ভাগ সময়েই বরফে ঢাকা থাকে, শীতকালে থার্ম্মমিটারের পারা শূণ্য ডিগ্রীরও অনেক নীচে নেমে যায়। এখানে ছমাস দিন ছমাস রাত। ভারী মজা নয় কি? ছ' মাস দিন অবশ্য বেশ ভাল কিন্তু ছ'মাস রাত কি বিশ্রী বলো তো! ছ' মাসতো আর এক ঘুমে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। অন্ধকার ঘুরঘুট্টির মধ্যে জেগে ব'সে থাকাও দায়। কিন্তু প্রকৃতি এ অসুবিধা দূর ক'রে দিয়েছেন। ছ' মাস রাত্তিরের সময়ে মেরুপ্রদেশ একেবারে অন্ধকারে থাকে না। মাঝে মাঝে ঐ দেশের আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণে এক রকম অদ্ভুত আলো ঝালরের মত সারা আকাশ ছেয়ে থাকে; সময় সময় এই আলো খুব উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে আর তাই থেকে নানান রঙ্ ফুটে বেরোয়, তখন দেখতে যে কি চমৎকারই লাগে। একে বলে মেরুজ্যোতি (অরোরা পোলারিস্), উত্তর মেরুর আলোর নাম "অরোরা বোরিয়ালিস্" আর দক্ষিণ মেরুর নাম "অরোরা অষ্ট্রেলিস"।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে—

(১)

বড় মহাদেশ—এসিয়া

ছোট মহাদেশ—অষ্ট্রেলিয়া

বড় দেশ—রাশিয়া

জনবহুল দেশ—ভারতবর্ষ

বড় দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড

লম্বা পাহাড়—হিমালয়

বড় উপদ্বীপ—ভারতবর্ষ

বড় বদ্বীপ—সুন্দরবনের ডেল্টা

উঁচু পাহাড়—এভারেষ্ট।

উঁচু আগ্নেয়গিরি—সাগামা (বলিভিয়া)

বড় আগ্নেয় গিরি—মৌনালোয়া (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ); এর মুখের ব্যাস ১২,৪০০ ফিট,

উঁচু মালভূমি—পামীর।

উঁচু জায়গায় লোকের বসতি—লাডাক (কাশ্মীর)।

বড় মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা)।

বড় মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর।

গভীর মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর।

বড় সাগর—ভূমধ্যসাগর ; ৯,০০,০০০ বর্গ মাইল।

বড় হ্রদ—লেক কাস্পিয়ান ; ১,৭০,০০০ বর্গ মাইল।

বড় মিষ্টি জলের হ্রদ—লেক সুপিরিয়র ; ৩১,২০,০০০ বর্গ মাইল।

গভীর হ্রদ—বৈকাল হ্রদ (রাশিয়া)।

লবণাক্ত হ্রদ—ডেড্ সী (প্যালেষ্টাইন)।

লম্বা নদী—মিশিসিপিমিশৌরী (আমেরিকা)।

চওড়া নদী—আমাজোন (আমেরিকা), ১০ মাইল।

স্রোতস্বতী নদী—রোণ্ (ফরাসী), ঘণ্টায় ৪০ মাইল

বড় জলপ্রপাত—নায়েগ্রা (আমেরিকা)।

উঁচু প্রস্রবণ—ওয়াওয়া (নিউজীল্যাণ্ড)।

বড় ঘূর্ণাবর্ত্ত—লফোডন দ্বীপপুঞ্জের ম্যালেষ্ট্রম, (প্রশান্ত মহাসাগর)।

বড় সহর—লণ্ডন।

উঁচু সহর—প্যাস্কো (পেরু); ১৪, ২০০ ফিট।

বৃষ্টিবহুল জায়গা—চেরাপুঞ্জী (আসাম)।

গরম জায়গা—বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী, চাঁদহ্রদ আর কালিফোর্ণিয়ার ডেথ্ ভ্যালী, সর্ব্বোচ্চ তাপ ১৩৬°।

ঠাণ্ডাজায়গা—ভোরোনোজ (রাশিয়া)।

উত্তরের সহর—হ্যামারফেষ্ট্ (নরওয়ে)।

দক্ষিণের সহর—পুন্টেআরেনস্ (আমেরিকা)।

(২)

বড় গ্রন্থাগার—বিব্লিওথেক্ ন্যাশানাল লাইব্রেরী (প্যারী), প্রায় একশো কোটিরও বেশী বই আছে।

বড় মিউজিয়ম—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন)।

বড় চিড়িয়াখানা—বার্লিন জু।

বড় রাজপ্রাসাদ—মাদ্রিদ প্যালেস (স্পেন)।

বড় বাড়ি—ভ্যাটিকান প্যালেস (রোম)।

উঁচু বাড়ি—এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং (নিউইয়র্ক); ১,২৫০ ফিট।

উঁচু আর বড় সমাধি—গীজের পিরামিড (মিশর)।

বড় মন্দির—দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গমের রঘুনাথ স্বামীর মন্দির।

বড় মঠ—লাসার ডুবুং মঠ (তিব্বত)।

বড় গীর্জ্জে—সেণ্ট্ পিটার্স (রোম)।

উঁচু গীর্জ্জে—সেণ্ট্ আলম্ (জার্ম্মাণী), ৫৩২ ফিট।

বড় মসজিদ—সেণ্ট্ সোফিয়া (কনষ্টাণ্টিনোপল)।

বড় বারান্দা—রামেশ্বরের মন্দিরের (দক্ষিণ ভারত), ৪০০ ফিট লম্বা।

বড় গম্বুজ—গোল গম্বুজ (বিজাপুর), ব্যাস ১৪০ ফিট।

বড় দরজা—বুলান্দ্ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রি)।

বড় খিলান—সীড্নী হার্বার ব্রীজের মুখে (অষ্ট্রেলিয়া)।

বড় ও লম্বা দেওয়াল—চীনের প্রাচীর, প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা।

আশ্চর্য্য স্তম্ভ—পিসার হেলান স্তম্ভ, গোড়া থেকে মাথা ১৪ ফিট হেলে আছে।

লম্বা রেলপথ—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে, ব্লাডিভষ্টক্ থেকে রিগা, প্রায় ছ' হাজার মাইল।

লম্বা রেলপ্লাটফরম—শোনপুর ষ্টেশনের (বিহার); ২,৪১৫ ফিট লম্বা।

বড় রেল ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড্ সেণ্ট্রাল টার্ম্মিনাস (নিউইয়র্ক); ৪৭ টি প্লাটফর্ম্ম।

উঁচুতে রেল ষ্টেশন—ওরায়া (পেরু); ১৩,১০০ ফিট উঁচুতে।

লম্বা সেতু—সান্‌ফ্রান্সিস্কো-ওক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজ (আমেরিকা); ৮ মাইল ৪৪০ গজ।

লম্বা ভাসমান সেতু—হাওড়া ব্রীজ (কলিকাতা)।

লম্বা রেলের সেতু—হেল্‌গেট (নিউ ইয়র্ক); ১৩,৫০০ ফিট।

লম্বা সুড়ঙ্গ—সিমপ্লন্ টানেল ইতালি ও সুইজর্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে; ৬১ মাইল ৪৫৮ গজ।

বড় জলের ট্যাঙ্ক—টালা ট্যাঙ্ক (কলিকাতা)।

বড় ড্রাইডক—সাদাম্পটন ডক্ (ইংল্যণ্ড)।

উঁচু আলোকস্তম্ভ—টাচ্‌মেনিয়ার ডীল্ দ্বীপে; ৯৫৭ ফিট উঁচু; ১০,০০,০০০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার আলো।

জোরাল আলোকস্তম্ভ—ফরাসী ডিওনের মাউণ্ট আফ্রিকের ওপর, তিনশো মাইল দূর থেকে এর আলো দেখা যায়।

বড় নদীর বাঁধ—লয়েড্ বার্জ্জ্ (সিন্ধু)।

বড় পার্ক—হাইড পার্ক (লণ্ডন)।

বড় মেলা—নিজ্‌নি নোভগোর (রাশিয়া)।

লম্বা খাল—ষ্টালিন-বাল্টিক্-হোয়াইটসী খাল (রাশিয়া)।

লম্বা জাহাজ চলার খাল—সুয়েজ খাল, ১০০ মাইল।

বড় গুদাম—মিউনিসিপ্যালিটি গুদাম (লিভারপুর)।

বড় ছবি—টিণ্টারেটের প্যারাডাইজ্ ; ২৩ ফিট × ৭২ ফিট।

বড় জাহাজ—কুইন মেরী (ইংরাজদের) ; ৮২,৭৭৯ টন।

দ্রুতগামী জাহাজ—নর্ম্মাণ্ডী (ফরাসীদের)।

বড় যুদ্ধ জাহাজ—এইচ্, এম্, হুড্ (ইংরাজদের)।

বড় ড্রেজার—লুথার (জার্ম্মাণদের)।

বড় এয়ারসীপ্—হিণ্ডেন্‌বার্গ (জার্ম্মাণদের)।

বড় বড় সী প্লেন—ডু' এক্স (জার্ম্মাণদের), ১৩৬ জন যাত্রী ধ'রে।

বড় বেলুন—২য় এক্সপ্লোরার (আমেরিকা)।

বড় বায়স্কোপের হল—রক্সি থিয়েটার (নিউ ইয়র্ক) ; এক সঙ্গে ছ' হাজার লোক ধ'রে

বড় ঘড়ি—মণ্ট্রিলে (ক্যানেডা), ব্যাস ৬০ ফিট, এক একটা মিনিটের দাগ তিন ফিট অন্তর অন্তর ; কলকজার ওজন ১৬২ মন।

বড় ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা ; ব্যাস ও উঁচু ২১ ফিট্, পাঁচ হাজার মণেরও বেশী ভারী।

বড় প্রতিমূর্ত্তি—ষ্টাচু অব লিবার্টি (নিউইয়র্ক), ফরাসীরা আমেরিকানদের তাদের স্বাধীনতালাভের জন্য উপহার দিয়েছিল ; এটা ১৫১ ফিট্ উঁচু। সম্প্রতি কাবুল থেকে দেড়শো মাইল দূরে বামীয়ান ব'লে একটা জায়গায় এক বুদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কার হয়েছে, এটি ১৮০ ফিট উঁচু।

বড় রৌপ্য মুদ্রা—১৮৫৭ সালের চীন সম্রাট কুঙাঙ্‌ৎসাইয়ের আমলের টাকা, ১$\frac{১}{২}$ সের ওজন।

বড় খোদাই পাথর—সিরিয়ার বলবেকে, এর এক একটা ধার ৬০ফিট।

বড় আকারের বই—লস এঞ্জেলসের লুই ওয়েনেহের বাইবেল, এর ওজন প্রায় ২৪ মণ।

ছোট আকারের বই—পোল্যাণ্ডের ওয়ার্সতে সব চেয়ে ছোট বইয়ের সন্ধান মেলে। এখানা $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{৭}{৩২}$ ইঞ্চি চওড়া, এতে সবশুদ্ধ ১২০ খানা পাতা আছে, কয়েকখানা ছবিও আছে।

বড় মুক্তা—ডাওয়েল্ কব্ পার্ল, ম্যানিলার মিঃ কবের কাছে আছে; এটা ৯ই ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ৫ ইঞ্চি চওড়া।

বড় হীরা—কুলীনান্, টাওয়ার অব্ লণ্ডনে আছে।

বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র—পাসাদানা অব্‌জারভেটরীর (কালিফোর্ণিয়া)।

বড় মানমন্দির—মাউন্ট্ উইলসন্ অবজারভেটরী (আমেরিকা)।

অভিযান

অজানাকে জানবার ইচ্ছা মানুষকে যুগ যুগ ধ'রে পাগল ক'রে তোলে। শুধু জানার গণ্ডীর মধ্যেই সুস্থ মন আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারে না, চিরকালের সমস্ত জানাকে ঘিরে অজানার আলো বারে বারেই তার চোখে এসে পড়ে। মানুষের মনের গহন কোণে যে যাযাবর ঘুমিয়ে আছে তারই তাড়নায় সে সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা উপেক্ষা ক'রে, মেরুতুহীনের নির্জ্জনতাকে জয় ক'রে তার বিজয় অভিযান চালিয়ে এসেছে, এর সুরুও নেই শেষও নেই; এর জন্য কোনো আত্মত্যাগই তার কাছে বড় নয়, জীবন বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত কোন কার্পণ্য নেই। এই সব মানব-কৃষ্টির অগ্রদূতদের প্রণাম করি।

নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া এভারেষ্ট, সেখানকার তুহীন হিমানী এখনো মানুষের পাদস্পর্শে মলিন হ'য়ে যায় নি, তাই মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা চ'লেছে একে জয় ক'রবার। ১৯শ শতকের প্রথমেই শরৎচন্দ্র দাস, হরিরাম সিং, নয়ন সিং, কিষাণ সিং প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসী বীর এই পর্ব্বত রাজ্যের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা ক'রেন, তাঁদেরই উপার্জ্জিত জ্ঞান পরবর্ত্তী যাত্রীদের পথ সুগম ক'রেছে। মহাযুদ্ধের পর স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে বিলাতে রয়েল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটি এভারেষ্ট অভিযানের জন্য এক কমিটি গঠন করে। প্রথম এভারেষ্ট অভিযান সুরু হয় কর্ণেল ব্যরীর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে। কিন্তু এই অভিযানকারীর দলকে এভারেষ্টের গোড়া থেকেই ফিরে আসতে হ'য়েছিল। এই দলের মিঃ ম্যালোরী এই সময় এভারেষ্টে উঠবার সহজতম পথ "নর্থকোল" আবিষ্কার করেন। ১৯২২ সালেই দ্বিতীয় অভিযান আরম্ভ হয়। এবারকার নেতা ছিলেন ব্রুস্‌ আর দলে ছিলেন ম্যালোরী, নর্টন সামারভিল ও ফিঞ্চ; এঁরা ৫ই মার্চ্চ ৭০ জন কুলী নিয়ে যাত্রা করেন।

২৭শে মার্চ্চ তাঁরা ১৬০০০ ফিট উঁচুতে রংবু মঠে পৌছান ; এখানে দেখতে পাওয়া গেল যে এই দুর্জ্জয় শীতে কয়েকজন নগ্নদেহী সন্ন্যাসী বাইরে গভীর তপস্যায় নিরত। ২১০০০ ফিট থেকে তাঁরা অক্সিজেন নিয়ে উঠতে সুরু করেন। প্রবল ঝঞ্ঝাপাতের ফলে ২৭,২৩৪ ফিট উঁচু থেকে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। তৃতীয় অভিযান ১৯২৪ সালে। বহুকষ্টে অভিযান-কারীরা ২৮০০০ ফিট ওঠেন ও সেইখানেই তাঁবু ফেলা হয়। এইখান থেকে ম্যালোরি আর আরভিন্ অক্সিজেনের যন্ত্র পিঠে নিয়ে উঠতে সুরু করেন। অনন্ত নীরবতার মধ্যে মাত্র দু'জন মৃত্যুযাত্রী। এঁদের ফিরে আসতে আর কখন কেউ দেখেনি। আবার ১৯৩৩ সালে হাফ্ রাট্‌লেজের নেতৃত্বে আর একটি দল গঠন করা হয়। এঁরা ২৩০০০ ফিট উঠে দেখেন তুষারপাতের ফলে নর্থকোলের চিহ্নমাত্র নেই ; তুষার কেটে পথ ক'রে নিয়ে তাঁরা চলতে থাকেন। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে এঁরা ২৮১০০ ফিট পর্য্যন্ত ওঠেন ; আর হাজার ফিট উঠলেই চিরবাঞ্ছিতের দর্শন পাওয়া যাবে, কিন্তু এঁরা নেমে আসতে বাধ্য হন। ১৯৩৮ সালে টিলম্যান একটি দল নিয়ে যাত্রা করেন ; কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অন্যান্য দিকেও হিমালয়ে উঠবার চেষ্টা যথেষ্ট চ'লেছে। কাশ্মীরের দিকে হিমালয়ের পশ্চিমাংশে নাঙ্গা পর্ব্বত। ১৯৩৩ সালে হুর মার্ক নামে একজন বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মাণ পণ্ডিতের নেতৃত্বে ৭ জন জার্ম্মাণ ও ২ জন আমেরিকান নাঙ্গা পর্ব্বত জয়ে বার হন। এ দলে মিস্ নাউল্‌টন নামে একজন মেয়েও ছিলেন। এর চেয়ে ভাল সুসজ্জিত অভিযান আর পৃথিবীর কোথাও হয়নি। কিন্তু এঁরা সফলকাম হ'তে পারেন নি। ১৯৩৭ সালে ডাঃ হুবাইনের নেতৃত্বে ৭ জন জার্ম্মাণ নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠতে গিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। কারাকোরাম হ'চ্ছে হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমে। ১৯৩৪ সালে একদল আন্তর্জ্জাতিক অভিযানকারী কারাকোরাম শিখরে ওঠার জন্য যাত্রা করেন ; তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়। এই দলে ম্যাডাম

ডাইরেন্‌ফোর্থ নামে একজন মহিলা ছিলেন ; ইনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আরোহণকারী মহিলা। ১৯৩৬ সালে টিলডেন ও গ্রাহাম একদল অভিযাত্রী নিয়ে নন্দাদেবীর শিখরে (২৫,৬৬০ ফিট) ওঠেন। ১৯৩৬ সালে মিঃ হোর্ত্তার নেতৃত্বে একদল জাপানী বৈজ্ঞানিক নন্দকোটের শিখরে (২২,৫৬৫ ফিট) পৌছান।

মেরু অভিযান

মেরু প্রদেশ মানুষের মনে চিরকালই এক অদম্য কৌতুহল জাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু সত্যিকারের মেরু অভিযানের সূত্রপাত হয় ১৭শ শতকে। উঈলোবাই, ব্যাফিন এঁরা সব প্রথম যুগের অভিযানকারী। নাবিকদের মনে চিরকালই একটা স্বপ্ন ছিল যে আতলান্তিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশ দিয়ে একটা সোজা পথ আছে ; তারা এর নাম দিয়েছিল "নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ্"। এই পথ আবিষ্কারের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৮১৮ সালে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের একটা পুরস্কার ঘোষণা করে। রস, পিয়ারী, ফ্রাঙ্কলীন্ সবাই এর জন্য চেষ্টা করেন। সকলেই ফিরে আসেন কিন্তু ফ্রাঙ্কলীনের আর কোন খবরই পাওয়া যায় নি। কেনেডী, রায়, বেচার্ আর ম্যাক্‌ক্লিণ্টক্ ফ্রাঙ্কলীনের সন্ধানে বেরোন। এঁরা মেরু প্রদেশের অনেক কিছুই আবিষ্কার করেন ও নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ডাঃ নান্‌সেন্ ও জেন্‌সন ১৮৯৭ সালে সুমেরু বিন্দুর খুব কাছে গিয়ে পৌছান। ১৯০৬ সালে কমাণ্ডার পীয়ারী মেরু-বিন্দুর দুশো' মাইলের মধ্যে গিয়ে পড়েন। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন পৃথিবীর লোক শুনে অবাক হ'য়ে গেল যে আমেরিকার ডাঃ স্কট মেরু-বিন্দুতে গিয়ে পৌছেছেন। অবশ্য এ খবর যে ভুল তা' পরে প্রমাণিত হয়। এর কয়েকদিন পরে পীয়ারী সত্যিসত্যি আমেরিকার জাতীয় পতাকা সুমেরু বিন্দুতে পুঁতে আসেন। ১৯২৮ সালে ইতালীয়

"নোবাইল" অভিযাত্রী দল নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায় ও ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেন তাদের খুঁজতে বার হন ; যদিও পরে "নোবাইল" দলের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেনের কথা আর কেউ কখনো শোনে নি। দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা চ'লেছিলো। ১৯০৪ সালে ক্যাপ্টেন স্কট সেযাবৎ সকলে যতদূর অগ্রসর হ'য়েছিলেন তার চেয়েও তিনশো মাইল আগিয়ে যান। ১৯০৯ সালে শেকেল্টন্ কুমেরু বিন্দু থেকে ১১১ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হন। ১৯১১ সালে ক্যাপ্টেন আমুণ্ড্সেন কুমেরু বিন্দুতে গিয়ে পৌছান।

অন্যান্য

১৫শ শতক থেকেই ইয়ুরোপীয় নাবিকরা ভারতে আসার একটা সহজতম পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতে ওঠে ; এর ফলে ভারত ছাড়াও আরো অনেক নতুন দেশের সন্ধান মেলে। ১৪৯২ সালে জেনোয়াবাসী নাবিক কৃষ্টকার্ কলম্বস স্পেনের রাণী ইসাবেলার অনুগ্রহে কিছু নৌবহর সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষে যাত্রার জন্য বার হন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল যে আতলান্তিক মহাসাগর দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছান যাবে। এই দুই মহাসাগরের মাঝে যে অন্য কোন দেশ আছে তা তাঁদের কল্পনায় আসতো না। কলম্বস সোজা পশ্চিম দিকে যেতে যেতে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হ'লেন, ভাবলেন এই বুঝি ভারতবর্ষ, তাই আজও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বলে রেড্ ইণ্ডিয়ান, আর কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জের নাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌছান।

১৫২০ সালে ম্যাগলীন (পর্তুগীজ) জাহাজে চ'ড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বার হন। পথে তিনি মারা যান কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা জাহাজ চালিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে যেখান থেকে তিনি যাত্রা ক'রেছিলেন সেইখানেই আবার ফিরে আসেন।

চিরন্তনী বর্ষপঞ্জী

প্রথম তালিকা ঃ—

খৃষ্টপূর্ব্ব					খৃষ্টাব্দ					
৪০	৩২	২৪	১৬	৮	১	৯	১৭	২৫	৩৩	অ
৩৯	৩১	২৩	১৫	৭	২	১০	১৮	২৬	৩৪	আ
৩৮	৩০	২২	১৪	৬	৩	১১	১৯	২৭	৩৫	ই
৩৭	২৯	২১	১৩	৫	৪	১২	২০	২৮		ঈ
৩৬	২৮	২০	১২	৪	৫	১৩	২১	২৯	৩৭	অ
৩৫	২৭	১৯	১১	৩	৬	১৪	২২	৩০	৩৮	আ
৩৪	২৬	১৮	১০	২	৭	১৫	২৩	৩১	৩৯	ই
৩৩	২৫	১৭	৯	১	৮	১৬	২৪	৩২	৪০	ঈ

দ্বিতীয় তালিকা ঃ—

০	২৮	৫৬	৮৪
১	২৯	৫৭	৮৫
২	৩০	৫৮	৮৬
৩	৩১	৫৯	৮৭
৪	৩২	৬০	৮৮
৫	৩৩	৬১	৮৯
৬	৩৪	৬২	৯০
৭	৩৫	৬৩	৯১
৮	৩৬	৬৪	৯২
৯	৩৭	৬৫	৯৩
১০	৩৮	৬৬	৯৪
১১	৩৯	৬৭	৯৫

তৃতীয় তালিকা ঃ—

অ	আ	ই	ঈ					
ন	গ	ঙ	চ	০,	৬,	—,	১৭,	২৩
চ	ট	ত	ক	১,	৭,	১২,	১৮,	—
ক	ন	গ	ঙ	২,	—,	১৩,	১৯,	২৪
ঙ	চ	ত	ট	৩,	৮,	১৪,	—,	২৫

খেলাধূলা

অলিম্পিক গেমস্‌

প্রাচীন গ্রীকরা মনে ক'রতেন গ্রীসের অলিম্পিয়া পাহাড় বুঝি বা দেবতাদের অধিষ্ঠান। অলিম্পিয়ার অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য পাঁচ বছর অন্তর অন্তর তাঁরা এক একটি বিরাট প্রতিযোগীতার আয়োজন ক'রতেন; কাছেপিঠের সমস্ত রাজ্যগুলো এতে যোগ দিত। এরই নাম ছিল "অলিম্পিক গেমস"। অনেকদিন চলার পর এই প্রতিযোগীতা বন্ধ হ'য়ে যায়। তার কয়েকশো বছর পরে ১৮৯৬ সালে ব্যারণ প্যাথারী ডি কুবার্ত্তিন নামে এক ভদ্রলোক নতুন ক'রে এই প্রতিযোগীতার সূত্রপাত করেন। এই যুগের অলিম্পিক প্রত্যেক চতুর্থ বছরে বিভিন্ন বিভিন্ন এক একটি দেশে অনুষ্ঠিত হয়; সারা পৃথিবীর খেলোয়াররা এতে যোগ দেন। এযাবৎ এই এই জায়গায় অলিম্পিকের অধিষ্ঠান হ'য়েছে—এথেন্স্‌ (১৮৯৬), প্যারী (১৯০০), সেণ্ট্‌ লুই ('০৪) লণ্ডন ('০৮); ষ্টক্‌হলম্‌ ('১২), অ্যাণ্টওয়ার্প ('২০), প্যারী ('২৪), আমষ্টার্ডাম ('২৮), লস্‌ এঞ্জেলস ('৩২), বার্লিঙ্‌ ('৩৬)। আগামী অলিম্পিক গেমস হওয়ার কথা ছিল, জাপানের টোকিওতে, কিন্তু চীন-জাপানের যুদ্ধের জন্য এবার আর সেখানে হবে না, হবে ফিন্‌ল্যাণ্ডে। অলিম্পিকের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হ'চ্ছে ম্যারাথন রেস, এটা একটা ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পাল্লার দৌড়। খৃঃ পূঃ ৪৭০ সালে ফাইডিপ্পাইড্‌স্‌ নামে এক গ্রীক যোদ্ধা ম্যারাথন যুদ্ধের জয়ের খবর নিয়ে ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্য্যন্ত ২৫ মাইল এক দৌড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি খবর পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। ম্যারাথন রেস এই ঘটনারই স্মারক প্রতিযোগীতা।

ভারতবর্ষ অলিম্পিকে হকী খেলায় পর পর তিনবার জিতে পৃথিবী বিজয়ী হ'য়েছে।

খেলার সম্বন্ধে কয়েকটা খাপ ছাড়া কথা

দাবা লেখার জন্ম ভারতবর্ষে।

"আম্পায়ার" ফরাসী ভাষার কথা এর মানে তৃতীয় ব্যক্তি, "রেফারী" ল্যাটিন কথা, এর মানে শালিস মানা।

পিরামিডের মধ্যে মিশররাজদের কবরে ড্রাফট্‌ খেলার সরঞ্জাম মেলে।

মোহান-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপে পাশাখেলার নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীস দেশের বিখ্যাত মনিষী পাইথোগোরাস আর প্লেটো একবার অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগীতায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা কোন পুরস্কার পেয়েছিলেন কিনা এখবর জানা নেই।

"এম, সি, সি" মানে মেরিলিবোন ক্রীকেট ক্লাব, এঁরাই ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট রাজনীতির পরিচালক।

"টেষ্টম্যাচ" ইংল্যাণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিনিধিমুলক খেলা।

"অ্যাসেস্" বলে ইংল্যাণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেষ্ট খেলার পুরস্কার। ফি বার পাঁচটা খেলার মধ্যে যে দল বেশী বার জয়লাভ করে সেই দল "অ্যাসেস" পায়। প্রথম যেবার এই টেষ্ট খেলা হয় সেইবারকার উইকেট-গুলো পুড়িয়ে তার ছাই একটা পাত্রের মধ্যে রাখা আছে, একেই "অ্যাসেস" বলে।

ব্রাডম্যান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়ার। এঁর রেকর্ড রান হ'চ্ছে নট আউট ৪৯৭ (সীডনীতে নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ ও কুইন্স্ল্যাণ্ডের মধ্যে খেলায়)।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটীয়ার ইন্দোরের সি, কে, নাইডু।

প্রিন্স রঞ্জি', দলীপ সিং ও পাটাউডীর নবাব ইংল্যাণ্ডের হ'য়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলেন।

সন্ধানী :—

প্রিন্স রঞ্জি

মেজর সি, কে, নাইডু

সন্ধানী :-

বার্লিনে গত অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগীদল

হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়ার ধ্যান চাঁদ।

জাতীয় খেলা—আমেরিকার বেসবল, ইংল্যণ্ডের ক্রিকেট, স্কটল্যণ্ডের গল্‌ফ আর স্পেনের ষাঁড়ের যুদ্ধ।

কয়েকটি বিশেষ রেকর্ড

একদমে না থেমে রেলের দৌড়—ইংল্যণ্ডের এল, এন, ই, আরের "ষ্ট্রীম লাইণ্ড" গাড়ী "সিলভার্ জুবিলী" ঘণ্টায় ১১৩ মাইল বেগে লণ্ডন থেকে নিউক্যাস্‌ল্ গিয়েছিল।

প্যারাসুটে অবতরণ—কীন্স ২০,২০০ ফিট উঁচুতে এরোপ্লেন থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে প'ড়েছিলেন।

উঁচুতে ওঠা—২য় এক্সপ্লোরার যোগে আমেরিকার ষ্টিভেন্স আর এণ্ডারসন্ ১৯৩৫ সালের ১১ই নভেম্বর ৭২,৩৯৫ ফিট উঁচুতে ওঠেন।

সমুদ্রের তলায় পৌঁছান—আমেরিকার প্রোঃ বিবি বেথোস্‌-ফিয়ার নামে এক সামুদ্রিক যন্ত্রের সাহায্যে বার্ম্মাডা দ্বীপের কাছে ৩,০২৮ ফিট নীচে সমুদ্রের তলায় পৌঁছান।

অবিরাম সাইকেল চালান—অষ্ট্রেলিয়ার ওলি নিকোলাস একাদি-ক্রমে ৩৬৫ দিনে ৪৩০০০ মাইল সাইকেল চালান।

অবিরাম সাঁতার—এলাহাবাদের রবীন চট্টোপাধ্যায় একটানা ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সাঁতার কাটেন। তাঁকে ১৫ বছর বয়স্কা জার্ম্মান মেয়ে লিট্‌জীগের ৭৯ ঘণ্টার রেকর্ড ভাঙতে হ'য়েছিল।

সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া—গ্রেট্রুড এডার্লী নামে একটি মেয়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হন। ক্যাপ্টেন ওয়েব সবচেয়ে কম সময়ে ১৪ ঘণ্টা ৩৪ মিনিটে পার হন। ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র ডাঃ সুরেশ দে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হ'তে চেষ্টা করেন।

উড়োজাহাজে বেশী দূর যাওয়া—গ্রাফ্ জেপলিন্ বার্লিন থেকে টোকিও ৭৫০০ মাইল চার দিনে উড়ে গিয়েছিল।

সীপ্লেনে না থেমে বেশী দূর যাওয়া—ক্যাপ্টেন বেনেট ডাণ্ডি থেকে কেপটাউন' ৬০০০ মাইল পথ উড়ে গেছেন (৭ অক্টো '৩৮)

এরোপ্লেনে না থেমে বেশী দূর যাওয়া—ফরাসী দেশের রসি ও কোডেস্ নিউইয়র্ক থেকে সিরিয়ার রায়াক সহরে, ৫৯১২ মাইল পথ, ৫৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে উড়ে গিয়েছিলেন।

এরোপ্লেনে উঁচুতে ওঠা—১৯৩৭ সালে ইংরাজ বৈমানিক এডামস্ ৫৩,৯৩৭ ফিট উঁচুতে ওঠেন।

এরোপ্লেনে পৃথিবী পরিক্রমণ—আমেরিকার উঈলী পোষ্ট সবচেয়ে কম সময়ে ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন।

এরোপ্লেনে বেশীক্ষণ শূন্যে থাকা—আমেরিকার ফ্রেড্ ফেজ ও অ্যাল্ ফেজ ২৭ দিন একবারো না নেমে আকাশে ছিলেন।

এরোপ্লেনে লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি—ইংল্যাণ্ডের স্কট্ ও ব্ল্যাক্ ৭১ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ১১,০০০ মাইল পথ উড়ে গিয়েছিলেন।

এরোপ্লেনে মেরু যাত্রা—কর্ণেল বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে আর ১৯২৯ সালে দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন।

মহিলার আতলান্তিক মহাসাগর পার হওয়া—ইংরাজ মহিলা মিস্ ইয়ারহার্ট এরোপ্লেনে একাকী প্রথমে আতলান্তিক মহাসাগর পার হন।

—* পৃথিবীর রেকর্ড *—

দৌড়ান

১০০ মিটার—জে, ওয়েন্স্ (যুক্তরাষ্ট্র) ১০.৩ সেঃ
২০০ মিটার—লকে ঐ ২০.৬ সেঃ
৫০০ মিটার—ঈষ্ট্ম্যান্ ঐ ১ মি. ২ সেঃ
৫০০০ মিটার—হকার্ট্ (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ মি. ২২.২ সেঃ
১০,০০০ মিটার—কুসান্‌কিন্‌স্কি (পোল্যাণ্ড) ৩০ মি. ১১.৬ সেঃ
১ মাইল—ক্যানিংহাম ঐ ৪ মি. ৬.৮ সেঃ
২ মাইল—হকার্ট্ (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ মি. ১১.২ সেঃ
৩ মাইল—হকার্ট্ ঐ ১৮ মি. ৫০.৪ সেঃ
৪ মাইল—হকার্ট্ ঐ ১৯ মি. ১৫.৬ সেঃ
১০ মাইল—পি, নুর্মী ঐ ৫০ মি. ১৫ সেঃ
২৫ মাইল—ফ্যানেলী (ইতালী) ২ ঘ. ২৬ মি. ১০.৮ সেঃ

সাঁতার

১০০ গজ—ওয়েস্‌মুলার (যুক্তরাষ্ট্র) ৫১ সেঃ
১০০০ গজ—বর্গ (সুইডেন) ১১ মি. ৫৫.৪ সেঃ
১০০০ মিটার—ম্যাকিনা (জাপান) ১০ মি. ৫৪.৭ সেঃ
১৫০০ মিটার—বর্গ (সুইডেন) ১৯ মি. ৭.২ সেঃ
১ মাইল—বর্গ ঐ ২১ মি. ৬.৮ সেঃ

ম্যারাথন্‌রেস্‌—কেসঙ্‌ (জাপান) ২ ঘ. ২০ মি. ১৯·২ সেঃ

হাইজাম্প—জন্সন্‌ (যুক্তরাষ্ট্র) ৬ ফিট ৯·৭ ইঞ্চি

লঙ্‌জাম্প—ওয়েন্স্‌ ঐ ২৬ ফিট ৮·২৫ ইঞ্চি

পোলভল্ট্‌—ভার্ফ ঐ ১৪ ফিট ৬·৫ ইঞ্চি

ডিসকাস্‌থ্রো—স্ক্রোডার (জার্ম্মাণ) ১৭৪ ফিট ২·৫ ইঞ্চি

—❋ ভারতীয় রেকর্ড ❋—

দৌড়ান

১০০ মিটার—জে, হার্ট (পঞ্জাব) ১০·৬ সেঃ

৪০০ মিটার—গাঞ্জার (বাঙ্‌লা) ৫০·২ সেঃ

১৫০০ মিটার—ডানিয়েল (ভারতের বৃটিশ আর্ম্মি) ৪ মি. ৯·৪ সেঃ

৫০০০ মিটার—রোণাক সিং (পঞ্জাব) ১৫ মি. ২৩ সেঃ

১০০০০ মিটার—রোণাক সিং ঐ ৩২ মি. ২·৩ সেঃ

১ মাইল—ড্যানিক (ভারতের বৃটিশ আর্ম্মি) ৪ মি. ৩১ সেঃ

৫ মাইল—গুঞ্জার সিং (পঞ্জাব) ২৭ মি. ১০ সেঃ

১০ মাইল—লাল সা ঐ ৫৬ মি. ৫ সেঃ

সাঁতার

১০০ গজ—রাজারাম (বাঙ্‌লা) ১ মিঃ ৭ ৫ সেঃ

২২০ গজ—এট্রাউন্‌স্‌ (পঞ্জাব) ৮ মি. ৩৫·৬ সেঃ

৮৮০ গজ—ডি, দাস (বাঙ্‌লা) ১৮ মি. ২ সেঃ

১ মাইল—ডি, দাস ঐ ২৪ মি. ৭·২ সেং

১৫০০০ মি.—এম, সিং ঐ ২২ মি. ২১·৮ সেঃ

হাইজাম্প—দিলবাগ (পঞ্জাব) ৬ ফিট ১ ইঞ্চি
লঙ্‌ জাম্প্—নিরঞ্জন সিং (পঞ্জাব) ২১ ফিট ১০৫ ইঞ্চি
পোলভল্ট্—আব্দুল হামিদ ঐ ১৩ ফিট
সটপুট—জহুর আমেদ ঐ ৪৩ ফিট ৬.৫ ইঞ্চি
ডিসকাস থ্রো—চানন সিং ঐ ১১৯ ফিট ৪ ইঞ্চি

—❋ পৃথিবী বিজয়ী ❋—

বক্সিং

ফ্লাই ওয়েট (১১২ পাঃ)—ব্রাউন (ইংল্যাণ্ড)।
ব্যাণ্টাম ওয়েট (১১৮ পাঃ)—এস্কোরার (মেক্সিকো)।
ফেদার ওয়েট (১২৬ পাঃ)—আর্মষ্ট্রং (যুক্তরাষ্ট্র)।
লাইট ওয়েট (১৩৫ পাঃ)—অ্যাম্বার ঐ ।
ওয়েণ্টার ওয়েট (১৪৭ পাঃ)—রস্ ঐ ।
মিড্‌ল্ ওয়েট (১৬০ পাঃ)—ষ্টীল (ফরাসী)
লাইট হেভী ওয়েট (১৭৫ পাঃ)—জো লুই (যুক্তরাষ্ট্র)।
হেভী ওয়েট (১৭৫ পাউণ্ডের বেশী)—জো লুই ঐ

স্কালিং—পিয়ার্সে (অষ্ট্রেলিয়া)
দাবা—ডাঃ ইউ (হ্যল্যাণ্ড)
ড্রাফট্—সাব্রে (ফরাসী)
স্কেটিং—সেফার (অষ্ট্রিয়া)
পিংপং—কোলার (চেকোশ্লো')
কুস্তী—গামা (ভারতবর্ষ)

আইস হকি—ক্যানেডা
হকি—ভারতবর্ষ
ফুটবল—ইতালী
টেনিশ (১৯৩৭)—বাজ্ (যুক্তরাষ্ট্র)।
বাস্কেটবল—যুক্তরাষ্ট্র
হ্যাণ্ড্‌বল—জার্ম্মাণী

—✻ দ্রুতগতির রেকর্ড ✻—

মোটর বোট—স্যার ম্যাল্‌কম্ ক্যাম্বেল ("ব্লুবার্ড্"); ১লা সেপ্টে' '৩৮; ঘণ্টায় ১২৯'৭২ মাইল।

মোটর গাড়ি (বড়)—ঈষ্টন্ ("থাণ্ডার বোল্ট্"); ১৬ই সেপ্টে' '৩৮; ঘণ্টায় ৩৫৭'৫ মাইল।

মোটর গাড়ি (ছোট)—ঈষ্টন্, ঘণ্টায় ১২৪'১ মাইল।

মোটর সাইকেল—আর্নেষ্ট হে (হ্যল্যাণ্ড); ঘণ্টায় ১৫২'৮৬ মাইল।

এরোপ্লেন—আজালো (ইতালি); ঘণ্টায় ৪৪০'২৯ মাইল।

সীপ্লেন—আজালো (ইতালি); ঘণ্টায় ৪৩৭'৫ মাইল।

রেল গাড়ি (ইলেক্‌ট্রীক)—ফ্লাইং হ্যামবুর্গ; ঘণ্টায় ১২১ মাইল।

সাবমেরিন—দি টেমস্ (ইংল্যাণ্ড); ঘণ্টায় ২৪ মাইল।

আবিষ্কার

—✽ যান্ত্রিক ✽—

১৫৯০—অনুবীক্ষণ যন্ত্র—জেন্‌সন (জার্ম্মাণ)।

১৮৩০—অন্ধদের প'ড়বার বই—ব্রেইল (ফরাসী)।

১৮৩০—আর্কল্যাম্প্—ব্রাস (ইংরাজ)।

? —ইকমিক কুকার—ইন্দুমাধব মল্লিক (বাঙালী)।

১৮৭৮—ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট আলো—এডিসন (আমেরিকান)।

১৮৯৫—এক্স্‌রে—রন্‌জন্ (জার্ম্মাণ)।

১৯০৩—এরোপ্লেন—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকান)।

—ক্যাস রেজিষ্ট্রার—প্যাটার্স ন (ইংরাজ)।

১৮১৬—খনির আলো—হামফ্রি ডেভি (ইংরাজ)।

১৮৭৭—গ্রামোফোন—এডিসন (আমেরিকান)।

১৮৯৩—চলচ্চিত্র—এডিসন (আমেরিকান)।

১২৮৫—চশমা—স্পিনা (ইতালিয়ান)।

১৮৩২—জাইরোস্কোপ—জন্‌সন (জার্ম্মাণ)।

১৯০২—জেপেলিন—কাউণ্ট জেপেলিন (জার্ম্মাণ)।

১৮৭৩—টাইপরাইটার—টায়ার্লেজ (আমেরিকান)।

১৮৩৫—টেলিগ্রাফ—মোর্স (আমেরিকান)।

১৮৭৬—টেলিফোন—গ্রাহাম বেল (আমেরিকান)।

১৯২৫—টেলিভিশান—বেয়ার্ড (ইংরাজ)।

১৬শ শতাব্দি—টেলিস্কোপ—গ্যালিলিও (ইতালিয়ান)।

১৮৫৮—ট্রামগাড়ি—ট্রেইন (আমেরিকান)।

১৮৩১—ডাইনেমো—ফ্যারাডে (ইংরাজ)।

১৮৬৭—ডিনামাইট—নোবেল (সুইডীশ)।

১৭২১—থার্ম্মমিটার—ফারেনহীট (ফরাসী)।

১৮৯১—থার্ম্মস ফ্লাস্ক—দিওয়ার (ইংরাজ)।

* ১৬০২—দিগদর্শন যন্ত্র—ফ্লারোনীজ (ইতালিয়ান)।

১৮৩১—দিয়াশলাই—সাইরীয়া (ফরাসী)।

১৭২১—দুরবীক্ষণ—ল্যান্স লীপার্স (ফরাসী)।

১৪৫০—ধাতুর ছাপার অক্ষর—গুটেনবার্গ্ (জার্ম্মাণ)।

১৭০৯—পীয়ানো—ক্রিষ্টোফরী (ইতালিয়ান)।

১৮৮৪—পেট্রোল মটর—ডেমলার বেঞ্জ (জার্ম্মাণ)।

১৮৩৯—ফটোগ্রাফী—ডাগোর এবং নীপজী (ফরাসী)।

১৮৬৪—ফাউণ্টেনপেন—ওয়াটারম্যান (আমেরিকান)।

১৮১৬—বাইসাইকেল—কার্ল ফন্‌ড্রেস্—(জার্ম্মাণ)।

১৭৬৯—বাষ্পীয় ইঞ্জিন—জেম্‌স্ ওয়াট্ (ইংরাজ)।

১৮১০—বাষ্পীয় ছাপার কল—কুনীগ্ (জার্ম্মাণ)।

১৮৯৬—বেতার—মার্কনী (ইতালিয়ান)।

১৮৬১—বৈদ্যুতিক উনান—সীমেন্স্ (ইংরাজ)

১৮৩১—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা—জোসেফ্ হেন্‌রী (ইংরাজ)

১৬৪৩—ব্যারোমিটার—টরিসেল্লী (ইতালিয়ান)।

১৯১০—মনোরেল—লুই ব্রেনান (আইরীস)।

১৮৭৮—মাইক্রোফোন—হাগ্‌স্ (ইংরাজ)।

১৯১২—মেশিনগান—লুঈস্ (জার্ম্মাণ)।

১৯১৪—যুদ্ধের ট্যাঙ্ক—সুইটন্ (জার্ম্মাণ)।

১৮৫১—রিভলভার—কোল্ট্ (আমেরিকান)।

* দিগদর্শন যন্ত্র নাকি খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে চীনদেশে আবিষ্কৃত হয়।

১৮১৪—রেলগাড়ি—ষ্টিভেন্‌সন্‌ (ইংরাজ)।

১৮৮৫—লাইনো টাইপ—মার্গেন থালার (আমেরিকান)।

১৮৫২—লিফ্‌ট্‌—ওটিস (ইংরাজ)।

১৮৭০—ষ্টিরিওস্কোপ—হুটষ্টোন (বেলজিয়ান)।

১৮১৫—ষ্টেথিস্কোপ—লেইন্নেক (ফরাসী)।

১৫৪৪—সর্টহ্যাণ্ড—টিমোথি ব্রাইট (ইংরাজ)।

১৯০৪—সবাক চিত্র—এডিসন (আমেরিকান)।

১৯০৪—সেফটি ক্ষুর—গিলেট (আমেরিকান)।

১৮৭৭—সেলায়ের কল—থিমনীয়ার (ফরাসী)।

১৮৯৩—সেলুলয়েড্‌ ফিল্ম—ঈষ্টম্যান্‌ (আমেরিকান)।

১৯১১—হাইড্রোপ্লেন—কার্টিস (ফরাসী)।

১৮৪০—হারমোনিয়াম—ডিবে (ফরাসী)।

—※ চিকিৎসা সংক্রান্ত ※—

১৮৬৭—অ্যান্টিসেপ্‌টিক চিকিৎসা—লর্ড লিষ্টার (ইংরাজ)

১৮৪৪—কলেরার বীজাণু—কক্‌ (জার্ম্মাণ)

? —কালাজ্বরের ঔষধ—ইউ, এন, ব্রহ্মচারী (বাঙালী)

১৮৪৭—ক্লোরোফর্ম্ম—সিমসন (স্কচ্‌)

১৯০০—জলাতঙ্কের ঔষধ—লুঈ পাস্তুর (ফরাসী)

১৮৮০—টাইফয়েডের বীজাণু—এবারেথ্‌ (জার্ম্মাণ)

১৮৯৬—টিকা—জেনার ঐ

১৮৯০—ডিপথেরিয়ার ঔষধ—এমিল বুরিং (জার্ম্মাণ)

১৮৮০—ম্যালেরিয়ার বীজাণু—ল্যাভার্ণে ঐ

১৮৭৩—বায়োকেমিক চিকিৎসা—সুয়েস্‌নান্‌ ঐ

১৮৭৩—ভাইটামিন—কাসেম ক্রঁা (অষ্ট্রেলিয়ান)

১৬১৮—রক্ত সঞ্চালন তথ্য—উইলিয়াম হার্ব্বে (ইংরাজ)

১৮১৫—হোমিওপ্যাথী—হ্যানীমান (জার্ম্মাণ)

২০০ খৃঃ পূঃ—হাঁসপাতাল স্থাপনা—অশোক (ভারতীয়)

—✻ বৈজ্ঞানিক তথ্য

১৭৮০—অম্লযান—প্রীষ্ট্‌লে (ইংরাজ)

১৭৯৬—চলবিদ্যুৎ—ভোল্টা (ফরাসী)

১৬৮৯—মাধ্যাকর্ষণ তথ্য—নিউটন (ইংরাজ)

১৯১৪—আপেক্ষিক তত্ত্ব—আইন ষ্টাইন (জার্ম্মাণ)

১৮৬৬—উত্তরাধিকারী তথ্য—মেণ্ডেল : ঐ

১৮৭৫—গ্যালিয়াম ও ইণ্ডিয়াম—বঈস্‌বর্দ্দান (ফরাসী)

১৮৯৫—তরলবাতাস—লিণ্ডে (জার্ম্মাণ)

১৮৬১—থালিয়াম—ক্রুকস্‌ (জার্ম্মাণ)

১৭৭২—দহন তথ্য—ল্যাভইজার (ফরাসী)

১৮৯৪—দুষ্প্রাপ্য গ্যাস—রামজে (ইংরাজ)

১৭৮১—পরমাণু তত্ত্ব—ডাল্টন ঐ

১৯০৪—পরমাণু গঠন তত্ত্ব—রাদারফোর্ড ঐ

১৯০৪—পরমাণু বিকীরণ তত্ত্ব—রাদারফোর্ড ঐ

১৭৯৭—পৃথিবীর ওজন—ক্যাভেণ্ডিস (ইংরাজ)

১৮৫৯—বর্ণবিশ্লেষণ তত্ত্ব—কিরচফ্‌ (জার্ম্মাণ)

? বৃক্ষের জীবন—জগদীশচন্দ্র বসু (বাঙালী)

১৮৫৯—ক্রমবিকাশ তত্ত্ব—ডারউন (ইংরাজ)

১৬৬২—বাষ্পীয় নিয়ম—বয়েল (ইংরাজ)

১৮৪০—বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ তত্ত্ব—জানিয়োস ঐ

১৮৬৯—মৌলীক পদার্থের ক্রমানুবর্ত্তীতা—মেণ্ডেলীফ (রাশিয়ান)

১৯০৩—রেডিয়াম—পীয়ারী ও মাদাম কুরী (ফরাসী)

১৫১৪—লগারিথম—নেপিয়ার (ফরাসী)

? পৃথিবীর গোলাকৃতি ও ঘূর্ণন—আর্য্যভট (ভারতীয়)

ভৌগলিক

খৃঃ পুঃ ১৬৬—অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ—হিপার্কস (নাঈস)

১৪৯২—আমেরিকা—কলম্বস (জেনোয়া)

১৪৯৮—ইয়ুরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ—ভাস্কো-ডা-গামা (পর্ত্তুগীজ)

১৮৫২—এভারেষ্ট—রাধানাথ শিকদার (বাঙালী)

১৫২৪—কানাডা—কার্টিয়ার (ফরাসী)

১৪৯২—কিউবা—কলম্বস (জেনোয়া)

১৬৪২—টাচ্‌মেনিয়া—টাচ্‌মেনি (ডাচ)

১৮১৮—ট্যাঙ্গানিকা—বার্টন এবং স্পিক (ইংরাজ)

১৪৮৬—ঝঞ্ঝা অন্তরীপ—ডায়াজ (পর্ত্তুগীজ)

১৬৪২—নিউজীল্যাণ্ড—টাচ্‌মান্ (ডাচ্)

১৫৯৭—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড—কবোট (ইংরাজ)

১৬১৬—বাফিনল্যাণ্ড—বাফিন (ইংরাজ)

১৪০০—ব্রাজিল—কেব্রাল (পর্ত্তুগীজ)

১৪৪১—ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ড—রস (ইংরাজ)

? —সিংহল—বিজয় সিংহ (বাঙালী)

১৭৭০—হাওয়াই—ক্যাপ্টেন কুক (ইংরাজ)

১৪৯২—হাইতি—কলম্বস (জেনোয়া)

আশ্চর্য্য ! কিন্তু সব সত্যি

ওয়েল্‌সের একটা ছোট্ট সহরের নাম পৃথিবীর সব সহরের নামের চেয়ে বড়। এর নাম **Slanfairpwelgyllgogerychwyrndrobwell-handissibigogoseh** ; এই কথাটার মানে **The church of St. Mary in a hollow of white hazel, near to the rapid whirlpool and to St. Timilis church near to red caves.**

সংসারত্যাগী না হ'য়েও এই ক'জন চিরকুমার বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন— পেট্রার্ক, ইতালিয়ান কবি ; মাইকেল্ এঞ্জেলো, ইতালিয়ান চিত্রকর ; শুপেনহর, জার্ম্মান দার্শনিক ; সুইনবার্ণ, ইংরাজ কবি ; ভল্টেয়ার, ফরাসী নাট্যকার ; সেসিল্ রোডস্, ইংরাজ ধনকুবের ; ওয়াল্ট হুইটম্যান, যুক্ত-রাষ্ট্রের কবি ; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ঋষিপ্রতীম বাঙালী বৈজ্ঞানিক।

বিশ্ববিজয়ী কুস্তী পালোয়ান গামার প্রত্যহ খাবারের তালিকা—সাধারণ সময়ে আড়াই সের রুটি, তিন সের ঘি দুধ আর এক সের বাদাম ; যখন কুস্তী লড়তে হয় তখন এ ছাড়াও—খানিকটা মুক্তাভস্ম, সাতটা মুর্গীর ষ্টু, আরো পাঁচ সের ঘি, কিছু সোনার পাত, খানিকটা দারচিনি আর পাঁচ সের ঘোল ; এই সময়কার দৈনিক খাবারের দাম পড়ে প্রায় এক শো টাকা। ইনি রোজ ছ হাজার বৈঠক আর পনের হাজার ডন দেন তারপর একদমে আট মাইল দৌড়ে আসেন।

যুগোশ্লাভিয়ার ভিঙ্কি কেব্‌লচী নামে এক ভদ্রলোক কেবল মাত্র ঘাস খেয়ে ১০৪ বছর বেঁচে আছেন।

জ্যেরেশ নামে এক স্প্যানীয়ার্ড ভদ্রলোক ইয়ুরোপে প্রথম তামাক খাওয়া প্রচার করেন। ইংল্যণ্ডে প্রথম গোল আলুর প্রচলন করেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে।

পৃথিবীতে প্রত্যেক মিনিটে ১০০ জন লোক জন্মাছে আর মারা যাচ্ছে প্রত্যেক সেকেণ্ডে একজন; প্রত্যেক বছরে তিন কোটি ক'রে লোক বাড়ছে। সারা পৃথিবীতে সবশুদ্ধ মোটমাট ছশো কোটি লোক ধ'রতে পারে; সুতরাং আর দুশো বছর পরে বেশী একটি লোকেরও জায়গা থাকবে না। তখন কি হবে?

সব চেয়ে লম্বা লোকের খোঁজ পাওয়া গেছে পারস্য দেশে; ইনি লম্বায় সাড়ে দশ ফিট, ওজন সাড়ে পাঁচ মণ, বয়স কুড়ি বছর, এবং সহজে চলাফেরা ক'রতে পারেন না।

সবচেয়ে বামন লোক হ'চ্ছেন ক্যাপ্টেন ডার্ণার; এঁর বাড়ী জার্ম্মাণীতে, ইনি ১ ফুট ৫½ ইঞ্চি লম্বা। আমেরিকাতে মিস মার্গারেট নামে এক মহিলা আছেন, তিনি ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, এঁর ওজন মাত্র ১০ সের।

পৃথিবীর সব চেয়ে ছোট বামন পরিবারের নাম "ষ্ট্রাস্ ডেভিট্" এই পরিবারের স্বামী ২০ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রী ১৯ ইঞ্চি আর ছেলে ৬ ইঞ্চি।

মেরী ওয়েষ্টন্ নামে এক মেয়ে কিছুদিন আগে হঠাৎ পুরুষ হ'য়ে গেছেন।

পর্ত্তুগীজরা ফার খুঁজতে গিয়ে ক্যানেডা, লঙ্কা খুঁজতে ভারতবর্ষ আর হাতীর দাঁত খুঁজতে দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল।

পৃথিবীর সব চেয়ে দামী পুরোণো ডাক টিকিট হ'চ্ছে বৃটিশ গিনীর ১৮৫৬ সালে ৪ সেণ্ট্ দামের টিকিট; এই টিকিট মাত্র একখানা পাওয়া যায়, এর দাম প্রায় এক লাখ চার হাজার টাকা। বৃটিশ গিনীর আর এক খানা দামী টিকিট ১৮৫০ সালের ২ সেণ্ট্ দামের গোল টিকিট; এর এখনকার দাম আটাত্তর হাজার টাকা। হাওয়াই দ্বীপের "মিশনারী" টিকিটগুলোর এক একখানার দাম প্রায় পঁয়তাল্লিস হাজার টাকা। মরিসাস দ্বীপের "পোষ্ট অফিস" নামে ২ পেন্সের টিকিটের দাম প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা, আমেরিকার "বস্কাওয়েন্" টিকিটগুলোরও দাম

প্রায় এই রকম। ভারতবর্ষের সব চেয়ে দামী টিকিট হ'চ্ছে ১৮৫৪ সালের ৪ আনা দামের টিকিট ; এখানার ছাপানোর দোষে চারিধারের ফ্রেমটা উল্টে গিয়েছে। এর দাম খুব কম ক'রেও চার হাজার টাকা।

টমাস্ ষ্টিভেন্সন্ নামে এক ইংরাজ প্রথম ভারতবর্ষে আসেন।

পৃথিবীতে প্রতি সেকেণ্ডে চার কোটি বত্রিশ লক্ষ মণ বৃষ্টি হয়।

ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময়ে যারা দাড়ি রাখতো তাদের প্রত্যেককে দাড়ি পিছু ৩ শিলিং ৪ পেন্স (২।৴০) ক'রে ট্যাক্স দিতে হ'তো পনেরো দিন অন্তর।

জার্ম্মাণীর একটি খবরের কাগজ থেকে জানা গিয়েছে "অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীতে ভুঁড়ির উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে।"

নতুন ধরণের রোটারী প্রেসগুলোতে চব্বিশ পাতার খবরের কাগজ ঘণ্টায় এক লাখ ক'রে ছাপা হয়।

ভিক্টর ক্লিস নামে এক ইংরাজ একটানা চার বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্যানেডার অশ্বারোহী পুলিস আর লণ্ডনের ট্রাফিক পুলিস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইয়ুরোপের আঙ্গোরাতে সৈন্য নেই, পুলিস নেই, ট্যাক্সও নেই, আইন কানুন নেই। ভারী মজার নয় কী ?

মনাকো হ'চ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ছোট স্বাধীন রাজ্য। এখানকার রাজস্বের বেশীর ভাগই আদায় হয় জুয়াখেলার ওপরকার ট্যাক্স থেকে।

১৮৯৫ সাল থেকে ভারত গবর্ণমেণ্ট সিংহল থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একটা সেতু তৈরী করবার চেষ্টায় আছেন। এই সেতুর নাম হবে "এডাম্‌স্ ব্রীজ।"

স্পেনে স্ত্রী স্বামীর উপাধি নেয় না ; ছেলেরা বাবার কিম্বা মার যার ইচ্ছা উপাধি গ্রহণ ক'রতে পারে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছাত্রাবস্থায় চাদর-নিবারণী সভা স্থাপনা ক'রেছিলেন।

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তাকালে দিকচক্রবাল রেখার দূরত্ব মনে হবে প্রায় তিন মাইল, ১০০ ফিট উঁচু থেকে চক্রবাল-রেখা দেখাবে ১৫ মাইল দূরে, ৫০ মাইল দেখতে হ'লে ১৫০০ ফিট উঁচুতে ওঠা দরকার।

কচুরীপানার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকায়। ১৮৮৪ সালে নিউওর্লিয়ন্স সহরের এক প্রদর্শনীতে কচুরী পানার গাছ ও ফুল দেখান হয়। যাঁরা প্রদর্শনীতে এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই কচুরী ফুল দেখে মুগ্ধ হ'য়ে নিজেদের পুকুরে এই গাছ লাগান। মিস মর্গানি নামে এক ভদ্র মহিলা সখ ক'রে বাঙ্‌লা দেশে এনে কচুরী গাছ বাগান বাড়ির পুকুরে বসান। এ বেশী দিনের কথা নয়, কিন্তু এরি মধ্যে কচুরী পানা সারা বাঙ্‌লা দেশ ছেয়ে ফেলেছে। একজন সখ ক'রে যে ফুলটি আনলেন সেই আজ বাঙালীর সর্ব্বনাশ ক'রছে।

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন গঙ্গার তলা দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ তৈরী ক'রে নিয়েছেন। হাওড়াতে বেশী জোরের বিদ্যুৎ নিয়ে যাবার জন্যে মোটা মোটা তার এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সুড়ঙ্গটীর ব্যাস সাড়ে ছ ফিট, লম্বা ১৭৩৫ ফিট আর গঙ্গার তলা থেকে ৪০ ফুট নীচে অবস্থিত। এসিয়ায় এরকম সুড়ঙ্গ আর নেই।

ইংরাজ এণ্টনী সাহেব বাঙ্‌লায় কবি গানের দল খুলে ছিলেন।

পুরাকালে মিশরে "ইনকিউবেটর" অর্থাৎ ডিম ফোটানোর যন্ত্রের প্রচলন ছিল, আধুনিক যন্ত্রটী উদ্ভাবিত হয় মাত্র ১৮৪৭ সালে।

লাইবেরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের আতলান্তিক মহাসাগরে দিনরাত ঝড়বৃষ্টি লেগেই আছে ; সেইজন্য এখানকার নাম "বর্ষা সমুদ্র"। যবদ্বীপে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বজ্রপাত হয় ; এখানে বছরে অন্ততঃ ২২৫ দিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাত হয়।

ঢাকার শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু ৬০টী সংখ্যাকে ৬০টী সংখ্যা দিয়ে মুখে মুখে গুণ ক'রে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার উত্তর ব'লে দিতে পারেন। এইটেই পৃথিবীর রেকর্ড।

জাপানের রাজধানী টোকিওর দোকানগুলোর ইংরাজী সাইনবোর্ড সবচেয়ে চমৎকার। একটা কাপড় ধোলাইএর দোকানে লেখা আছে—**We wash our customers very cheaply. Rate per hundred Ladies $2, Gents $1·75** ; একটা নাপিতের দোকানে সাইনবোর্ড আছে **Gentlemen Head Cutter** ; দাঁতের দোকানের সাইনবোর্ড হ'চ্ছে **Teeth Carpenter** ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকলের ধারণা যখন যীশুখৃষ্টের জন্ম থেকে খৃষ্টাব্দের সুরু তখন যীশুখৃষ্ট নিশ্চয়ই ১ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। কিন্তু তা নয়। যে বছর থেকে খৃষ্টাব্দের গণনা করা হয় তার চার বছর আগে খৃষ্ট জন্মেছিলেন অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের চার বছর আগে খৃষ্ট জন্মান। আশ্চর্য্য নয় কী ?

হিন্দু পুরাণের আদি মানব "মনু", মিশরের "মিনিস্", ক্রিজিয়ানদের "ম্যানিস্", লিভিয়ার—"মেন্স", গ্রাইগের—"মাইনস্" আর খৃষ্টানদের—"আদম"।

卐 অর্থাৎ স্বস্তিকা চিহ্ন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পুরোণো চিহ্ন। ভারতের মোহেন-জো-দড়োর ও ব্যাবীলন, মিশর প্রভৃতি সবদেশের পুরাযুগের স্থাপত্যে এই চিহ্নের ব্যবহার বহুলভাবে দেখা যায়। ভারতে স্বস্তিকা সূর্য্যের প্রতীক ; দক্ষিণাবর্ত্ত স্বস্তিকা মঙ্গলের চিহ্ন কিন্তু বামাবর্ত্ত স্বস্তিকা অমঙ্গল-জনক। স্বস্তিকা চিহ্ন বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর নাৎসী দলের জাতীয় প্রতীক।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ছোট সৈন্যবাহিনী হ'চ্ছে মনাকোর। এদেশে ৭৫ জন পদাতিক, ৭৫ জন অশ্বারোহী আর ২০ জন গোলন্দাজ সৈন্য আছে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বিশ্বাস ক'রতো যে রাজা ছুঁলেই গণ্ডমালা রোগ সেরে যায়।

ছবি আঁকবার তুলি তৈরী হয় উট, শুয়োর আর বেজী জাতীয় জন্তুর লোম দিয়ে, টেনিস ব্যাটের জালিদার অংশ তৈরী হয় শুয়োরের অন্ত্র দিয়ে।

মিসেস বার্ণার্ড সিনবার্গ একাদিক্রমে ৬৯টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে।

ক্যানেডার মিসেস ডিওনে নামে এক ভদ্রমহিলা একসঙ্গে মেয়ে প্রসব ক'রেছেন। এই মেয়েদের বলা হয় "ডিওনে কুইন্টিপ্লেট্‌স্।"

রাজ্যহীন রাজা

দেশ	রাজা	রাজ্য হারাণ
আফগানিস্থানের	আমানুল্লা	১৯২৯
ইংল্যাণ্ডের	অষ্টম এডোয়ার্ড	১৯৩৬
*গ্রীসের	দ্বিতীয় জর্জ্জ	১৯২৪
চীনের	সুয়ান্ টুং	১৯১২
জার্ম্মানীর	দ্বিতীয় উইলহেল্ম	১৯১৮
তুরস্কের	ষষ্ঠ সুলতান মহম্মদ	১৯২২
পর্ত্তুগালের	দ্বিতীয় ম্যানুয়েল	১৯২২
বুলগেরিয়ার	প্রথম ফার্দ্দানন্দ	১৯১৮
মক্কার	হোসেন	১৯২৫
মিশরের	আব্বাস হেল্মী	১৯১৭
রুশিয়ার	দ্বিতীয় নিকোলাস	১৯১৭
শ্যামের	প্রজাধিপক	১৯৩০
স্পেনের	ত্রয়োদশ এলফান্সো	১৯৩১
হাঙ্গারীর	কারী	১৯২০

* এঁকে পুনরায় রাজপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

জীবনী

(বাঙালীদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে)

§—দেখ

অশোক—(২৭২-২৩২ খৃঃ পূঃ), প্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশীয় একছত্র ভারত সম্রাট ; প্রথম্ জীবনে ইনি চণ্ডাশোক নামে পরিচিত হ'লেও পরজীবনে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি কল্পে এক বিরাট কীর্ত্তি রেখে যান। ইনিই পৃথিবীতে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এইচ্, জী, ওয়েল্‌স্ বলেন—"অশোক সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্" ।

আইনষ্টাইন্ এলবার্ট—(জ ১৮৭৯), বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ ইহুদী অঙ্কশাস্ত্রবিদ্, আপেক্ষিক্ত মতবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত ; ইনি "নোবেল লরিয়েট" (প) ; বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে আমেরিকায় বাস ক'রছেন।

আর্কেমেডিস্—(২৮৭-২১২ খৃঃ পূঃ), প্রসিদ্ধ গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, ইনি আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ক'রে গিয়েছেন।

আতাতুর্ক কেমাল পাশা—(১৮৮১-১৯৩৮) নব তুরস্কের জন্মদাতা এঁর দৃঢ়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা জগদ্বিখ্যাত।

আনা পাভ্‌লোভা,—(১৮৮৫-১৯৩১), বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান সুন্দরী নৃত্যশিল্পী।

আঁটো ফ্রাঁ—(১৮৪৪-১৯২৪), প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ; "থেজ" এঁর বিখ্যাত রচনা, ইনি "নোবেল লরিয়েট" (সা)।

আমানুল্লা—(জ ১৮৯২), আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা, ইনি আধুনিক উপায়ে দেশের উন্নতি ক'রতে গিয়ে রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হন ও ১৯২৯ সালে প্রাণ নিয়ে ইতালিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

আর্য্যভট—(৪র্থ শতক খৃঃ পূঃ), বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্, ইনিই পৃথিবীর গোলত্ব ও আবর্ত্তন প্রথম প্রমাণ করেন।

আলেকজন্দার দি গ্রেট—(৩৫৬-৩২৩ খৃঃ পূঃ), গ্রীসের অন্তর্গত মাসিদোনিয়ার অধিপতি, ইনি বিশ্ববিজয়ে বের হন; মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় ক'রে ভারতে আসেন কিন্তু কোন কারণে ভারত জয় স্থগিত রেখে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইকবাল—(১৮৬৮-১৯৩৮), প্রসিদ্ধ পঞ্জাবী উর্দ্দু কবি, এঁর "মেরি সোনেকি হিন্দুস্থান" গান ভারত বিখ্যাত।

ঈশপ্—(৬২০-৫৪৪ খৃঃ পূঃ), গ্রীসের প্রসিদ্ধ নীতিমূলক গল্প লেখক ইনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, এঁর "ঈশপ্স্ ফেব্ল্" এখনো ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব প্রচলিত।

এডিসন টমাস আলভা,—(১৮৪৭-১৯১১), আমেরিকান বৈজ্ঞানিক; টেলিফোন, টেলিগ্রাম, চলচ্চিত্র, সবাকচিত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত।

উদয়শঙ্কর—(জ ১৯০০), বিখ্যাত বাঙালী নৃত্যশিল্পী, ইনি সারা পৃথিবীময় ভারতীয় নৃত্যকলা প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন।

ওমর খৈয়াম—(১০৫২-১১২৩), প্রসিদ্ধ পারস্যদেশীয় কবি ও গণিতবিদ্, এঁর রুবায়েৎ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হ'য়েছে।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ—(১৭৭০-১৮৫০), শ্রেষ্ঠ "লেকপোয়েট", এঁর মত প্রাকৃতিক কবি খুব কমই জন্মান, ইনি পরবর্ত্তী জীবনে "পোয়েট লরিয়েট্" হন।

ওয়াশিংটন জর্জ্জ,—(১৭৩২-৯৯), আমেরিকাবাসী ইংরাজ, ইনি স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্ব করেন ও স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন।

ওয়েলস এইচ, জি—(জ ১৮৬৬), বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক ; চমৎকার ভাবে সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি কঠিন কঠিন জিনিষ সাধারণ লোককে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা এঁর মত খুব কম লোকেরই আছে। "কীপস্", "আউট লাইন অব ওয়ার্ল্ড্স্ হিষ্টরী", "সায়েন্স অব লাইফ" এঁর প্রসিদ্ধ বই।

কলম্বস কৃষ্টোফর—(১৪৫১-১৫০৬), বিখ্যাত জেনোয়াবাসী নাবিক, ১৪৯৮ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

কুরী পিয়ারে—(১৮৫৯-১৯০৬) ও মাদাম (১৮৬৭-১৯৩৪), প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দম্পতি, এঁরা একসঙ্গে "নোবেল লরিয়েট" (প) হন, পিয়ারে ছিলেন ফরাসী আর মাদাম প্যোলীস, স্বামীর মৃত্যুর পর মাদাম আর একবার নোবেল প্রাইজ পান, এঁরা রেডিয়াম আবিষ্কার করেন।

কৃত্তিবাস—(১৪শ শতাব্দী), রামায়ণ অনুবাদকারী প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি, এঁর জন্মস্থান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে।

গর্কি—(জ ১৮৬৮), প্রসিদ্ধ রাশিয়ান বৈপ্লববাদী ঔপন্যাসিক ; এঁর বিখ্যাত বই "মাদার" ; রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট এঁর নামে একখানা গ্রাম প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন।

গলস্‌ওয়ার্দ্দী—(১৮৬৭-১৯৩৩), বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক, ইনি "নোবেল লরিয়েট্" (সা), "ফোর সাইট্-সাগা" এঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই।

গান্ধি মোহনচাঁদ করমচাঁদ—(জ ১৮৬৯) ভারতের মুক্তিকামী, অহিংসবাদী মহর্ষি ; রোঁমা রোঁলার মতে ইনি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র—(১৮০৫-৫৯), ইনি আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা ; এঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র "প্রভাকর" সে যুগের রত্ন-বিশেষ ছিল ; এঁর জন্মস্থান নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে।

গ্যেটে—(১৭৪৯-১৮৩২), প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ কবি, এঁর লেখা "ফাউষ্ট" এঁকে অমর ক'রে রেখেছে।

ঘোষ অরবিন্দ,—(জ ১৮৭২), বিখ্যাত স্বদেশী যুগের নেতা, আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু কোন সামান্য কারণে অমনোনীত হন, ইনি আলিপুরের বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়েন কিন্তু পরে মুক্তি পান, রাজনীতি ছেড়ে এখন ভগবচ্চিন্তায় মন দিয়েছেন ও পণ্ডীচেরীতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, যোগ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এঁর অনেক বই আছে।

চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাধর—(১৮৩৩-৮৬), পরবর্ত্তী জীবনে "রামকৃষ্ণ পরমহংস" নামে পরিচিত, এক অলৌকিক পুরুষ, কালীসাধনায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন, বিবেকানন্দ এঁর শিষ্য ছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ সেবা প্রতিষ্ঠান "রামকৃষ্ণ মিশন" এঁর পূণ্যস্মৃতি স্মরণার্থে প্রতিষ্ঠিত।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র,—(১৮৩৮-৯৩), বাঙ্‌লার সাহিত্য-সম্রাট ও আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষার অন্যতম জন্মদাতা (§ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস) এঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির তুলনা হয় না। ইনিই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের রচয়িতা, এঁর বাড়ী নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে। এঁর লেখার জন্য § "বাঙলা ভাষার কয়েকখানি বিখ্যাত বই"।

চট্টোপাধ্যায় রামানন্দ,—(জ ১৮৬৫), প্রতিভাশালী সম্পাদক ও সমাজ সংস্কারক, এঁর সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ সুচিন্তিত, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতামতের জন্য বিখ্যাত, এঁর বাড়ি বাঁকুড়ায়।

চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র,—(১৮৭৬-১৯৩৮), আধুনিক বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরদী ঔপন্যাসিক, এঁর "শ্রীকান্ত" এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এত বড় প্রতিভাবান লেখক পৃথিবীতে এযাবৎ খুব কমই জন্মেছেন। শরৎ বাবুর জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে; এঁর বইএর তালিকার জন্য § "বাঙ্‌লা ভাষায় কয়েকখানি বিখ্যাত বই।

চ্যাপলিন চার্লি—(জ ১৮৮৯), পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিনেমা অভিনেতা, ইনি হাসির মধ্যে দিয়ে যে ভাবে কান্না ফুটিয়ে তোলেন তা সত্যিই অপূর্ব্ব, ইনি ইংরাজ।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ,—(জ ১৮৫৬), প্রসিদ্ধ আইরিস্ বিদ্রুপাত্মক নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচয়িতা, এঁর বিখ্যাত বই "ব্যাক্ টু মেথুশীলা" ও "অ্যাপেল কার্ট", ইনি "নোবেল লরিয়েট্" (সা)।

জেমস্ জীন্‌স্, স্যর—(জ ১৮৭০), বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ পদার্থ ও গণিতবিদ্, এঁর "মিষ্টিরিয়াস ও ইউনিভার্স" বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই, ইনি ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জুবলী অধিবেশনের সভাপতি হ'য়েছিলেন।

টমাস্ মান,—(জ ১৮৭৫), বিখ্যাত জার্ম্মান সাহিত্যিক, ইনি "নোবেল লরিয়েট্" (সা); এঁর বিখ্যাত বই "দি কাইজার", এঁকে বর্ত্তমানে হিট্‌লার শাসিত জার্ম্মাণী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

টলষ্টয়—(১৮২৮-১৯১০) বিশ্ববিশ্রুত রাশিয়ান সাহিত্যিক ও দার্শনিক, এঁর "হোয়াট ইজ্ আর্ট" ও "হোয়াট্ দেন্ মাষ্ট্ উই ডু" পৃথিবী শুদ্ধ লোককে ভাবিয়ে তুলেছে।

ট্রটস্কী লিউডেভিডোভিক্,—(জ ১৮৭০), বিখ্যাত আত্মত্যাগী রাশিয়ান বিপ্লববাদী ইনি লেলিনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন কিন্তু এখন দেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে মেক্সিকোতে আশ্রয় পেয়েছেন।

ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ,—(জ ১৮৭১), আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তক, এঁর আঁকা "বিরহী যক্ষ", "শাজাহানের মৃত্যু", "তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিসত্ত্ব" ভারতীয় চিত্রকলার এক অপূর্ব্ব সম্পদ, ইনি ছোটদের লেখক হিসাবেও সামান্য পরিচিত নয়। এঁর "ভূতপত্রী", "খাজাঞ্চীর খাতা" ইত্যাদি নিয়ে যে কোন দেশের শিশুসাহিত্য গর্ব্ব ক'রতে পারে।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,—(জ ১৮৬১), বিশ্বকবি, বাঙলা সাহিত্যের সকল শাখাই এঁর করস্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে, এঁর প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতন" ও "বিশ্বভারতী" ভারতের প্রাচীন তপোবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষায়তন, ইনি গীতাঞ্জলীর ইংরাজী অনুবাদের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পান। এঁর লেখার জন্য § "বাঙলা ভাষায় কয়েকখানি বিখ্যাত বই।"

ডাভিন্সি লিওনার্ড,—(১৪৫২-১৫১৯), প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকর এর আঁকা 'মোনা লিসা' অত্যন্ত বিখ্যাত ছবি।

দত্ত অক্ষয়কুমার,—(১৮২১-৮৭), বাঙলার প্রসিদ্ধ গদ্যলেখক, এর "স্বপ্নদর্শন" অত্যন্ত চিন্তাপূর্ণ ভাবগভীর লেখা।

দত্ত নরেন্দ্রনাথ,—(১৮৬২-১৯০২), ইনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। ইনি আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করেন, রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, লেখক ও জাতীয়তাবাদী হিসাবেও খ্যাতি অসামান্য।

দত্ত মাইকেল মধুসূদন,—(১৮২৪-৭৩), বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইনি এক নতুন ভাবস্রোত এনেছিলেন, এঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা "মেঘনাদবধ কাব্য" বাঙালীর অমূল্যসম্পদ, এঁর বাড়ি যশোর জেলার কপোতাক্ষ গ্রামে।

দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ—(১৮৮০-১৯২১), প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি, ছন্দের ওপর এঁর দখল অসামান্য, ইনি জাতীয়তাবাদী কবিতার জন্যও বিখ্যাত।

দাস কাশীরাম— (১৭শ' শতাব্দী) বাঙ্‌লায় মহাভারতের অনুবাদের জন্য বিখ্যাত, এঁর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গীগ্রামে।

দাস চিত্তরঞ্জন—(১২৭৭-১৩২২), বাঙ্‌লা তথা ভারতের মুক্তিকামী শ্রেষ্ঠ নেতা, এঁর ত্যাগ অতুলনীয়। ইনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রের অন্তরে প্রবেশ ক'রে তাকে ধ্বংস ক'রবার প্রয়াসী ছিলেন, ইনিই স্বরাজ-পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

নাইডু সরোজনী—(জ ১৮৭৯), এঁর পিতা বাঙালী, এঁর মত ইংরাজী কবিতা রচনা ক'রতে কোন ইংরাজেতর কবি আছেন কিনা সন্দেহ। ইনি স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও প্রথম ভারতীয় কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী হন। "দি বার্ড অব টাইম" এঁর বিখ্যাত বই।

নাইটিংগেল ফ্লোরেন্স—(১৮২০-১৯১০), বিখ্যাত ফরাসী সেবাময়ী মহিলা, ইনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে একটি সেবাদল গঠন ক'রে আহতদের অন্তরে সেবা করেন, এঁর আদর্শ সারা পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত ক'রেছে।

নিউটন আইজাক, স্যর—(১৬৪২-১৭২৭), বিখ্যাত ইংরাজ গণিতবিদ্ ও দার্শনিক, ইনিই ইয়ুরোপে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রথম আবিষ্কার করেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি—(১৭৬৯-১৮২১), বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সম্রাট, সমগ্র পৃথিবী জয় মনস্থ ক'রেছিলেন, অনেক জয়লাভের পর অবশেষে সকলের সমবেত আক্রমণে পরাস্ত হন ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিজীবন যাপন ক'রতে বাধ্য হন; এত বড় যোদ্ধা আর নাকি জন্মায় নি।

নেহেরু জহরলাল,—(জ ১৮৮৯), বিখ্যাত কংগ্রেসসেবী, অসাধারণ বক্তা ও ভূতপূর্ব্ব চরমপন্থী কংগ্রেস-সভাপতি, ইনি বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এঁর "অটোবায়োগ্রাফী" ও "লেটার্স টু মাই ডটার্স" খুব প্রসিদ্ধ বই।

বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র— (১৮২০-৯১), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামেই সমধিক প্রচারিত, প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক ও বাঙ্‌লা গদ্যের জন্মদাতা, এঁর বাল্য জীবনের দারিদ্র্যতার সঙ্গে যুদ্ধ প্রবাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ইনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন, "শকুন্তলা" "সীতার বনবাস" এঁর প্রসিদ্ধ বই।

বন্দোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ, স্যর—(১৮৪৮-১৯২৫), ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা, ইনি প্রচণ্ড বাগ্মী ছিলেন ও রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

বন্দোপাধ্যায় হেমচন্দ্র—(১৮৩৭-১৯০৩), "বৃত্রসংহার" রচয়িতা প্রসিদ্ধ স্বদেশানুরাগী বাঙালী কবি।

বসু জগদীশচন্দ্র, স্যর—(১৮৫৮-১৯৩৭), জগদ্বিখ্যাত বাঙালী পদার্থ ও উদ্ভিদবিদ্। ইনি উদ্ভিদের প্রাণের কথা প্রথম প্রচার ক'রে সকলের কাছে নমস্য হ'য়েছেন। সাহিত্যিক হিসাবেও এঁর খ্যাতি কম নয়।

বসু নন্দলাল—বিখ্যাত বাঙালী চিত্রকর, ভারতীয় কলায় এঁর সমান পারদর্শীতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না, ইনি শান্তিনিকেতনের কলা অধ্যক্ষ।

বসু সুভাষচন্দ্র—(১৮৯০), আধুনিক বাঙ্‌লার যুবশক্তির অগ্রদূত, জেলে থেকে এঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, ইনি এখন কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৮)।

বার্ণহার্ড সারা—(১৮৪৪-১৯২৩), সারা পৃথিবীতে এযাবৎ যত অভিনেত্রী জন্মেছেন ইনিই নাকি তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিঠোফেন—(১৭৭০-১৮১৭), জগদ্বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান গীতিশিল্পী; এঁর চেয়ে বড় গীতিশিল্পী বোধ হয় ইয়ুরোপে আর জন্মায় নি, ইনি জন্ম-বধির ছিলেন।

বিদ্যাপতি—(১৫শ শতক), মিথিলার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি, এঁর ব্রজবুলিতে লেখা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি বাঙালীরা অত্যন্ত আপন ক'রে নিয়েছে।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র—§ বন্দোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র।

বিবেকানন্দ স্বামী—§ দত্ত নরেন্দ্রনাথ।

বিশ্বাস সুরেশচন্দ্র, কর্ণেল—(১৮১১-১৯০৫) বিখ্যাত বাঙালী বীর, ইনি এক সার্কাসপার্টির সঙ্গে ব্রাজীলে যান এবং সেখানকার গৌরযুদ্ধে যোগ

দিয়ে কর্ণেল হন ও ব্রাজীলের অন্যতম সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক ব'লে গণ্য হন, এঁর বাড়ি কৃষ্ণনগর।

বুদ্ধদেব—§ বৈদিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষ।

ব্র্যাডম্যান—(জ ১৯০২), অষ্ট্রেলিয়ান, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়ার।

ভাদুড়ি শিশিরকুমার এম, এ—(জ ১৮১৭), এত বড় শক্তিমান অভিনেতা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মান, এঁর চরিত্র সৃষ্টিক্ষমতা অপূর্ব্ব, ইনি আগে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

ভ্যালেরা ডি—(জ ১৮৭২), আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, ইনি পরে স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট হন।

মহম্মদ—(৫৭০-৬৩২), ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, এঁর বাড়ি ছিল আরবে ; ইনি একেশ্বরবাদী ছিলেন।

মহাবীর বর্দ্ধমান—§ বৈদিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষ।

মাইকেল এঞ্জেলো—(১৪৭৪-১৫৬৪), ইতালীয় চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, এঁর আঁকা "শেষ বিচার" জগদ্বিখ্যাত।

মার্কনী—(১৮৭৪-১৯৩৭), ইতালীয় পদার্থবিদ্ ও "নোবেল লরিয়েট্" (প), ইনি বেতার আবিষ্কার করেন।

মার্কস্ কার্ল—(১৮১৮-৮৩), বিখ্যাত জার্ম্মাণ সমাজতন্ত্রবাদ ও সোসিয়ালিজমের প্রবর্ত্তক।

মীরাবাই—(১৬শ শতাব্দী), মেবারের রাণা কুম্ভের পত্নী, এঁর কৃষ্ণপ্রেমের ভজন গানগুলি অতুলনীয়।

মুখোপাধ্যায় ধনগোপাল—বাঙালী সাহিত্যিক, আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক ব'লে পরিগণিত হন। ইনি আমেরিকার শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "পুলিটজ প্রাইজ" পান। এঁর "জাঙ্গল বীষ্টস্ অ্যাণ্ড মেন" "চিত্রগ্রীব" ইত্যাদি বই খুব প্রসিদ্ধ।

মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, স্যর—(১৮৬৪-১৯২০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ভাইস-চ্যান্সেলার ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় বাঙ্‌লা ভাষা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁরই চেষ্টায় বাঙ্‌লা ভাষা আজ এম, এ পরীক্ষাতে পর্য্যন্ত পাঠ্য হ'য়েছে, এঁর তেজস্বীতা ও মণীষা জগদ্বিখ্যাত।

মুসলিনী বেনিটো—(জ ১৮৮৩), ইটালীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতা ও কর্ণধার। এঁর উপাধি "ইল ডিউস্", এঁর দলকে বলা হয় ফ্যাসিষ্ট।

মেটারলিঙ্ক—(জ ১৮৬২), প্রসিদ্ধ বেলজীয়ান রূপক কবি, এঁর "ব্লুবার্ড" একখানা বিখ্যাত রূপক কাব্য, ইনি "নোবেল লরিয়েট্" (সা,)।

যিশুখৃষ্ট—(৪ খৃঃ পূঃ—৩০ খৃষ্টাব্দ), খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ত্যাগী মহাপুরুষ, এঁর জন্ম জেরুজেলামে, বিধর্ম্মীরা এঁকে ক্রুসে বিদ্ধ ক'রে হত্যা করে।

রবিবর্ম্মা রাজা,—(১৮৪৮-১৯০৭), আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্রবিদ্যার জন্মদাতা। এই মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি এদেশের চিত্রবিদ্যাকে এক নতুন জীবন দান ক'রে গেছেন, এঁর বাড়ি ত্রিবান্দমের কাছে কির্লিমান গ্রামে।

রমন চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরাম স্যর,—(জ ১৮৮০), প্রসিদ্ধ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, ইনি "নোবেল লরিয়েট্ (পা)"। আকাশ কেন নীল এই সম্বন্ধে এঁর গবেষণা বিখ্যাত।

রাফেলো—(১৪৮৩-১৫২০), শ্রেষ্ঠ ইতালীর চিত্রকর, এঁর আঁকা মাতৃমূর্ত্তির পৃথিবীতে তুলনা মেলে না।

রায় দীলিপকুমার—(জ ১৮৯৫), ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, লেখক হিসাবেও যথেষ্ট পরিচিত।

রায় দ্বিজেন্দ্রলাল—(১৮৬৩-১৯১৩), ঐ পিতা, বিখ্যাত জাতীয়তা-বাদী বাঙালী নাট্যকার ও কবি। এর "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গানগুলি বাঙালীর জাতীয় সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরে, এঁর লেখার জন্য § "বাঙ্‌লা ভাষায় কয়েকখানি বিখ্যাত বই।

রায় প্রফুল্লচন্দ্র (জ ১৮৬১), পৃথিবী বিখ্যাত, ভারতীয় ঋষিপ্রতীম, সর্ব্বত্যাগী, জাতীয়তাবাদী আজীবন কুমার রাসায়নিক ; "বেঙ্গল কেমিক্যাল" প্রমুখ বহু স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের ইনি জন্মদাতা।

রায় মানবেন্দ্র—প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা। এঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ইনি রাশিয়ান বলশেভিক আন্দোলনের প্রধান অন্যতম নেতা ছিলেন। এখন ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে র'য়েছেন।

রায় রামমোহন, রাজা—(১৭৭৪-১৮৮৩), ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। উপনিষদ থেকে হিন্দুধর্ম্মের সার নিয়ে এই ধর্ম্ম প্রচারিত, দিল্লীর বাদশাহের দৌত্য নিয়ে ইনি বিলাত যান ও সেখানেই বৃষ্টলে মারা যান। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় বিলাতযাত্রী।

রোঁলা রোঁমা—(জ ১৮৬৬), প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক, এঁর লেখা "জাঁ ক্রিঁস্তোফা" খুব বিখ্যাত ও পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় বই। ইনি "নোবেল লরিয়েট্" (সা)। ইনি গান্ধি, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীর জীবনী লিখেছেন।

লুথার মার্টিন—(১৪৮৩-১৫৪৬), বিখ্যাত জার্ম্মাণ সমাজ-ও ধর্ম্ম-সংস্কারক, ইনিই "প্রোটেষ্টোণ্ট" মতের প্রচারক, এঁর মতালম্বীরা পোপের আধিপত্য মানেন না।

লেগারলফ সেল্‌মা—(জ ১৮৫৮), বিখ্যাতা সুইডীশ মহিলা সাহিত্যিক ও "নোবেল লরিয়েট্" (সা)।

লেনিন ভ্লাড্‌মীর ইলীচ্ উলিয়ানভ্—(১৮৭০-১৯২৪), রাশিয়ান বলশেভিক বিপ্লববাদের নেতা, ইনিই জারের হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করেন ও পরে রাশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা হন।

শিকদার রাধানাথ—(১৮১৩-৭০), প্রসিদ্ধ বাঙালী ভৌগলীক ও গণিতবিদ্। ইনি এভারেষ্ট আবিষ্কার করেন এবং এটাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ তাই প্রমাণ করেন।

শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর—(৯৮০-১০৫০), বিখ্যাত বাঙালী ধর্ম্ম প্রচারক, মহাপণ্ডিত, বৌদ্ধঋষি ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আহুত হ'য়ে ইনিই প্রথমে তিব্বতে যান।

শ্রীচৈতন্যদেব—(১৪৮৪-১৫৩৩), নবদ্বীপে এঁর জন্মস্থান, সন্ন্যাসী প্রচারকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই মহাপণ্ডিত প্রেমের অবতার সারা ভারতময় প্রেম ও বিশ্বাসেই যে ভগবদ্ লাভ হয় তাই প্রচার ক'রে বেড়ান।

ষ্টালিন জোসেফ ভিসারিও নোভিচ্—(১৮৭৯), বিখ্যাত রাশিয়ান বলশেভিকবাদী, এখন রাশিয়ায় একচ্ছত্র প্রবল প্রতাপান্বিত শাসন-কর্ত্তা।

সান ইয়াৎসেন—বিখ্যাত চীন কম্যুনিষ্ট, ইনি চীনকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেন ও পরে চীনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

সানী বীরবল,এফ, আর, এস—(জ ১৮৯১) লক্ষ্ণৌ নিবাসী বিখ্যাত ভারতীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্।

সাহা মেঘনাদ এফ, আর, এস—(জ ১৮৯৩) ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ, ইনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন।

সিংহ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, লর্ড—(১৮৬৩-১৯) একমাত্র ভারতীয় লর্ড, ইনি বিহারের গবর্ণর হন। এঁর বাড়ী বীরভূম জেলার রায়পুরে।

সেনগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ—বিখ্যাত ত্যাগী বাঙালী রাজনীতিবিদ, ইনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। এর বাড়ী চট্টগ্রামে।

সীগমণ্ড ফ্রয়েড—(জ ১৮৫৬), বিখ্যাত ইহুদী অষ্ট্রিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ্, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এরকম মণীষীর সন্ধান মেলে না, হিটলার এঁকে অষ্ট্রিয়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় ইনি এখন ইংল্যণ্ডে রয়েছেন।

সেক্সপীয়ার—(১৫৪৪-১৬১৬), ইংল্যণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার; "ম্যাকবেথ", "মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস", "হ্যামলেট", "কিং লিয়ার" প্রভৃতি নাটক এঁর বিখ্যাত রচনা।

হর্ষবর্দ্ধন—(৬ষ্ঠ শকাব্দ), প্রসিদ্ধ ভারতীয় সম্রাট, ইনি দানবীর ও সাহিত্যিক ছিলেন, "রত্নাবলী" এঁরই রচনা। নাগানন্দ, বাণভট্ট প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত এঁর সভাসদ ছিলেন।

হিটলার অ্যাডল্‌ফ—(জ ১৮৮৯), অষ্ট্রিয়ান, নাৎসী দলের অধিনেতা, সামান্য সৈনিক পদ থেকে ক্রমে ক্রমে আজ জার্ম্মাণীর সর্ব্বময়কর্ত্তা, ইহুদী বিতাড়ণকারী আর্য্যপ্রেমী ডিক্টেটর হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

হুডিনী—(১৮০৫-৭১), বিখ্যাত ফরাসী দেশীয়—যাদুকর, এঁকে "যাদু সম্রাট" বলা হয়।

হ্যানিমান—(১৭৭৫-১৮৪৩), বিখ্যাত জার্ম্মাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্মদাতা।

হ্যান্সক্রিশ্চান এণ্ডারসন্—(১৮০৪-৭৫), এঁর মত রূপকথা লেখক নাকি আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি, ইনি ছিলন ডাচ্।

হ্যামসন্ ন্যুট—(১৮৫৯), বিখ্যাত নরওয়েজীয়ান লেখক, এঁর "গ্রোথ অব দি সয়েলের" তুলনা মেলে না। ইনি "নোবেল লরিয়েট" (সা)।

সভা, সমিতি, সঙ্ঘ

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস—অথবা ভারতীয় জাতীয় মহাসভা, এই কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ও বিস্তৃতি পৃথিবীর যে কোন সমিতির চেয়ে বেশী। ইংরাজ সিভিলিয়ন আলেন্ হিয়ুমের চেষ্টায় ভারতীয় রাষ্ট্রসভা স্থাপিত হয়। এই সভার এখনকার মূলমন্ত্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনা। সুভাষচন্দ্র বসু এর বর্ত্তমান সভাপতি।

ওয়াই, এম্, সি, এ—অথবা ইয়ং মেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন্—১৮৪০ সালে স্যার জর্জ্জ উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডে এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনা করেন। বিশ্বের তরুণদের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্রিশ্চিয়ান সমিতি হ'লেও এর সভ্যপদ ক্রিশ্চিয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নয়। সারা পৃথিবীতে ৯,৫৭৮ টি শাখা আছে।

ওয়াণ্ডার ভোগেল—এই কথাটার মানে "উড়ো পাখী"; এটি জার্ম্মাণীর একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠান; সারা জার্ম্মাণীতে এর শাখা আছে; এর কিশোর-কিশোরী সভ্যেরা ছোট ছোট দলে কিম্বা একা একা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়; দেহের ও মনের উন্নতি করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ক্লু-ক্লুক্স-ক্লন্—যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুপ্ত সমিতি। এর উদ্দেশ্য শ্বেত-কায় জাতির সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষণ ও নিগ্রোদের দমনে রাখা।

গার্ল-গাইড—বালিকাদের প্রতিষ্ঠান। মূল নীতি স্কাউটদের মত।

পি, ঈ, এন—লেখকদের জগদ্ব্যাপী একটি ক্লাব; এর মানে Poets and Playwrights (কবি ও নাট্যকার) Essayists and Editors (প্রবন্ধ লেখক ও সম্পাদক) এবং Novelists (ঔপন্যাসিক) সঙ্ঘ।

এইচ্, জী, ওয়েল্‌স্ এই সভার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ-সভাপতি। প্রত্যেক সভ্যদেশে এর কেন্দ্র আছে, ভারতে এর কেন্দ্র বোম্বাইতে, রবীন্দ্রনাথ এখানকার সভাপতি; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ ও সরোজিনী নাইডু সহ-সভাপতি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—এই পরিষদ ভারতের মধ্যে যে কোন প্রাদেশিক ভাষা সংক্রান্ত সভাসমিতির চেয়ে বড়। এই পরিষদের উদ্দেশ্য বাঙ্‌লা ভাষার উন্নতি সাধন করা। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয়। এর একটি নিজস্ব ম্যুজীয়াম আছে।

বালীল্লা—ইতালীর এক তরুণ সঙ্ঘ; কার্য্যপন্থা "ওয়াণ্ডার ভোগেলের মত।

ব্রতচারী সঙ্ঘ—গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। এর সভ্যেরা আপন আপন চরিত্র গঠন ও সমাজের কল্যাণের জন্য "১৭টি পণ ও ১৬টি মানার" অনুশীলন ক'রে থাকেন। লোকনৃত্য এই সঙ্ঘের প্রধান অঙ্গ।

রয়েল সোসাইটি অব ইংলণ্ড—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎ-সাহী সভা। ১৬৬০ সালে ইংল্যণ্ডেশ্বর ২য় চার্লসের কাছে এই সভা সনন্দ পায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনিষীরাই এর সভ্য, এর সভ্যদের এফ, আর, এস্ বলা হয়। ৺জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম ভারতীয় এফ, আর, এস্।

সোকোল—চেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ সঙ্ঘ—কর্ম্মপদ্ধতি "বালীল্লার" মত।

সেণ্ট্‌জন্ অ্যাম্বুলেন্স—আহত ও বিপন্নদের সেবা করাই এর উদ্দেশ্য। ১০৪৮ সালে প্যালেষ্টাইনের তীর্থ যাত্রীদের সাহায্যকল্পে "অর্ডার অব্ সেণ্ট্‌জন্ অব্ জেরুজালেম্" স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি এরই আদর্শে অনুসৃত।

স্যালভেশান্ আর্ম্মি—১৮৭৭ সালে উইলিয়াম বুথ, সামরিক প্রথায় এই সেবাদল গঠন করেন। বর্ত্তমানে ৮৮টি বিভিন্ন দেশে দুঃস্থ ও পতিতদের উন্নতি সাধনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের শাখা গ'ড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মুখপত্রিকা ৭১ টি ভাষায় সম্পাদিত হয়।

স্কাউট্‌দল—১৯০৬ সালে লর্ড বেডেন প্যাওয়েল্ বালকদের স্বাবলম্বী, চরিত্রবান, সদাচারী ও স্বদেশহিতৈষী ক'রে তুলবার জন্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সারা পৃথিবীতে প্রায় কুড়ি লক্ষ স্কাউট্ আছে।

নোবেল প্রাইজ

সারাজীবনের সঞ্চিত ধনরাশি যাঁরা পরার্থে দান ক'রে গেছেন আলফ্রেড্ বার্ণার্ড নোবেল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বকীয় সাধনা দিয়ে দুনিয়ার জ্ঞান ভাণ্ডার যাঁরা সমৃদ্ধ করেন তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে নোবেল প্রায় সাতাশ কোটি টাকা এক সুইডীশ্ ট্রাষ্টের হাতে রেখে গেছেন। এই টাকার আয় থেকে প্রত্যেক বছরে সাহিত্য, রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শান্তি, এই পাঁচটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গবেষণাকারীদের পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেক পুরস্কার প্রায় একলাখ কুড়ি হাজার টাকা। নোবেল ধ্বংসের প্রতীক ডিনামাইটের আবিষ্কারকর্ত্তা আবার তিনিই জগতের মঙ্গলের জন্য এই রকম অবিশ্বাস্য দান ক'রে গেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ পান। যাঁরা নোবেল প্রাইজ পান তাঁদের বলে "নোবেল লরিয়েট।"

নীচে এযাবৎ যাঁরা সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল।

	সাহিত্য	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়নবিজ্ঞান
১৯০১	শালিপ্রধম্নণ (ফ)	রণ্‌জন্ (জ)	ভ্যানটি'হফ্ (হ)
১০০২	মমসেন (জ)	লরেন্স ও জীমান্ (হ)	ফিসার (জ)
১৯০৩	বোর্ণসন (ন)	বেকারেল ও পীয়ারী দম্পতী (ফ)	এরেনাস (সু)
১৯০৪	মিষ্ট্র্যাল (ফ) একেগ্যার (স্প)	র‍্যালে (ইং)	রামজে (ইং)
১৯০৫	সিয়েঙ্কুজ (প)	লেনার্ড (জ)	বেয়ার (জ)

	সাহিত্য	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়নবিজ্ঞান
১৯০৬	কার্দ্দুসী (ই)	টমসন্ (ইং)	ময়সাঁ (ফ)
১৯০৭	কিপলিং (ইং)	মাইকেলসন (আ)	বুকনার (জ)
১৯০৮	অয়কেন (জ)	লিপমান (ফ)	রাদারফোর্ড (ইং)
১৯০৯	লেগার্লফ্ (সু)	মার্কনী (ই), ব্রাউন (জ)	অষ্টওয়াল্ড (জ)
১৯১০	হেইজে (জ)	ভ্যাণ্ডারওয়াল (হ)	ওয়ালাক (জ)
১৯১১	মেটারলিঙ্ক (ব)	হ্বাইন (জ)	মাদাম কুরী (ফ)
১৯১২	হপ্‌মান্ (জ)	ডলেন (সু)	গ্রীগনাউ ও সাবেটিয়ার (ফ)
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(বা)	লিঙ্‌ওনেস (হ)	হ্বার্ণার (সু)
১৯১৪	*	ফ্যানলয়েন (জ)	রিচার্ড্‌স্ (আ)
১৯১৫	রোঁমা রোঁলা (ফ)	এইচ এবং এল ব্রাগ্ (ইং)	উইল্ ষ্টেটর (জ)
১৯১৬	হেইডেন ষ্ট্যাম (সু)	*	*
১৯১৭	পণ্টোপিডান (হ)	বার্কলার (ই)	*
১৯১৮	*	প্ল্যাঙ্ক (জ)	হেবার (জ)
১৯১৯	স্পিটেলার (সু),	ষ্টার্ক (জ)	*
১৯২০	ন্যুট হ্যামসন (ন)	গুইলোম (সু)	নার্নষ্ট্ (জ)
১৯২১	আঁটো ফ্রাঁ (ফ)	আইনষ্টাইন (জ)	সদি (ইং)
১৯২২	বেনাভেন্ত (স্প)	বোর (দ)	অ্যাষ্টন (ইং)
১৯২৩	ঈষ্ট (আর্য়)	মিলিকান (আ)	প্রেগেল (অ)
১৯২৪	রেমণ্ট (প)	সাইগ্‌ব্যান (সু)	*
১৯২৫	বার্ণার্ড শ (আর্য়)	ফ্রাঙ্ক এবং হার্জ্জ (জ)	সিগমণ্ডি (জ)
১৯২৬	গ্রেৎসিয়া দেলাদ্দে (ই)	পেরিন (ফ)	শ্বেড্‌বার্গ (সু)
১৯২৭	বার্গসন্ (ফ)	কম্পটন (আ) উইলসন (ইং)	হ্বাইল্যাণ্ড (জ)

	সাহিত্য	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়নবিজ্ঞান
১৯২৮	সিগ্রিড্ উণ্ড্সেট (ন)	রিচার্ডসন (ই)	হার্ডেন (ই) সাইমন (সু)
১৯২৯	টমাস্ মান (জ)	প্রিন্স ব্রগলিক (ফ)	উইনডাস্ (জ)
১৯৩০	লুই সিনক্লেয়ার (আ)	সি, ভি, রমন (ভ)	ফিসার (জ)
১৯৩১	কার্লফেল্ড্ (সু)	*	বস এবং বারগাস্ (জ)
১৯৩২	গলস্ওয়ার্দ্দী (ইং)	হেইসেন বার্গ (জ)	লাঙ্মুইর (আ)
১৯৩৩	বুনিন্ (র)	ডিরাক (ইং) শ্রোডিঙ্গার (জ)	*
১৯৩৪	পিরাণ্ডেলা (ই)	*	উরে (আ)
১৯৩৫		স্যাড্উইক (ইং)	জলিয়ট এবং কুরী (ফ)
১৯৩৬	ও'নীল (আ)	হেস (জ), এণ্ডারসন (আ)	ডিবে (দ)
১৯৩৭	ডুগার্ড (ফ)	টমসন (ইং) ডেভিডসন (আ)	হবাওয়ার্থ (ইং), কারের (জ)
১৯৩৮	পার্লবাক (আ)	ফের্ম্মি (ই)	

ফ—ফরাসী ; জ—জার্ম্মাণ ; হ—ডাচ্ ; ন—নরওয়েজীয়ান ; সু—সুইডীস্ ; ইং—ইংরাজ ; স্প—স্প্যানীস ; প—পোলিস ; ই—ইতালিয়ান , আ—আমেরিকান ; ব—বেলজিয়ান ; বা—বাঙালী ; আয়্—আইরীশ ; ভ—ভারতীয় ; *—দেওয়া হয় নি ।

সূচী

পদার্থবিজ্ঞান ১ :—

শক্তি ১—

§—দেখ

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে "সন্ধানী" প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি ; এই জন্য এই সমস্ত পুস্তকগুলির প্রণেতা ও প্রকাশকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি :— "আর্টিষ্ট অ্যাণ্ড রাইটার্স ইয়ার বুক" ; ম্যান্টেলের "ওয়াণ্ডার্স অব জিয়লজী" ; সালিভানের "এ নিউ আউট লাইন অব দি সায়েন্স" ; টাইম্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়ার "ইলাষ্ট্রেটেড উইক্‌লী" ; "ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন" ; "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" পত্রিকা ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "অরিজীন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব্‌ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ" ; স্যার জেমস জীনসের "ইউনিভার্স অ্যারাউণ্ড্‌ আস্‌" ; আমেরিকার মেসার্স রীড্‌ অ্যাণ্ড কার্ণরীকের ক্যাটলগ।